মুমূর্ষু পৃথিবী

এই লেখকের

—উপন্যাস—

অস্তাচল

এগারোই ফাল্গুন

(২য় সং)

মুমূর্ষু পৃথিবী

(৩য় সং)

—কাব্য—

হংস দূত

(৫ম সং)

মানস পদ্ম

—গল্প সমষ্টি—

মণিকুণ্ডল

(৩য় সং)

মাটির পরশ

(২য় সং)

—নাটক—

পলাশী

(২য় সং)

অঙ্গনা

পরমারাধ্য পিতৃদেবের
তর্পণ করিলাম

মহালয়া
আশ্বিন, ১৩৪৬

মুমূর্ষু পৃথিবী উপন্যাস। কিন্তু যাঁরা অবসরের অবলম্বন প্রেমের গল্প পড়বার জন্যে উপন্যাস পড়েন, এ বই তাঁদের ভাল লাগবে না। জীবন যাঁদের কাছে রঙীন ফানুস, এ বই তাঁদের জন্যে নয়। মানুষের সুখদুঃখ ও হাসিকান্নার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা যাঁদের মর্মে মর্মে গভীর রেখাপাত করে, মুমূর্ষু পৃথিবী তাঁদেরই হাতে দিলাম।

বইখানি যখন মাসিক ভারতবর্ষে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়, অনেক পাঠক-পাঠিকার কাছ থেকে নানা রকম চিঠি পত্র পত্রিকা কার্যালয়ের মারফত পেয়েছিলাম। কেউ উৎসাহিত করেছিলেন, কেউ বা অজস্র গালাগালি দিয়েছিলেন সমাজের এই সব কুৎসিত চিত্র লোকচক্ষে প্রকাশ করবার নৈতিক অধিকার আমার নেই ব'লে। সব চিঠির জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। যাঁরা উত্তর পান নি, তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

হী. না. মু.

'মানুষের জীবন ত মাটির বাসন নয়—যে, একবার এঁটো হ'য়ে গেলে আস্তাকুঁড়ে ফেলতে হবে! যে ধর্ম মানুষকে পিছনে ফেলে আপনি চলে এগিয়ে, সে ধর্ম আমি মানি না।'

'না মেনে লাভ?'

'অন্তত, মানবার লাঞ্ছনা আর আত্মবঞ্চনার লোকসান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। নাগালের বাইরে যে লাল পতাকা শুধু আসমানের আদর্শ দেখিয়ে চোখ রাঙায়, নীচে দাঁড়িয়ে তার জয়ধ্বনি করে মূর্খেরা।'

সোটকেসের মাইকা-টা ভেঙে ফেলে সত্যেন সুরেখার পিক্টোগ্রাফ-খানা টেনে বের করে। তড়িৎ-এর মুখপানে এক সেকেণ্ড তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে, ছবিখানা টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছড়িয়ে দেয় ফুটপাথে। সুন্দরী হলেও, সুরেখা যেন আজ ওর চোখে আবর্জনার চেয়েও কদর্য।

তড়িৎ বিদ্রূপের সুরে বলে, তবে যে বলেছিলে—

'বলেছিলাম কেন! এখনও বলি, পরেও বলব—বিচ্যুতিকে ক্ষমা করা যায়, কিন্তু নীচতাকে নয়।'

প্রায় দশ মিনিটের নীরবতা উন্মত্ত হাসিতে কাটিয়ে, সত্যেন তড়িৎ-এর পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলে উঠল—সে কথা যাক! চলতি

পথের অপায় পরা। ফ্রী রীলে গত শনিবারের খানিকটা আজ মেক-আপ করেছি। আসছে সপ্তাহে করব ট্রেবল্।

'ট্রেবল্? একেবারে—'

'হাঁ ট্রেবল্; ডবল টোট ত নিশ্চয়ই। সত্যেন সেনের টিপ সব্যসাচীর তীরের চেয়ে কম অব্যর্থ নয়।'

'জানি। তবে—'

'তবে, মানে? মেজাজটা সব সময় ঠিক থাকে না, তাই। নইলে দেখতে। অবশ্য গত শনিবার সব ওলটপালট হয়ে গেল এম্পায়ারের 'পোয়ে' ডান্সে। চার্মিং ড্রিম! লোভটা ছাড়তে পারিনি।'

'বাক আপ বন্ধু, বাক আপ! আজ ডমিনিয়নে 'ছউ' নৃত্য। যাবে না তুমি?'

'চুলোয় যাক তোর ছউ। যে সব হতভাগাদের বউ আছে, তারাই দেখুক-গে ছউ। আমি এবার লাস্ট ম্যান।'

'লাস্ট ম্যান!—তুমি, সত্যেন সেন?'

'নিশ্চয়ই। এখন আর ডান্স নয়। এখন আমার আকর্ষণ 'মর্ণিং রোজ', না হয় 'ফ্লাশ-লাইট'। আপ-সেট হবে তড়িৎ, দেখে নিও।'

'তথাস্তু। জয় হোক তোমার। আজ ত চল, টেম্প্‌ল হোটেলের ফেরত ছউ দেখে শনিবারটাকে গুড-বাই করি। তপন আর সেনরয় যাবে মল্লিকাদের নিয়ে।'

কপালটা কুঁচকিয়ে সত্যেন কি যেন ভেবে নিয়ে বলে—আচ্ছা, চল। আজকের মত, শুধু আজকের মতই—

তড়িৎ তর্জনী-সংকেতে একখানি চলমান ট্যাক্সির গতি শ্লথ ক'রে

পেভমেণ্টের পাশে দাঁড় করায়। পথের দু পাশে তখন অজস্র আলো জ্বলে উঠেছে। বড় বড় বাড়ীগুলোর ভিতর থেকে জীবন্ত বিকারের মত নানাদেশী সুরের কোলাহল এসে মনটাকে ঘরছাড়া ক'রে দেয়।

তড়িৎ ও সত্যেন অর্দ্ধ-মনস্কভাবে গাড়ীর কাছে এগিয়ে গেল। কর্মক্লান্ত মহানগরীর বুকে নেমে আসে বিলাসবতী সন্ধ্যা। প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে হঠাৎ আলোর ঝলকানির সঙ্গে রেডিওগুলোয় যেন ধ্বনিত হয় প্রেতাত্মার বীভৎস উৎসব।

তড়িৎ-এর মনে আলোক-রেখার ছায়াপথ এম্পায়ার থেকে গার্স্টিন প্লেস পর্যন্ত পুঞ্জীভূত রসচেতনার বৈচিত্র্য এঁকে দেয়। সত্যেন নিবিষ্ট মনে ভাবে—গ্রে-ক্রুহাম আর ক্যামেরনের তফাৎ ছিল মাত্র তিন পাউণ্ড। চমৎকার পেডিগ্রি, রাইট ব্যালান্স। তবুও সব গেল ভেস্তে। কেমন ক'রে প্লেস আর উইনে গোলমাল হ'য়ে গেল! যাক—

'সেনরয় মল্লিকা বোসের সঙ্গে এনগেজড। তপন মল্লিকার ছোট বোন মঞ্জরীর রেশমী ফাঁসে মাথা গলাবার চেষ্টায় আছে। জন্মদিনে এবার মঞ্জরীকে সে উপহার দিয়েছে জাপানী স্লিপিং-গাউন।'

'পাকা সাইকোলজিস্ট বলতে হবে। প্রেমের প্রথম ধাপে উঠে স্লিপিং-গাউন উপহার দেওয়া মানেই, মৌলিক উদ্দেশ্যের পরিমাণটা প্রকারান্তরে ওর মনে জাগিয়ে দেওয়া। অর্থাৎ নিজের পাওনাটুকু সতের আনা আদায় করবার পথ পরিষ্কার ক'রে, ভবিষ্যৎ স্বপ্নের গান্ধারটা আলগোচে একবার ছুঁয়ে দেওয়া, আর কি! মানসীকে স্লিপিং-গাউন-পরা অবস্থায় পাওয়ার লোভই তো প্রেমিককে আকুল করে।'

মুমূর্ষু পৃথিবী

সত্যেন একটু বিরক্তির সঙ্গে ব'লে উঠল—থাম, আর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কাজ নেই।

দু জনে ট্যাক্সিতে উঠে বসল। সত্যেনের মনটা কেমন তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'য়ে আসে। জাপানী ক্লোক-পরা আবছা একটি নারীমূর্তি হয়ত ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে। মুখখানা মঞ্জরীর, কিন্তু গলা থেকে পা পর্যন্ত সুরেখা মজুমদারের: তেমনি লম্বা অথচ নিটোল চেহারা, দুটি বাহুতে সলজ্জ কামনার চঞ্চলতা।

প্রকাণ্ড হল। দু পাশে সারি সারি টেব্‌ল—নানা আস্‌বাবে সাজানো। নিত্য-প্রয়োজনের উপকরণ রূপ নিয়েছে ঐশ্বর্যের মণি-মেখলায়। ধবধবে টেব্‌ল-ক্লথের উপর স্যালাড-সেটটা ঝক-ঝক করে; রকমারি গন্ধ নানা-রকম স্ত্রীপুরুষের উপস্থিতি জানিয়ে দেয়। ডিনার কন্‌সার্টের সঙ্গে মাঝে মাঝে কাঁটা-চামচের রুনটুন শব্দ; অসংখ্য পাখার ঝাপটায় বাতাসটা ঘুরপাক খেয়ে রেশমি পর্দার ঝালরগুলো চঞ্চল ক'রে তোলে; আশেপাশে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেম-সাহেবদের কৃত্রিম মিহি গলার প্রণয়গুঞ্জন স্যাম্পেনের হালকা গন্ধের মত মগজটায় ঝিম ধরিয়ে দেয়। ও-পাশের হলে 'ডান্স' সুরু হ'য়েছে! মৃত্যুক্লিন্ন জীবনের পান্থশালায় অমৃতের উৎসব যেন ফেনিল হ'য়ে ওঠে।

তড়িৎ ও সত্যেন এ-পাশের একটা ছোট কেবিনে গিয়ে ঢুকল।

বয়কে হুকুম দিয়ে ওরা দুজনে পাশাপাপি চুপটি ক'রে বসল। সত্যেনের মনটা যেন আজ কোন রকমেই স্বাভাবিক হ'তে চায় না।

অসহায় লতাগুলো। আপনাদের সেই উদ্দাম চলার বেগে জীবনের কোন অচেনা তলে তলিয়ে যায় তারা।

কারা ?—সত্যেন কথাটাকে আরও একটু স্পষ্ট ক'রে নেবার জন্যে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়েছিল।

সলজ্জ হাসির সঙ্গে বড় বড় চোখ দুটো সত্যেনের মুখ থেকে পায়ের দিকে নামিয়ে সুরেখা বলেছিল—বাংলা দেশের মেয়েরা।

তারপর থেকে তিলে তিলে সত্যেন যেন কেমন জড়িয়ে গেল সুরেখার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে। অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে, সংসারের পথে নিজেকে চালিয়ে নেবার ক্ষমতা যার নেই, এমনি করেই সে আঁকড়ে ধরে চলমান সহযাত্রীকে।

ওদের মহলে সত্যেনের যাতায়াত ক্রমেই গেল বেড়ে। বন্ধু ও বান্ধবীর সংখ্যা হয়ে উঠল বেশী। নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে প্রায়ই তাকে ডিনারের খরচ বহন করতে হয়। বন্ধুদের নিয়ে সাহেবী হোটেলে সে পার্টি দেয়; প্রীতি-ভোজ, ডান্স—আরও কত কি! প্রতি শনিবার ওদের একটা-না-একটা উৎসব লেগেই থাকে। তা ছাড়া জন্মদিন, স্মৃতি-তর্পণ ও নৈমিত্তিক অনুষ্ঠানের অভাব নেই। বান্ধবীদের জন্মদিনে সে-ই আগে দেয় সবার চেয়ে দামী উপহার।

দেখতে দেখতে খরচ বেড়ে গেছে দশগুণ, কিন্তু মাসিক আয় ধীরে ধীরে নিক্তির ওজনে পরিমিত হয়ে আসে। দেনা বাড়ে, সত্যেন নিশ্চিন্ত হবার আশায় দু পেগ হুইস্কি না হয় দুটো বীয়ার দিয়ে মনের বর্তমানটাকে চাপা দেয়। প্রগতির মাঝখানে গৌরবের আসনটুকু অটুট রাখবার জন্যে সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে অগ্রগামী করে রাখে। ঠিক এমনি সময় তড়িৎ-এর সহযোগিতায় তার মাথায় চেপে বসল

'রেস্'। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অর্থের প্রয়োজন যত বাড়ে, তত বেড়ে চলে অপ্রত্যাশিত প্রচুর অর্থের আকস্মিক আগমনের স্বপ্ন।

মাঝে মাঝে মনটা প্রকৃতিস্থ হয়ে আসে, কিন্তু নিতান্ত ক্ষণিক সেই আত্মস্থতা পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার পরক্ষণেই বিলীন হয়ে যায়। সত্যেন দেনায় জড়িয়ে পড়ে, তবুও থামে না। ব্যর্থতা সত্ত্বেও অনাগত একটি শনিবারের অভাবনীয় কল্যাণস্পর্শের স্বপ্ন তাকে মাতাল করে রাখে।

সন্ধ্যার আগেই সে ফিরল তড়িতকে সঙ্গে নিয়ে। সারাটা দিন ঘুরেও কারো কাছে টাকা যোগাড় করতে পারে নি। যাদের কাছে একদিন অনায়াসে পেত ওই সামান্য টাকা, তাদের প্রত্যেককে জলৌকাবৃত্তিতে একে একে পিছনে ফেলে এসেছে অনেক আগে। একটি পরিচিতকেও শোষণ করতে সে বাকী রাখে নি! একবার যার কাছে ধার নিয়েছে, তার সঙ্গেই হয়েছে ওর বিচ্ছেদ। তাই আজ আর কোনখানে হাত বাড়াবার মুখ নেই। নিরুপায় হয়ে সত্যেন ব্যাঙ্কের ক্যাশ থেকে টাকা এনে হোটেলের দেনা শোধ করে দিল। সুরেখার কাছে অত বড় লাঞ্ছনা সে কোনমতেই সইতে পারবে না। ওরই জন্মদিনকে স্মরণীয় করে তুলবার জন্যে তার এই আয়োজন—উৎসাহ ভাবতে সত্যেনের বুকের ভিতর কেমন একটা রক্তের জোয়ার আসে।

ব্যাঙ্কের ক্যাশে হাত দেওয়া এই তার প্রথম নয়। অবশ্য যতবার টাকা নিয়েছে, প্রত্যেকবারই ভেবেছে—আগামী শনিবার বেশী টাকা স্টেক করে নিশ্চয়ই পাবে প্রচুর অর্থ; তাই থেকে ক্যাশ মেক-আপ

করে, পাওনাদারদের পাই-পয়সাটি পর্যন্ত মিটিয়ে দেবে। কিন্তু কার্যত ঘটে সম্পূর্ণ উল্টো।

সন্ধ্যা সাতটায় অতিথিরা সব আসবেন; আটটায় হবে ডিনার।

দুপুর থেকে সুরেখা না-হবে-ত পাঁচ বার ফোন করেছে ব্যাঙ্কে—সত্যেনের কাছে। সারাটা বিকেল মঞ্জরীকে নিয়ে অক্লান্ত চেষ্টায় মিঃ সেনের ঘরখানা রকমারি করে সাজিয়েছে সে। মঞ্জরী আসতে চায় নি। সুরেখা জোর করে ধরে এনেছে তাকে, গান গাওয়াবে বলে। অজন্তা নৃত্যে অদ্বিতীয়া হলেও সুরেখা মঞ্জরীর মত গান গাইতে পারে না। অথচ আশ্চর্য এই যে, মঞ্জরী ভাল গাইতে পারে বলে সুরেখাই গর্ব অনুভব করে বেশী।

সত্যেন আসতেই সুরেখা হৈ চৈ ক'রে বলে উঠল—চমৎকার হোস্ট যা হোক!

কি একটা উত্তর দিতে গিয়ে সামনে মঞ্জরীকে দেখে সত্যেন হঠাৎ থেমে গেল। মঞ্জরীর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ হয় নি কোন দিন, তবুও সে জানে তাকে অন্য মেয়েদের চেয়ে অনেক বেশী।—হঠাৎ তপনের দেওয়া জন্মদিনের উপহার সেই জাপানী ক্লোকটার কথা মনে জেগে উঠল। স্লিপিং গাউনটা চমৎকার মানাবে ওকে! মঞ্জরী যেন সুরেখার চেয়েও স্মার্ট!

*　　　*　　　*

রেইন-বো ক্লাব ছেড়ে সত্যেন ভিক্টোরিয়া চেম্বার্সে এসে উঠেছে। দেশের বাড়ী ও জমিদারিটুকু এক রকম মাটির দামেই বিক্রী করেছে সে, মাত্র সাত হাজার টাকায়। ব্যাঙ্কের দেনা মিটিয়ে, হোটেলে কিছু টাকা জমা দিয়েছে। বাকী টাকা দিয়ে কিনেছে একখানি

টু-সীটার। নিজেই ড্রাইভ করে। রেসকোর্সের মোহ একটুও কমে নি। তবে সুরেখার মোহ বোধহয় একটু কেটেছে মঞ্জরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হওয়ার পর থেকে। কিন্তু তার প্রভাব সে এখনও সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

এম্পায়ারে যে-দিন তমাল দত্ত ও সুরেখা মজুমদারের 'ঘোষ নৃত্য' উপলক্ষ্যে শহরময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিন থেকে সিন্ধী সেই ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে সুরেখার সম্পর্কটা সত্যেনের চোখে অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেছে।

ওর ভাবান্তর হলেও, সুরেখার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয় না। সে আগের মতই সকালে উঠে এসে ওর মুখে-চোখে রেশমী টাসেলের কেশর বুলিয়ে ঘুম ভাঙায়। কোনদিন বা মসৃণ এলো-চুলের গোছা আলগা হাতে সত্যেনের দুই চোখে আস্তে আস্তে ছুঁইয়ে দেয়। ঘুমন্ত মুখ দেখেও হয়ত সুরেখা বুঝতে পারে তার মনের গোপন কথা। অন্যমনস্কতার পর্দাটা একটু সরিয়ে দেবার চেষ্টায় মাঝে মাঝে ম্লান হাসির সঙ্গে বলে—মিঃ সেন, দূর পথে যা দিনের আলোয় টলমল করে, তাকে সব সময় জল মনে করলে ঠকতে হয়।

সত্যেন আগের মত হেসে কথা বলতে পারে না, তবুও বলতে হয় —আপনার কথাগুলো যেন হেঁয়ালি।

সুরেখা কিন্তু হেসেই তার উত্তর দেয়—আর আপনার মনটা যে তার চেয়েও বেশী। রমণীর নয়, পুরুষের মন—সহস্র যুগের সখা সাধনার ধন।

অধিবাস শেষ না হ'তেই সত্যেনের জীবনে আমূল পরিবর্তনের

সূচনা হল। ভিক্টোরিয়া চেম্বার্সে'ও দেখতে দেখতে বাকী পড়ল অনেক টাকা। এবার গাড়ীখানা বিক্রী করে কিছু টাকা শোধ দিয়ে, বাকী টাকার জন্যে মালিকের কাছে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে সত্যেন দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি হোটেলে উঠে গেল।

ব্যাঙ্কের হাফ ইয়ারলি নিকাশে দেখা গেল, সত্যেন প্রায় পনের হাজার টাকা ক্যাশ ভেঙেছে। এ টাকা শোধ করবার কোন সঙ্গতিই এখন আর নেই তার। ব্যাঙ্ক কেস্ করল। সিকিউরিটির টাকা হল বাজেয়াপ্ত ; বিচারে তিন বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডও হল।

পরদিন খবরের কাগজে বড় বড় হরফে সেই সংবাদ বেরিয়ে গেল। বন্ধু ও বান্ধবীদের মহলে তাই নিয়ে চলল নানা আলোচনা। চেরি ক্লাবের সেক্রেটারী ও সবুজ সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট সত্যেন সেনের জীবনে এত বড় আকস্মিক সংঘটন হয় ত কেউ কোন দিন কল্পনাও করে নি।

আজ নিঃসঙ্গতায় সত্যেনের কান্না পায়। অবসরের বিশ্রাম-কুঞ্জে এখন আর বান্ধবীর ভিড় নেই। পর্দার আড়াল থেকে রেস্-কোর্সের বুকীরা উঁকিঝুঁকি মারে না।

*　　*　　*　　*

দেখতে দেখতে জীবনের ত্রিশটি বৎসর অতীত দিনের বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসে মিলিয়ে গেল। মনের সবটুকু সম্বল নিঃশেষে ব্যয় করে সত্যেন জেল থেকে ফিরে এল আতঙ্কিত ভবিষ্যতের হাত ধরে'। মনে হল আজ সব দ্বার রুদ্ধ। বন্ধুমহলে আর সে মুখ দেখাতে পারবে না। মাথা গুঁজবার মত একটু ঠাঁইও নেই কোথাও। যে-

কোন মেস-বোর্ডিং-এ উঠতে যায়, সেখানেই অগ্রিম টাকার বিজ্ঞপ্তি। নিরুপায় হয়ে পার্কের একটা বেঞ্চে বসে সত্যেন ভাবে। কিন্তু আজ এ ভাবনার কোন কূল-কিনারা নেই। দুপুর গড়িয়ে যায়। জ্বলন্ত সূর্য ধীরে ধীরে লাল হয়ে আসে পশ্চিমের আকাশে। ওর সর্বাঙ্গে আসন্ন সন্ধ্যার মতই আস্তে আস্তে নামে উপবাসের অবসন্নতা।

মাত্র একটি দিন! একটি দিন আশ্রয় দেবার মত কোন আত্মীয়ও নেই তার! হঠাৎ মনে হল অবিনাশের কথা। ওর ছেলেবেলার বন্ধু। ঠিক বন্ধু না হলেও পরিচিতের চেয়ে অনেক বেশী।

অবিনাশ ছাপাখানায় চাকরী করে। কুড়ি টাকা মাইনের কম্পোজিটর। ঠিকানাটা মনে নেই। তবে অনেক দিন আগে সত্যেন প্রেসটা একবার দেখেছিল। মানিকতলার ছোট একটা গলির ভিতর। সেই ছাপাখানার এক পাশে অবিনাশ থাকে।

অনেক ঘুরে ঘুরে রাত্রি আটটার সময় এসে সে উপস্থিত হল অবিনাশের ঘরে। সত্যেনের এ অবস্থা দেখে অবিনাশ প্রথমটা চিনে উঠতে পারে নি। রুক্ষ চেহারা, চোখে বিহ্বল দৃষ্টি!

একদৃষ্টে অনেকক্ষণ মুখপানে চেয়ে থেকে অবিনাশ সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল—সত্যেনবাবু?

হাঁ।—সত্যেন গলাটা একটু ঝেড়ে নেবার চেষ্টা করল।

'আপনার এ চেহারা! অসুখ করেছিল বুঝি?'

শুষ্ক একটু হাসির সঙ্গে সত্যেন জবাব দেয়—অসুখ ঠিক নয়, অমনি; না না, অসুখ বই কি! এখন সেরে গেছে।

তবু ভাল, অবিনাশ জানে না ওর কথা। জানলেও ক্ষতি ছিল না। আজ না হোক, দু দিন পরে ত জানবেই।

অবিনাশের মনে কেমন ধাঁধা লাগে। তাড়াতাড়ি টুলটা এগিয়ে দিয়ে সত্যেনের পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে।

না বলে উপায় নেই, তবুও সত্যেন মুখে ফুটে বলতে পারে না। অবিনাশ নানা কুশলপ্রশ্ন করে। ও কোনটার উত্তর দেয়, কোনটা হয় ত অন্যমনস্কতায় এড়িয়ে যায়। অনেকক্ষণ ইতস্তত করে হঠাৎ বলে ফেলল—একটা টাকা ধার দিতে পার অবিনাশ?

শুনে অবিনাশ যেন প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারে না। সত্যেন সেন, ওদের গ্রামের জমিদার! একটা টাকা ধার! এ নিয়ে প্রশ্ন করতেও তার সাহস হয় না।

সাত জায়গা খুঁজে অবিনাশ সিকি-দু'আনিতে মিলিয়ে একটি টাকা এনে ওর হাতে দেয়। সত্যেনের চোখে তখন জল ছাপিয়ে উঠেছে। প্রাণপণে নিজেকে সংযত করে। কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে নামে। হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে অবিনাশ পিছু পিছু এসে বিমূঢ়ের মত দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে।

মহানগরীর বুকে ক্ষুধার্ত পথিকের সম্বল সেই একটি টাকা দেখতে দেখতে নিঃশেষ হয়ে গেল। পাইস্ হোটেলে একবেলা খেয়ে কখন পার্কে, কখন বা পথের পাশে গাড়ী-বারান্দায় আশ্রয় নিয়ে হতাশ দিনগুলো কেটে যায়! যেমন-তেমন একটা মেস, অন্তত খোলার বস্তির একটা সস্তা হোটেলে মাথা গুঁজবার মত একটু জায়গা পেলেও যেন সে আজ বেঁচে যেত! আত্মগোপনের শঙ্কিত দৃষ্টি আর প্রতি

পদক্ষেপে আসন্ন লাঞ্ছনার বিভীষিকা বয়ে মানুষ কতক্ষণ বাঁচতে পারে! সত্যেন হাঁপিয়ে ওঠে। জীবনের আগাগোড়া ভাবতে গেলে মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায়।

একটা চাকরি, যে-কোন সামান্য মাইনের একটা কাজও জোটে না। ছোট-খাট অফিসে, দোকানে, এমন কি লোকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু কোথায় চাকরি! একটু আশ্রয়ের বিনিময়ে সে আজ ক্রীতদাস হতেও কুণ্ঠিত নয়। তবু ত—

ওর চেহারা দেখে হয় ত লোকের মনে সন্দেহ জাগে।

মুসাফিরের মত পথে পথে ঘুরে পা দুটো যখন নিতান্ত অচল হয়ে আসে, একবার লাইটপোস্টে ঠেস্ দিয়ে একটুখানি দাঁড়ায়। মাথাটা ঝিম ঝিম করে; মনে হয় পেটের মধ্যে নাড়িগুলোয় আগুন ধরেছে। ভাবতে ভাবতে মনটা কখন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। সিনেমেটোগ্রাফের মত অতীত দিনগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

'একটা পয়সা দেবে বাবা?'—নামাবলী গায়ে একটি প্রৌঢ়া এসে হাত পাতে।

প্রথমটা হয়ত কানে পৌঁছয় না তার আবেদন। ক্ষুধিত দেহের প্রত্যেকটি পেশীর আর্তনাদে ওর সংবিৎ মূর্চ্ছিত হয়ে থাকে। মেয়েটি আবার হাত বাড়ায়—'ওগো ছেলে, দাও না একটি পয়সা!'

আচম্বিতে সত্যেনের চমক্ ভাঙে—'পয়সা?—পয়-সা!'

'হাঁ, একটি পয়সা। দু দিন কিছু খাইনি'—মেয়েটি হাত পেতে ওর মুখপানে চায়।

'পয়সা! একটি পয়সা!'—বিকারের মত মুখে একটু হাসি ফুটে

ওঠে। বদ্ধমূল অভ্যাসের বশে পকেটে হাত দুটো পুরে দিয়ে একবার খুঁজে দেখে, তারপর পাঞ্জাবী আর স্লিপার জোড়াটার দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে আবার ফুটপাথ ধরে' এগিয়ে চলে। দুঃস্বপ্নের ঝোঁকটা যেন কোনমতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না !—একটি পয়সা !

ছোট গলিটার মোড়ে একটি বেদের মেয়ে গান গাইছে। নিটোল স্বাস্থ্য, পরনে একটা ছেঁড়া ঘাগ্‌রা ; বুকে একফালি নেকড়ার বাঁধন ছাড়া গায়ে আর কোন আবরণ নেই। পিঠের উপর ছেলেটা নিশ্চিন্তে ঘুমচ্ছে। কোমরের সঙ্গে কাপড় দিয়ে তাকে শক্ত ক'রে বেঁধে রেখেছে। সঙ্গে একটা পুরুষ, ভাঙা হারমোনিয়ম বাজিয়ে গজল গানের সুর দিচ্ছে

দেখতে দেখতে পথযাত্রীদের ভিড় জমে। সত্যেন চলতে চলতে একবার থম্‌কে দাঁড়ায়। মেয়েটার চোখ দুটোয় যেন বিদ্যুতের ফিন্‌কি ! পথচারী পুরুষের মনে অলক্ষ্যে একটু নেশা ধরিয়ে দেয়। তারপর, একটা—দুটো—তিনটে, অনেক পয়সা একে একে কুড়িয়ে সে পুরুষটার হাতে দেয়।

পরশু থেকে একমুঠো ভাতও জোটে নি। চাকরির কোন আশাও নেই আর। ক্বচিৎ দু-একটা চেনা মুখ হঠাৎ সামনে এসে পড়ে। কি একটা বলবে মনে ক'রে এক-পা এগিয়ে যায়, কিন্তু বলা হয় না। নিজের অজ্ঞাতসারে মুখখানা নীচু ক'রে কখন সরে আসে। আত্ম-সম্মানের বালাই ওর নেই আর ; তবুও সাহায্য চাইতে পারে না

কারো কাছে। কেউ চিনতে পেরে এড়িয়ে যায়, কেউ না-চিনবার প্রাণপণ চেষ্টায় অন্যমনস্ক হয়ে পাশ কাটায়। সুরেখাও একদিন মোটরে এই পথ দিয়ে গেছে; সঙ্গে অপরিচিত এক ভদ্রলোক! দূর থেকে অর্থহীন দৃষ্টিতে একবার চেয়ে সত্যেন নিজেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

৮

একটা কুষ্ঠরোগীর কাছে স্লিপার জোড়াটা বিক্রী ক'রে কাল মুড়ি কিনে খেয়েছে। আজ আর কিছুই জোটে নি। খালি পেটে কলের জল খেয়ে সারাটা দিন গা বমি-বমি করে; পেটের ভিতর কেমন পাক দেয়।

আজ থেকে আবার উপবাসের পালা সুরু হল।

যে সব রাস্তায় লোক-চলাচল বেশী, সত্যেন সেদিকে বড় একটা যায় না। জনবিরল পথে পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়; কখন অবসন্ন মনে বাগানের কোন একটা বেঞ্চে ব'সে আকাশ-পাতাল ভাবে। অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যৎ একসঙ্গে তাল পাকিয়ে ওর চোখের সামনে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মত ভেসে ওঠে; দৃষ্টি ঝাপসা ক'রে তোলে।

কখন্ রাত্রি এগারোটা বেজে যায়; পাহারাওয়ালা এসে সকলকে হাঁকিয়ে দিয়ে ফটক বন্ধ করে। পা দুটো যেন শক্ত হ'য়ে জমে গেছে। কোন রকমে দেহটা টেনে এনে ফুটপাথের একটি কোণে আশ্রয় নেয়। নিতান্ত অবসাদে মাঝে মাঝে একটু তন্দ্রা আসে, কিন্তু চোখে ঘুম নেই। মাথার নীচে পাঞ্জাবীটা বালিশের মত জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ে।

অন্ধকারের বুকে পথচারীদের জীবন-স্রোত ব'য়ে চলে। দু'পাশে একে একে এসে জমে ভিকিরীর দল। কেউ বেদনায় আর্তনাদ

ক'রে, কেউ এঁটো পাতা কুড়িয়ে এনে পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে কদর্য অন্ন গুলো বেছে নেয়; এক টুক্‌রো বাসি পাঁউরুটি নিয়ে কাড়াকাড়ি করে। এখানেও চলেছে প্রেম, কলহ, দ্বন্দ্ব। পথচারিণী নায়িকার অভাব নেই। দিনের আলোয় যারা হুলো সেজে বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষে ক'রে ফিরেছে, রাতের অন্ধকারে তাদেরই নিয়ে গ'ড়ে ওঠে ঈর্ষা, প্রেম—প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

নিস্তব্ধ প্রহরে কখন চোখের পাতায় একটু ঘুম নেমে আসে। বর্তমান জীবনের নির্মম অস্তিত্বটা মুহূর্তের জন্য মুছে যায়। আবার হঠাৎ চম্‌কে ওঠে, একটু নাড়া পেয়ে; কানের পাশে যেন কার মৃদু স্পর্শ লাগে।

—একটা মেয়ে মাথার কাছে হাত দিয়ে ওর পাঞ্জাবীর পকেট টিপে টিপে দেখ্‌ছে। ঈষৎ চোখ খুলে সত্যেন একবার মেয়েটার চেহারা দেখে নেয়। খুব হাসি পায়। কিন্তু মেয়েটাকে লজ্জার উপর লজ্জা দেবার প্রবৃত্তি ওর হয় না। চুপচাপ মরা মানুষের মত প'ড়ে থাকে; নিঃশ্বাসটাও যেন চেপে রাখ্‌তে চায়।

মাথার কাছ থেকে হাত দুটো আস্তে আস্তে এগিয়ে আসে সত্যেনের ট্যাঁকের দিকে। মনটাকে একটু শক্ত ক'রে নিয়ে ও কাঠ হ'য়ে প'ড়ে থাক্‌বার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না—হঠাৎ শরীরটা কেমন শিউরে ওঠে। উপবাস-ক্লিষ্ট দেহে যেন বিদ্যুতের ঝলক লাগে।—মেয়েটার বয়সে কুড়ি-একুশের বেশী নয়।

* * * *

এক দুই ক'রে আরও তিনটি দিন অনাহারে কেটে গেল। সেদিন এক সঙ্গে দু-পয়সার মুড়ি না খেলে হয়ত আরও একটা দিন সে নিশ্চিন্তে

কাটাতে পারত। শরীরে একটুও শক্তি নেই, মনে বিক্ষুব্ধ চিন্তার প্রবাহ। মুমূর্ষু পথিকের মত বাগানের একটি কোণে ব'সে ভাবে আসন্ন অন্ধকারের কথা।

পাঞ্জাবীটা ছিঁড়ে গেছে; কাপড়খানির অবস্থা তার চেয়ে কম জীর্ণ নয়। তিন বছর আগে যে কাপড় জামা নিয়ে সে গ্রেফতার হয়েছিল, জেল থেকে বেরিয়ে আসার দিন সেইগুলোই তারা ফিরিয়ে দিয়েছে। ময়লায় তেল-চিটধরা পাঞ্জাবীটা এখন আর ভিকিরীরাও নিতে চাইবে না, নাক সিট্‌কে দূরে সরে' যাবে।

পেটের ভিতর আবার শুরু হয়েছে সেই জ্বালা। একমুঠো ভাতের জন্যে হাহাকার—তীব্র তাড়না সত্যেন আর সহ্য করতে পারে না। ইচ্ছে হয়, রাস্তায় গিয়ে কারো কাছে দুটো পয়সা চেয়ে নেয়; কিন্তু আবার কি ভেবে মনটা দুর্বল হ'য়ে পড়ে।

কুলিগিরি করার জন্যেও সে আজ প্রস্তুত। কিন্তু কেউ ত ডাকে না। তবুও কথাটা মনে হ'তে যেন ওর শিথিল দেহময় অনেকখানি সজীব হয়ে ওঠে।

আস্তে আস্তে গিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়ায়। কাল হয় ত দাঁড়াইবার শক্তিটুকুও থাক্‌বে না।

পথযাত্রীর হাতে ভারী জিনিস দেখ্‌লেই মনে হয়—বুঝি ডাক্‌বে ওকে। কিন্তু ডাকে না। একজনের পর একজন—কত লোক পথ দিয়ে চলে যায়। ওর দিকে কেউ ফিরেও চায় না।

বলি বলি ক'রেও মুখফুটে বল্‌তে যেন কোথায় সঙ্কোচ লাগে। কিন্তু কদিন আর চল্‌বে এই বৃথা সঙ্কোচের বোঝা ব'য়ে। এবার স্থির মনে সে এগিয়ে যায়। এটাচি-হাতে একটি ভদ্রলোকের

পথ রোধ ক'রে হঠাৎ যন্ত্রের মত ব'লে ফেলে—মুটে চাই? মুটে?

না।—ভদ্রলোকটি পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

শুধু হতাশা নয়, একটা দারুণ গ্লানি মুহূর্তে ওর সর্বাঙ্গে ছাড়িয়ে পড়ল। বুকের ভিতর মনটা আর্তনাদ ক'রে উঠল।

পথের এক প্রান্তে কয়েকজন ভিকিরী গাঁজার মজ্‌লিস্‌ জমিয়ে জটলা করে। ওদের ক্লান্তি বোধ হয় ক্ষণিকের বিশ্রম্ভালাপেই মুছে যায়; কিংবা ছিলই না কোন দিন।

সত্যেন অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ায়। চারিদিকে উৎসবের সমারোহ, তারই পাশে পাশে রিক্তের নিষ্ফল হাহাকার। দোকানের গ্লাস-কেস্‌টায় স্তরে স্তরে সাজানো থালাভরা নানা রকম খাবার। ওর বুভুক্ষিত দৃষ্টি সজাগ হ'য়ে ওঠে। মনে হয়, হিংস্র জন্তুর মত লাফিয়ে পড়ে; খাবারগুলো ছিনিয়ে এনে ফুটপাথে ছড়িয়ে দেয়। পরক্ষণেই মনটা ধিক্কারে ভ'রে ওঠে।

আবার ফুটপাথ ধ'রে হেঁটে চলে। এমনি ক'রে কতদূর এগিয়ে যায়, তা নিজেও বুঝতে পারে না। হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়ায়; ফুটপাথে পা বাড়াবার পথ নেই।

দুপাশে সারি সারি ব'সেছে কাঙালী, ভিকিরী অনাথের দল। তাদের আঁচল ভর্তি ক'রে খাবার দিচ্ছে ওরা। কি কোলাহল! নিরন্ন মানুষগুলো যেন আনন্দে অধীর হ'য়ে উঠেছে। এক সঙ্গে অত খাবার তারা কতকাল পায় নি! ইচ্ছে করে ওদের এক পাশে গিয়ে আঁচল পাতে; কিন্তু পারে না। দেহ অসহ্য বুভুক্ষায় হাত বাড়াতে চায়,—কিন্তু মনটা বেঁচে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে ওঠে

এবার চল্‌বার ক্ষমতাও লোপ পেয়ে আসে ; দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পা দুটো কাঁপে।

একটি ভিকিরী-মেয়ে মাঝে মাঝে উৎসুক দৃষ্টিতে ওর দিকে চায়। সে দৃষ্টির অর্থ খুঁজে নেবার মত মনের অবস্থা ওর নেই।

ভিকিরী হ'লেও মেয়েটি ঠিক ওদের মত নয়। পরনের কাপড়-খানা খুব জীর্ণ, মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল। কিন্তু তার দেহ এখনও জীর্ণ হয় নি ; সর্বাঙ্গে যৌবনের রেখা ঝরা শিউলির মত ছড়িয়ে আছে !

সত্যেন নিশ্চল দাঁড়িয়ে ভাবে। কত রকমের ভিকিরী,—নানা বয়সের, নানা চেহারার মানুষ এসে আঁচল পেতেছে পেটের দায়ে। এক মুঠো খাবারের জন্যে কত কলরব, কত কাড়াকাড়ি !

খাবারগুলো আঁচলে বেঁধে আবার তারা একে একে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পড়ল।

একজন অন্ধের হাত ধ'রে সেই ভিকিরী-মেয়েটি ওর দিকেই এগিয়ে আসে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে সত্যেনের সংজ্ঞাও যেন তখন ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিল। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ; মেয়েটি এদিক-ওদিক চেয়ে ঠিক ওর সামনেই এসে দাঁড়ায়।

একটু ইতস্তত ক'রে সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞেস্ করে—খুব খিদে পেয়েছে, না ?

সত্যেন বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে : মুখে কথা সরে না। নিতান্ত অবসাদে চোখ দুটোও বোধ হয় ঝাপসা হ'য়ে এসেছিল।

ভদ্দরলোকের ছেলে কি-না, তাই লজ্জায় ব'ল্‌তে পার্‌ছ না ; না ? —মেয়েটির মুখে ম্লান একটু হাসি।

সত্যেন শুধু মাথা নেড়ে জানায়—হাঁ, তাই।

মেয়েটি আর কোন কথা না ব'লে ওর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে গেল রাস্তার নিভৃত একটি পাশে। কোন আপত্তি করবার শক্তিও হয় ত সত্যেনের তখন ছিল না। ও যেন কলের পুতুলের মত অসাড় হ'য়ে গেছে।

আঁচল থেকে খাবার বের ক'রে মেয়েটি ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—খাও ; লজ্জা করো না।

সত্যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। নিজের অবস্থাটা সে সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারে না। বুঝি-বা স্বপ্ন, সেদিনের মত এও একটা দুঃস্বপ্ন। সুরেখার মত,—ওর জন্মদিনের অপ্রত্যাশিত অতিথি মঞ্জরীর মত!

মেয়েটি এবার তাগিদের সুরে সত্যেনের খাবার-ভর্তি হাত দুটো তুলে ধ'রে বলে—খাও না! কদিন বাঁচবে, না খেয়ে?

তাই, সত্যি তাই। ওর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়েছে পাকস্থলীর বিস্ফোরণ। বাঁচবে না, এক মুহূর্তও বাঁচ্‌বে না আর না খেয়ে।

মেয়েটা এক রকম জোর ক'রেই খাবারগুলো ওর মুখে তুলে দিল। সত্যেনের বুকের ভিতর বুভুক্ষিত মানুষ ফুলে ফুলে কেঁদে উঠতে চায়। অনেকক্ষণ পর ভাল ক'রে মেয়েটির মুখপানে একবার চেয়ে সে জিজ্ঞেস্ ক'রল—তুমি ভিকিরী?

হাঁ।—ব'লে সঙ্গের অন্ধটির হাত থেকে এনামেলের কলাই-চটা বাটিটা নিয়ে মেয়েটি পাশের কল থেকে এক বাটি জল এনে সত্যেনের হাতে দিয়ে ব'ল্‌ল—তোমার যে কত খিদে পেয়েছিল, তা আমি ওখানে ব'সেই টের পেয়েছিলাম।

সত্যেনের চোখ দিয়ে তখন জল গড়াচ্ছে। ওর সমস্ত ভাষা যেন মূক হ'য়ে গেছে।

মেয়েটির মনে বিন্দুমাত্র জড়তা নেই। ও তেমনি হেসে জিজ্ঞেস্ করে—কদিন খাও নি বল ত?

আজ নিয়ে চারদিন।—কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হ'য়ে আসে। কতকাল এমন ক'রে কেউ জিজ্ঞেস্ করে নি ওকে; ওর অভাব,—অনশন, ওর জীবনের কথা!

এতক্ষণ পরে অন্ধটি একবার সাম্‌নে, আর একবার দুই পাশে হাত বাড়িয়ে কি অনুভব ক'রে ব'লে উঠ্‌ল—কার সঙ্গে কথা বল্‌ছিস অতসী?

ও চারদিন খায় নি বাবা; ভদ্দরলোকের ছেলে।—এবার অতসীর মুখখানা বেদনার্ত হ'য়ে উঠ্‌ল।

মেয়েটির নাম অতসী! কি অপরিসীম দরদ ওর মনে! সত্যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকে।

খাবারগুলো এঁটো করিস নি ত অতসী? দে মা, দে ওঁকে।

—হাতের লাঠিটা নামিয়ে বুড়ো সেইখানেই ব'সে প'ড়ল।—তোর মা যখন মরে, তখন তুই কতটুকুই বা! না-খেয়ে না-খেয়ে সে বেচারী তিল তিল ক'রে শুকিয়ে মর্‌ল। আমি তখন বিছানায় প'ড়ে।

মায়ের প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে অতসী তাড়াতাড়ি সত্যেনকে জিজ্ঞেস্ ক'রল—কোথায় থাক তুমি?

আমি?—একটু ইতস্তত ক'রে সত্যেন বলে—ও-দিকে, মোড়ের ওই বাগানটায়।

বাগানে? কোম্পানীর বাগানে ত রাত্তিরে থাক্‌তে দেয় না? অতসী উৎসুক দৃষ্টিতে চায়।

না। রাত্রে এদিকে-ওদিকে থাকি ; বারান্দা, না হয় রাস্তায়—কথাগুলো বল্‌তে যেন দম বন্ধ হ'য়ে আসে।

রাস্তায়! বল কি? শেষে যে একটা কঠিন ব্যামো ধ'রে যাবে। দেখ না, কত কুষ্ঠেযক্ষ্মা-রুগী সারারাত চারিদিকে গড়িয়ে বেড়ায়? একদিনও নয়, আর একটি দিনও তুমি থেকো না রাস্তায়।

এবার সত্যেনের হাসি পায়। অত্যন্ত করুণ হাসির সঙ্গে বলে—ভূতের আবার অমাবস্যা!

না, জানো না তুমি ; অমনি ক'রেই কঠিন ব্যামোগুলো রাজ্যিময় ছড়িয়ে পড়ে। মুখপানে কেউ ফিরেও চাইবে না। চল, আমাদের বস্তিতে একটা ঘর নিয়ে থাক্‌বে। পুরুষ মানুষ, প্রাণে বেঁচে থাকলে মোট খেটেও দিন চলবে।—অতসী একরকম জোর ক'রেই ওর হাত ধ'রে টেনে নিয়ে চল্‌ল।

সত্যেনের চোখ দুটো জলে ঝাপসা হ'য়ে আসে। এত বড় দাবীর পরে কোন আপত্তি করবার প্রবৃত্তি তার হ'ল না।

পথে যেতে যেতে অতসী জিজ্ঞেস্ করে—তোমার নামটা কি, তা ত বল্‌লে না?

সত্যেন একটু ভেবে নিয়ে বলে—দীনবন্ধু।

দীনু! তা বেশ। আমাদের পাড়ার হরিমতির ভাই-এর নাম ছিল দীনু।—আবার তেমনি একটু হাসি ফুটে ওঠে ওর মুখে-চোখে।

সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। পথ ও প্রাসাদে জলে উঠ্‌ল বিচিত্র আলোর মণিমালা।

মুমূর্ষু পৃথিবী

অন্ধকার গলি। দু-পাশে ছোট ছোট খোলার বাড়ী, মাঝখান দিয়ে সরু একফালি পথ; পাশাপাশি দু'জনকেও গা-ঘেঁসে চল্‌তে হয়। গলিটার শেষে অতসীদের বস্তি; যেমন অন্ধকার তেমনি অপরিচ্ছন্ন।

পা বাড়াতেও সত্যেনের ভয় করে। অতসী আগে আগে চলে অন্ধ পিতার হাত ধ'রে; সত্যেন কতকটা যন্ত্রচালিতের মত ওদের পিছু পিছু হাঁটে।

পায়ের ফাঁক দিয়ে একটা ধাড়ি ইঁদুর কিচ্‌ কিচ্‌ শব্দে ছুটে গেল। সত্যেন আঁৎকে উঠে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

অতসী বুঝতে পেরেছিল—অন্ধকার গলিতে পা বাড়াতে দীনু শঙ্কিত হ'য়ে উঠ্‌ছে। একটু অপ্রতিভ সুরে বল্‌ল—ভয় কর্‌ছে দীনু? ও কিছু নয়; একটু এগিয়ে এসে আমার হাতটা ধর।

দীনবন্ধু কোন উত্তর দেবার আগেই বুড়ো হেসে ব'লে উঠ্‌ল—সব স'য়ে যাবে বাবা; দু'দিন পরে সবই স'য়ে যায়। এ আর কতটুকু অন্ধকার!—দীর্ঘশ্বাসে জীর্ণ পাঁজরা ক'খানা কেঁপে উঠে।

জীবনে যে আলো চিরদিনের মত নিবে গেছে, তারই ব্যথা ফেনিয়ে ওঠে অন্ধের বুকে।

আঁচলের একটা প্রান্ত বাপের হাতের মুঠোয় গুঁজে দিয়ে, অতসী পিছিয়ে এসে দীনবন্ধুর হাত ধরে আবার এগিয়ে চল্‌ল। ভিকিরীর মেয়ে, তবু এত নরম ওর হাত!—সত্যেন চল্‌তে চল্‌তে অতসীর হাতখানা যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করে। অতসীর স্পর্শে উদগ্র মাদকতা নেই, অথচ কেমন একটা অনুভূতির ছোঁয়া নিমেষে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে। শরীর ও মন অবসাদে তন্দ্রাতুর হ'য়ে আসে।

—অতসী !

—য়্যাঁ।

না, কিছু নয়। ব'লতে গিয়ে সত্যেন থেমে গেল। হঠাৎ যেন তার সংবিৎ ফিরে এলো।

গলির শেষে বড় একটা উঠান; দু পাশে বস্তি। স্যাঁৎসেতে উঠানের মাঝখানে কতদিনের খোলা আর কালচূণার স্তূপ জমে আছে; বাতাসে থম্ থম্ করে তারই ভাপ্সা গন্ধ। দু-একটা ঘরে কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে; সেই আলো দরজার ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে উঠানের এখানে-ওখানে।

অতসীকে অবলম্বন ক'রে ওরা দুজনে এসে উপস্থিত হ'ল বস্তির একটা চাতালে। অতসীর বাবা অন্ধ হয়েও যতখানি নির্ভর ওর উপর করে নি, সত্যেন আজ সক্ষম হ'য়ে তার চেয়ে অনেক বেশী নির্ভর করেছে; শুধু নির্ভর কেন, আজ সে বিনাবাক্যে আত্মসমর্পণ করেছে ওই ভিকিরী তরুণীর হাতে। জীবনের কানায় কানায় রিক্ততা এমন ক'রে ছাপিয়ে উঠেছে যে, নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে পারলে যেন ও বেঁচে যায়। মনের পেয়ালায় যখন অতীত ও বর্তমান একসঙ্গে মিশে সোডা আর তীব্র য়্যাসিডের মত ফেনিয়ে ওঠে, তখন তলানিটুকু পর্যন্ত লুটিয়ে পড়তে চায় মাটির বুকে।

আঁচল থেকে চাবিটা বের ক'রে অতসী দরজা খুলে ভিতরে গেল। ঘরখানার মধ্যে অন্ধকার আর সারাদিনের বদ্ধ উত্তাপ যেন জমাট বেঁধে বাতাসটা বিষাক্ত করে তুলেছে। হাতড়ে হাতড়ে মাটির প্রদীপটা জ্বেলে, তাড়াতাড়ি মাদুরখানা মেঝেয় বিছিয়ে অতসী বাবার হাত ধ'রে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

সত্যেন বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করে। পরিস্থিতিটা নিজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে আগাগোড়া ঠিক ভেবে উঠ্‌তে পারে না। বিকেল থেকে পর পর চোখের সাম্‌নে যে ছবিগুলো ভেসে চলেছে, সে কি উপবাস-ক্লিষ্ট মস্তিষ্কের বিকার, না জীবন্ত বাস্তব! পৃথিবীর স্তরে স্তরে মানুষের এই প্রবাহ কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যার মত চোখে ধাঁধা ধরিয়ে দেয়। ভেবে পায় না কোথায় এর আদি, আর কোথায় শেষ। সেই ভিক্টোরিয়া চেম্বার্স—আর এই বস্তি!

অতসী সত্যেনের হাত ধ'রে মৃদু একটা টান দিয়ে বলে—'দীনুবাবু, বস্‌বে চল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দুটো যে ব্যথা হ'য়ে যাবে।'

আশ্চর্য মেয়ে! সত্যেন অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাকে ওর মুখপানে। বড় বড় দুটো চোখ জলে ভারী হ'য়ে উঠেছে। হয় ত সত্যেনের প্রতি সমবেদনায়, না-হয় অসহায়তার নগ্ন রূপ আজ অতিথির সাম্‌নে বিব্রত ক'রে তুলেছে—তাই।

এতক্ষণ পরে সত্যেন অতসীর মুখখানা নিবিড়ভাবে দেখবার সুযোগ পেল। ওরা গরীব—পথভিকিরী, কিন্তু জীবনে ওদের দীনতার এতটুকু ছাপও নেই। মনের ঐশ্বর্যই যেন মুখখানাকে ফুলের মত সুন্দর ক'রে রেখেছে। প্রদীপের স্বল্প আলোকেও বড় বড় চোখ দুটো ফস্‌ফরাসের মত জ্বল্ জ্বল্ করে।

অতসী আবার বলে—সারাদিন পথে পথে ঘুরেছ; একটু বস্‌বে এসো।

তার অনুনয়ের ভিতরেও কেমন একটা দাবী! সে দাবী উপেক্ষা করা চলে না। কিন্তু কোথায় বস্‌বে সে? ভিকিরীর কুঁড়ে, তাও

ভাড়াটে ; ওই এক ফালি ঘরে কোন রকমে ছুটি প্রাণীর মাথা-গুঁজবার ঠাঁই হয়।

ওদের সেই অযাচিত সহানুভূতির সুযোগ নিয়ে অতখানি স্বার্থ-পরতা করতে কেমন বাধে।

বিমূঢ়ের মত খানিক কি ভেবে হঠাৎ অতসীর হাতখানা ছুই হাতের মুঠোয় চেপে ধ'রে সত্যেন বলে—মাপ কর অতসী ; আবার আসব একদিন।

'এখানে থাকতে তোমার খুব কষ্ট হবে, নয় দীনু ?'—অতসীর কণ্ঠস্বর যেন একটু ভারাক্রান্ত হ'য়ে পড়ে।

'কষ্ট !'—দীনবন্ধুর হাসি পায়। হাসি নয়, কান্নারই বিকার। অতসীর হাতখানা ধ'রে একটু ঝাঁকানি দিয়ে বলে—'ফুটপাথে যে ঘর বেঁধেছে, ঘরে থাকতে তার কষ্ট হবারই কথা অতসী।'—এবার সে হেসে ওঠে খুব জোরে।

অতসী অপ্রতিভ হ'য়ে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে বলে—'রাস্তায় কত রকম ব্যামোর ভয়, তাই বলছিলাম।'

'তা জানি।'

'জান ! তা হ'লে থাক্‌তে চাও না কেন ? তবু ত—'

'কেন চাই না, সেটা আর-একদিন বলব। বলতেও হবে না, তুমি নিজেই বুঝবে।'—অতসীর মাথায় হাত দিয়ে সত্যেন অনুনয়ের সুরে বলে—'আজ যাই তা হ'লে ?'

অতসী নতমস্তকে দাঁড়িয়ে কি ভাবছিল। ঘরের ভিতর থেকে তার বাবা উত্তর দিল—'আচ্ছা, এসো বাবা। আবার আসবে একদিন!

পাগলা মেয়েটা অতশত বোঝে না ; তাই কষ্টও পায় অনেক সময়। বুঝবে, আপনিই বুঝবে সব।'

নিজেকে একটু সপ্রতিভ করে নিয়ে অতসী জিজ্ঞেস করে—'রাত্রে আর কিছু খাবে না বাবা ?'

'না মা। যদি পারিস, কাল সকালে বরং এক মুঠো ফুটিয়ে দিস।'—মাদুরখানার এক পাশে বুড়ো হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল।

অতসী শুধু বাবার কথাটাই জানতে চায় নি ; সেই সঙ্গে দীনুর কথাও জেনে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু হয়ে পড়ল অন্য রকম। বাবা খাবে না শুনে, ও আর নিশ্চয় চাইবে না খেতে।

অতসীর মুখ দেখে সঙ্কোচটুকু বুঝে নিতে সত্যেনের দেরী হল না। তাই, আর কোন কথা উত্থাপন করবার আগেই বারান্দা থেকে উঠানে নেমে দাঁড়াল—'আচ্ছা, তা হলে আজকের মত আসি, অতসী ?'

খানিক নীরবে কি ভেবে নিয়ে অতসী বলল—আবার এসো

মনটা যেন হঠাৎ কেমন এলোমেলো হয়ে গেল! নিজেকে সংযত করে নেবার চেষ্টায় সত্যেন তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলল গলিটার দিকে। গলিটার মতই তার জীবনের এই অধ্যায় সংকীর্ণ আর অন্ধকার হয়ে উঠেছে। কারুর সঙ্গে পাশাপাশি চলবার পরিসর সেখানে নেই আজ।

'একটু দাঁড়াও'—অতসী পিছু ডাকে। কণ্ঠস্বরে যেন পর্য্যাপ্ত মমতা।

সত্যেন ফিরে দাঁড়াতেই প্রদীপটা হাতে নিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এক হাতে প্রদীপ, অন্য হাতে বাতাস আড়াল দিয়ে

তাড়াতাড়ি এসে দাঁড়াল সুমুখে—'আঁধারে তুমি এক পা-ও চলতে পার না, না দীনু ? সে আমি বেশ বুঝেছি তখন।'

অতসী হেসে ওঠে, হয়ত নিতান্ত অকারণ ; কিন্তু সত্যেন লজ্জিত হয়ে পড়ে।

প্রদীপের লাল আভা ভোরের আলোর মত অতসীর মুখখানা উজ্জ্বল করে তুলেছে। সত্যেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে বারবার চেয়ে দেখে। অতখানি অন্যমনস্কতা গোপন করা চলে না ; চলতে চলতে পা দুটো কখন অলক্ষ্যে থেমে যায়।

সারা গায়ে দারিদ্র্যের নগ্নতা। ফ্যাকাশে চোখ মুখ। ঠোঁট দুখানা অনশনের উত্তাপে নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। তবুও যেন কিসের পরিপূর্ণতা ছাপিয়ে উঠেছে দেহের কানায় কানায়।

তেমনি মৃদু হেসে অতসী বলে—দাঁড়িয়ে রইলে যে ? চল।

সত্যেন চমকে উঠল—'হাঁ, যাই।'

'না-ই বা গেলে আজ ! ক'দিন ধ'রে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছ, একটু জিরিয়ে নিতে—'

কথায় বাধা দিয়ে সত্যেন তাড়াতাড়ি বলে উঠল—তা হোক। আর কোন কষ্ট হবে না।

এবার যেন শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ ক'রে সে এগিয়ে চলে। হঠাৎ অতসীর কাছে দুর্বল মুহূর্তটা এমন ভাবে ধরা পড়বে, এ কথা সত্যেন ভাবতেও পারে নি।

গলির মোড়ে এসে অতসী প্রদীপটা আর-একটুখানি তুলে ধরল। সত্যেন আবার ফিরে চায় ওর মুখপানে। রূপসী নয়, তবুও সে সৌন্দর্য অস্বীকার করবার উপায় নেই।

মুমূর্ষু পৃথিবী

আরও দু দিন কেটে গেল। আগের মতই প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত যেন আবার শিরায় শিরায় পা ফেলে চলতে শুরু করেছে। কিন্তু এবার আর সত্যেন অতখানি কাতর হয়ে পড়ে না। দৈনন্দিন অভ্যাসের পর্যায়ে এটাও ধীরে ধীরে সয়ে যায়। দেহমন যখন মাঝে মাঝে নিতান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, আহত সৈনিকের মত বিকল অঙ্গগুলো কায়ক্লেশে টেনে নিয়ে যায় পথের একটি পাশে। ক্লিষ্ট মনের আনাচে-কানাচে অতীতের ঘন ছায়া উঁকি দেয়। বুকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটি করে বর্তমানের পাষাণস্তূপ। ভবিষ্যৎ চোখের সামনে দুঃস্বপ্ন-জড়িত অজানা দিনগুলোর রূপ নিয়ে ভেসে ওঠে।

চোখের পাতা অবসাদে ভারী হয়ে আসে। ঘুমের ছোঁয়ায় আবার কখন মুছে যায় ওর বর্তমান আর ভবিষ্যৎ। অলক্ষ্যে অতীত ছড়িয়ে পড়ে সুপ্ত জগতের এপার হতে ওপারে। মনে হয়, মাথার কাছে মেহগ্নির টিপয়টায় আড় হয়ে বসে সুরেখা যেন লঘু হাতে খেলা করে এলোমেলো চুলগুলো নিয়ে; নরম আঙুলে ক্রোশে বোনার মত বিলি কাটে।

সুরেখার নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে সীজন্ রিগডের জোয়ার-ভাঁটা বয়ে যায়। মৃদু গন্ধ আর ভোরের অলস বাতাসে তন্দ্রার আবেশ জড়িয়ে আসে। সত্যেনের ঘুম হালকা হয়ে যায়; চোখের পাতায় আধ-ঘুমন্ত জাগরণ, আবছা আবছা অনুভূতি, অথচ চোখ মিলে চাইতে ইচ্ছা করে না। কথাগুলো যেন জড়তায় ঠোঁটের আড়ালে এলিয়ে পড়ে।

গুন্ গুন্ সুরে সুরেখা আবৃত্তি করে—

মুমূর্ষু পৃথিবী

'ওগো বন্ধু,

মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে পার হয়ে আসিলাম

আজি তব প্রভাতের শিখরচূড়ায়,

রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়

আমার পুরানো নাম।'

ব্লো-করা এলো চুলের গোছা আস্তে আস্তে ছুঁইয়ে দেয় সত্যেনের মুখে চোখে।

সত্যেনের সারা গায়ে একটা শিহরণ ঢেউ খেলে যায়। তেমনি ঘুমের ঘোরে ওর বরফের মত ঠাণ্ডা হাতখানা জড়িয়ে ধরে; প্রথমে মুখে, তারপর ধীরে ধীরে বুকের ভিতর টেনে নেয়।

'মেয়েদের ভালবাসা তুমি অস্বীকার কর, কিন্তু দেহটা?'—দুষ্টু হাসিতে স্থরেখার মুখখানা স্থলপদ্মের মত টলমল করে।

'গন্ধকে অস্বীকার করলেই যে ফুলকে অস্বীকার করতে হবে, তার ত কোন মানে নেই।'—সত্যেনের ঠোঁটের আগায় কথাগুলো ঘুমের অলসতায় লুটোপুটি করে।

'মঞ্জরী কাল ডেরাডুন এক্সপ্রেসে তপনের সঙ্গে পশ্চিমে চলে গেছে। যাবে না তুমি?'—স্থরেখা হাসে। সে হাসির তীব্র ঝাঁজ পুরুষের রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয়।

অনুনয়ের স্থরে সত্যেন ওর হাতখানা চেপে ধ'রে বলতে চায়—'হেসো না, হেসো না তুমি অমন ক'রে। অন্ততঃ একটি মুহূর্ত আমায় বাঁচতে দাও, যেমন করে উড়ন্ত পাখী বাঁচে আকাশের বুকে হাত-পা ছড়িয়ে।'

'কেন, আমি কি তোমার হাত-পা বেঁধে রেখেছি? পুরুষ তুমি,

মুক্তিতে তোমার জন্মগত অধিকার। যেমন করে খুশী তেমনি অবাধে বেঁচে থাক—'

সুরেখার কথা শেষ না হতেই সে বাধা দিয়ে বলে—'না না, তা নয়। তার চেয়েও বেশী জন্মগত অধিকার তোমাদের। পুরুষকে অক্টোপাস দিয়ে বেঁধে তোমরা বিজয়গর্বে এগিয়ে যেতে চাও।'

সত্যেনের কথায় সুরেখার মুখখানা অভিমানে কালো হয়ে আসে। বুকের ভিতর থেকে হাতখানা টেনে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে; চোখ দুটো জলে ঝাপসা হয়।

সত্যেন বিড় বিড় ক'রে আপন মনে বলে—'ভালবাসারও রিহার্সাল দিতে হয়। একটা পুরুষের জীবন তিলে তিলে গ্রাস করবার জন্যে মেয়েরা মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ক্রান্তির হিসাবে সতর্ক হয়ে প্রত্যেকটি পা বাড়ায়। দুর্বল মুহূর্তে যার হিসাবের গলতি ধরা পড়ে, তারই বাজি যায় ভেস্তে। নইলে—"

সুরেখার গলায় একছড়া দামী পাথরের মালা ছিল। ওর দাদা তিব্বত থেকে এনে সেটা উপহার দিয়েছিল। সত্যেনের কথায় যে প্রচ্ছন্ন শ্লেষটুকু ছিল, সেটুকু ষোল আনা বুঝবার শক্তি সুরেখার আছে। অথচ নিজেকে সংযত করে নিতেও সে জানে। তাই এবার আর ধনুকের ছিলার মত ছিট্‌কে ওঠে না। কথাগুলো নিতান্ত সহজভাবে হজম ক'রে নিয়ে সে আনমনে সেই সুন্দর মালা ছড়াটা ছিঁড়ে মিহি পাথরের দানাগুলো মেঝেয় ছড়াতে লাগল। সত্যেন দেখেও দেখল না।

কিছুক্ষণ দুজনেই নীরবে অন্য কোন প্রসঙ্গের প্রতীক্ষা করছিল। পুরুষের কাছে সুরেখা সহজে ছোট হয় না। সত্যেন আগে আগে

তাই নিয়ে ওকে অনেক খোঁচা দিয়েছে। সে বলে—ওটা ইন্‌ফিরিওরিটি কমপ্লেক্স।

সুরেখা গম্ভীরভাবে উত্তর দেয়—কার ?—ছেলেদের, না মেয়েদের ?

কিন্তু আজ আর ওদের আলোচনার মাঝখানে অতখানি দূরত্ব নেই। সেদিনের সেই ব্যবধান যেন নিতান্ত অজ্ঞাতসারে জীবনের পর্দা থেকে কখন সরে গেছে। আজ সত্যেন চায় সুরেখার অঞ্চলপ্রান্তে একটু আশ্রয়। সর্বহারা উদাসী জীবনটাকে সে ওর ভালবাসার দুর্ভেদ্য প্রাচীরের মাঝখানে লুকিয়ে রাখতে চায়। কিন্তু মুখে ফুটে সে-কথা বলতে পারে না। বলি বলি ক'রেও নানা কথার ভিড়ে সেই ছোট্ট কথাটুকু হারিয়ে যায়।

আজ বলবে। সত্যেন কৃতসংকল্প হয়ে হঠাৎ ব'লে ফেলল—রেখা, রেখা, আমার এই সৃষ্টিছাড়া জীবনটার লাগাম ধ'রে রাখতে পার না ?

'না।'

'পার না ! পার না আমার ভার নিতে ?'

'পারি না। সত্যি পারি না তোমার ভার নিতে। তা ছাড়া, মেয়েদের ভার নেওয়ার 'পর বিশ্বাস কর তুমি ?'—সুরেখা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সত্যেনের মুখপানে চেয়ে রইল।

সুরেখার চোখে এ দৃষ্টি আর সে দেখে নি কোন দিন। বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকে। দেখতে দেখতে সুরেখার বড় বড় দুটো চোখ, আর সেই সঙ্গে স্থলপদ্মের মত মুখখানা যেন আস্তে আস্তে নেমে আসে সত্যেনের মুখের উপর। কপালে লাগে সুরেখার উত্তপ্ত ঘন নিশ্বাস ! কাছে, আরও কাছে এগিয়ে আসে। ঠোঁটদুখানা কাঁপে !

'সেন !'

'য়্যাঁ!'

'তুমি পার না আমার জীবনের ভার নিতে তোমার ওই শক্তি দুটো বাহুর ওপর?'—সুরেখা হাসে; বহুদিন পূর্বে সে চটুল ভঙ্গীতে সে হাসত—ঠোঁট দুখানা আগুনের ফণার মত লেলিহান ক'রে।

সত্যেন নিমেষে সিধে হয়ে মুখোমুখি বসে। গিলে-করা ঢিলে পাঞ্জাবীর আস্তিনটা উল্টে নিজের বলিষ্ঠ হাতখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে—'পারি, একশো বার পারি তোমার ভার নিতে মিসেস্ সেন।'

'মিসেস্ সেন!'—সুরেখা হো হো শব্দে হেসে ওঠে—'নিজেকে চালাবার শক্তি যার নেই, তার হাতে আত্মসমর্পণ করার চেয়ে চাইনিজ ফ্রন্‌টিয়ারে রেড-ক্রস হয়ে যাওয়াও ঢের ভাল। বোহেমিয়ানের সঙ্গে প্রেম করা চলে, কিন্তু বিয়ে চলে না।'

সত্যেন চমকে ওঠে। বিশ্বাস হয় না ওর কথা। নিজেকে বেশ সচেতন ক'রে নিয়ে আরও স্পষ্ট সহজ কথায় জিজ্ঞেস করে—'তা হলে চাও না তুমি আমার মত একটা ভবঘুরেকে?'

সুরেখা শান্ত স্বাভাবিক হাসির সঙ্গে উত্তর দেয়—'চাই। পরিপূর্ণ-ভাবে চাই তোমাকে; যেমন ক'রে পৃথিবী চায় বর্ষা, ফুল চায় বাতাস—'

'তবে!'—বলা হয় না। হঠাৎ তন্দ্রা টুটে যায় চলন্ত পথিকের পায়ের ছোঁয়া লেগে। ধড়ফড় ক'রে সত্যেন উঠে বসে; চোখ-দুটো বার বার রগ্‌ড়ে নিয়ে নিজেকে অনুভব করবার চেষ্টা করে। তিতিক্ষা আর গ্লানিতে বুকখানা তোলপাড় ক'রে ওঠে। স্বপ্ন! সব স্বপ্ন!

আশেপাশে অনেক ভিকিরী এসে জমেছে। মাথার কাছে একটা ঘেয়ো কুকুর শুয়ে শুয়ে লেজ নাড়ে। সুরেখার ব্লো-করা এলোচুলের

গোছা নয়, ওই কুকুরটার লেজের ঝাপটা এতক্ষণ লাগছিল ওর চোখেমুখে!

ও-পাশের ফুটপাথে একদল ধাঙ্গড়ের মেয়ে বরণ-ডালা মাথায় নিয়ে গান গাইতে গাইতে পুকুরটার দিকে এগিয়ে চলেছে। হয় ত ওদের কোন উৎসব!

অত বড একটা দুঃস্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে উঠতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়। সত্যেন অস্থিরভাবে পায়চারি করে; জটপাকিয়ে-যাওয়া চুলগুলো মুঠো ক'রে ধ'রে আস্তে আস্তে টানে। বিস্মৃতপ্রায় অতীত আবার ফেনিল হয়ে উঠতে চায়।

দেখতে দেখতে পূবের আকাশ ফরসা হয়ে আসে। ভিস্তি-ওয়ালারা রাস্তায় জল দিতে সুরু করেছে। সত্যেন ভিজে ফুটপাথ থেকে অন্য পাশে সরে গেল।

এত চেষ্টা ক'রেও কিছু জুটল না; মেস-বোর্ডিং-এর একটা চাকরের কাজও না। সম্বলের মধ্যে এখন শুধু জীর্ণ ময়লা কাপড়খানি দু-ভাঁজ ক'রে লুঙির মত পরা, আর তেলচিট-ধরা সেই গেঞ্জিটা। পাঞ্জাবীটা আগেই ফেলে দিতে হয়েছে।

জামা-কাপড়গুলো যেমন করে দেখতে দেখতে অচল হয়ে গেল, তেমনি যদি ওর পাকস্থলীটা অচল হয়ে যেত, তা হ'লে বাঁচত আজ হাঁপ ছেড়ে।

নিরুপায় হয়ে সত্যেন রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায়, সাহায্য চাইবে ব'লে। দেহের দাবীকে অস্বীকার ক'রে মানুষ কতক্ষণ বাঁচতে পারে! পেটের

ভিতরটা হু হু করে; বুক পর্যন্ত যেন শীষিয়ে ওঠে আগুন। দুর্বলতায় মাথাটা ঝিম ঝিম করে। সারা অন্তর আজ হাহাকার ক'রে ওঠে এক মুঠো ভাতের জন্যে।

যে সব পল্লীতে কোন দিন সে চলাফেরা করে নি, তেমন অচেনা জায়গায় দাঁড়িয়েও কারো কাছে চাইতে পারে না। দু-এক-জন ভদ্রলোক যখন কাছাকাছি আসে, চাইবে মনে ক'রে এগিয়ে যায়; কিন্তু পারে না। সেই সঙ্কোচ! ভিক্ষা?

মনে হয় অতসীর কথা। কতলোক পথে চলাফেরা করে, কিন্তু অমন ক'রে মুখের পানে চেয়ে আর কেউ তো বোঝে না ওর অন্তরের কথা, ওর না-বলা ব্যথা—মূক অন্তরের নীরব আর্তনাদ! মুহূর্তে সারা মন শ্রদ্ধায় ভ'রে যায়। ভিকিরীর মেয়ে, তবু অন্তরে তার লুকানো আছে কত বড় নারী,—যা বন্ধুর চেয়ে, সখার চেয়ে, এমন কি প্রিয়ার চেয়েও দরদী। সেই নারীর চোখ এড়িয়ে যায় নি ওর কোন কথা, কোন গোপন অনুভূতি। সত্যেন তো কোন দিন চায় নি তার কাছে কিছু। সে-ই আপনা থেকে অযাচিত ভাবে আঁচলভরা খাবার বিলিয়ে দিয়েছে ক্ষুধাতুর মুখপানে চেয়ে।

দুনিয়ার সবাই ত অতসী নয়! একটা উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাস রুদ্ধ ক'রে সত্যেন আবার এক-পা দু-পা এগিয়ে যায়। পথের দুপাশে চলে কত ভিকিরী; কেমন অভ্যস্ত তারা। কেউ মাটিতে বুক টেনে টেনে চলেছে, কারো সর্বাঙ্গ পক্ষাঘাতে থর থর ক'রে কাঁপে। কোথাও বড় রাস্তার মোড়ে একটি তরুণী ঘোমটায় মুখ ঢেকে ব'সে আছে, কোলে একটি ছেলে; আঁচলটা বিছিয়ে রেখেছে মাটিতে; মুখে ফুটে কারো কাছে চায় না, শুধু নমস্কার করে—অস্পষ্ট ভাষায় মাঝে মাঝে রিক্ত

জীবনের করুণ ইতিহাস জানায়। ক্বচিৎ কোন পথচারী আঁচলে দিয়ে যায় একটি পয়সা, না হয় আধলা।

সত্যেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে—কোথায় এর শেষ, এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার! ভাবতে ভাবতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে একজন অন্ধ ভিকিরী কাকুতি জানায়। ব্যস্ত জনতার কানে তার কাতর আবেদন পৌঁছয় না। পয়সা নয়, সে শুধু চায় চক্ষুষ্মানের হাত ধ'রে যানবহুল পথটা পার হতে। জীবনের পথে অমনি অন্ধের হাত ধ'রে কত চক্ষুষ্মান নিয়ে চলেছে দেশ হ'তে দেশান্তরে। কিন্তু পৃথিবীর পথে একটি অসহায় অন্ধ পথিক হাত বাড়য়ে কোন দরদী পথিকের নাগাল পায় না।

সত্যেনের চমক্ ভাঙে! বুড়োকে রাস্তাটা পার ক'রে দিয়ে আবার ফুটপাথ ধ'রে এগিয়ে চলে। পথের বুক কাঁপিয়ে অবিশ্রান্ত ছুটে চলেছে গাড়ী ঘোড়া। ফুটপাথে অসংখ্য পথযাত্রীর তড়িৎ-চঞ্চল গতি যেন আসন্ন প্রলয়ের কথা মনে করিয়ে দেয়। দোকানে দোকানে চলে বেচাকেনা। রাত্রিদিন বয়ে চলে উদ্দাম জীবনস্রোত! ঐশ্বর্যের নানা উপকরণে সমুজ্জ্বল মহানগরী শুধু রিক্ত পথিকের গতিতে পদে পদে দেয় বাধা।

দুপুর গড়িয়ে যায়। ফুটপাথটা আগুনের মত তপ্ত হয়ে উঠেছে। এ-পথ সে-পথ ক'রে সারাটা বেলা ঘুরে এবার সত্যেনের দেহ প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু জোটে নি কিছুই, একটি পয়সাও না। একটি আধলার জন্যে যারা সকাল থেকে সারাটা দিন রৌদ্রে রৌদ্রে

কেঁদে মরছে, তাদেরই জোটে নি একমুঠো মুড়ি; আর ওর জুটবে ক্ষুধার অন্ন!

একটা মুলোকে কাঠের বাক্সে বসিয়ে একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে চীৎকার ক'রে ভিক্ষা চেয়ে চলেছে। উত্তপ্ত ফুটপাথে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে আর একজন অসহায় পঙ্গু। লোকটার চেহারা দেখলে ভয় করে; মনে হয় বেঁচে নেই, প্রাণহীন দেহটায় শ্মশান চেপেছে।—সত্যেন হাসে, ফিকে ম্লান একটু হাসি; ওদের পানে চেয়ে নিজের কথা ভাবতে ওর সত্যি লজ্জা করে।

আবার মোড় ফিরে অন্য পথ ধরে। এ পথে লোকের ভিড় অনেকটা কম। তবুও মাঝে মাঝে গতি ব্যাহত হয় ভিকিরীর আবেদনে।

সামনের দোকানে একটি মাদ্রাজী মেয়ে একখানা ছাপানো সার্টিফিকেট দেখিয়ে ভিক্ষা করে। তার জিভ নেই। একদল লোক ঘিরে দাঁড়িয়েছে সেই তরুণীকে, জিহ্বা-হীনতা পরীক্ষা করতে। মেয়েটির সর্বাঙ্গে ছাপিয়ে উঠেছে ভরন্ত যৌবন। জিভ্ নেই, তাই সে কথা বলতে পারে না; কিন্তু ভাষা তার অফুরন্ত হয়ে ওঠে দুটি চোখে।

দেখতে দেখতে দরদীর সংখ্যা বেড়ে যায়। মেয়েটার আঁচলে এক দুই ক'রে অনেকগুলো পয়সা এসে জমে। কেউ হয় তো কুৎসিত ভাষায় টিপ্পনীও কাটে। চায়ের দোকানের ছোকরাটা পেয়ালা ধুতে ধুতে হঠা[illegible] বাড়িয়ে গম্ভীর সুরে উপদেশ দেয়—'রাতের কারবারে জোর দিয়ে, দিনের ব্যবসাটা উঠিয়ে দাও না বাবা! বেশ ত বয়েস আছে এখন।'

সত্যেনের দৃষ্টিটা কেমন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে; মনের অস্বস্তি বেড়ে যায়।

মুমূর্ষু পৃথিবী

মেয়েটা বাংলা কথা বোঝে না ব'লেই বোধ হয় ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে। একটু-আধটু বুঝলেও, না-বোঝার চেষ্টাই সে বেশী করে।

পা দুটো অসাড় হয়ে আসে। গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন এমনি নিষ্ফল চলা আর কত সইবে!

ঝির্ ঝির্ শব্দে রাস্তার কলটা থেকে জল পড়ছে। বুকে সাহারার পিপাসা, তবুও ইচ্ছে করে না মিছেমিছি ওই জল গিলে শরীরটা ভারী করতে। মুড়ির দোকানে বুড়ীটা বড় বড় ফুলুরি ভাজে। তেলে ভাজা খাবারগুলোর কি সুন্দর সোঁদাল গন্ধ! কতকাল আগে, সেই ছেলেবেলায় চুরি ক'রে কবে তেলেভাজা কিনে খেয়েছে, আজ আর সে কথা স্পষ্ট মনেও পড়ে না। মায়ের ভয়ে বাড়ী আনবার উপায় ছিল না; রাস্তায় লুকিয়ে লুকিয়ে খেয়ে আসতে হ'ত।

দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে সত্যেন আনমনে কি ভাবে। বলি বলি ক'রেও বলতে পারে না।

তের-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে কোলের কাছে এক-কূলো খই নিয়ে ব'সে ব'সে ধান বাছে। মেয়েটা হয় ত বুড়ীরই কেউ—মেয়ে, না হয় নাতনি। না-কিশোরী, না-তরুণী! বেশ শান্ত চেহারা; প্রত্যেকটি অঙ্গে যেন অফুরন্ত প্রাণের সাড়া।

হঠাৎ বিচারবুদ্ধিটা কেমন ঘোলা হয়ে ওঠে। সংযমের বাঁধন কখন অজ্ঞাতে শিথিল হয়ে যায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে [illegible] মেয়েটার সুমুখে আঁচল পেতে সত্যেন ব'লে ফেলে—এক পয়সার খাবার দেবে খুকি? মুড়ি, না হয় তেলেভাজা! পয়সাটা কাল দিয়ে যাব।

মুমূর্ষু পৃথিবী

ভদ্রলোকের মত চেহারা, কিন্তু পায়ে জুতো নেই, পরনে কিট্‌কিটে ময়লা একখানা কাপড়, গায়ে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি! মেয়েটি হতভম্বের মত চেয়ে থাকে। এমন ক'রে ওর কাছে কেউ কোন দিন চায় নি। প্রতিদিন যারা দোকানে আসে যায়, তারা যেন চাইতে জানে না; শুধু জুলুম করে। খই-এর ডালাখানা সরিয়ে রেখে, সামনের দিকে একটু ঝুঁকে সে চাপা-গলায় জিজ্ঞেস করে—কি নেবে বললে? মুড়ি!

এক পয়সার তেলেভাজা। পয়সাটা পরে দিয়ে যাব। এই সামান্য কথাটুকু বলতেই যেন সত্যেনের শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। প্রথম—ওর জীবনে এই প্রথম চাওয়া।

মেয়েটা কি ভাবে। দেবার ইচ্ছা হলেও, দিদিমার ভয়ে ইতস্তত করে। একজন অচেনা পথের লোককে হঠাৎ ধার দিয়ে ফেলতে সাহস হয় না। অথচ এক কথায় জবাব দিতেও বাধে। মেয়ে তো! সত্যেনের শুক্‌নো মুখখানা বোধ হয় নিমেষে তার স্বচ্ছ মমতায় ছায়াপাত করে। মনে হয়, খুব খিদে পেয়েছে ওর! নইলে, অমন ক'রে চায় কখনও!

আঁচলটা বাড়িয়ে সত্যেন আবার বলে—'দেবে খুকি! পয়সা আমার কাছে নেই কিন্তু!'

এবার বুড়ীর কানে পৌঁছয়! ছান্‌তাখানা জোরে কড়াই-এর উপর ঠুকে সে চীৎকার ক'রে ওঠে—'পয়সা নাই ত খাবার সখ কেনে? মরতে ঠাঁই পেলে না আর!'

সত্যেন চম্‌কে উঠল। ছি ছি, এ কি ক'রে বসল সে! লজ্জায়—ঘৃণায় ওর সমস্ত সত্তা যেন মুহূর্তে আড়ষ্ট হয়ে আসে। এর আগে ওর মৃত্যু হ'ল না কেন?

মুমূর্ষু পৃথিবী

তারপর প্রায় একঘণ্টাকাল কি-ভাবে যে কেটে গেল, সত্যেন তা ভাবতেও পারে না। মাথার মধ্যে কেমন একটা যন্ত্রণা হয় পেটের ভিতর থেকে থেকে মোচড় দিয়ে ওঠে। শরীরটা পায়ে পায়ে মাতালের মত টলে। মনে হয়, পা বাড়াতে বুঝি উল্টে পড়বে কখন।

তবুও চলে। পথের ক্লান্তি পথেই মিলিয়ে যায়। আকাশের সর্বাঙ্গ বয়ে নামে দিনান্তের অবসাদ।

* * * *

মোড়ের ডাস্টবিন্‌টা ঘিরে দাঁড়িয়েছে চার-পাঁচজন ভিকিরী। উলঙ্গ বললেই চলে; পরনে শতচ্ছিন্ন নেকড়ার কৌপীন। চোখে মুখে প্রস্তরযুগের ক্ষুধার্ত মানুষের ছাপ!

রাশীকৃত ছাই, আবর্জনা, কয়েকটা মরা ইঁদুর, পুঁয-রক্তমাখা কতকগুলো ব্যাণ্ডেজের তুলো আর ছেঁড়া কাপড়ের টুক্‌রো! সারাদিন প্রচণ্ড রৌদ্রে আবর্জনাগুলো প'চে উঠেছে। ভ্যান্‌-ভ্যান্‌ করে মাছি। তীব্র দুর্গন্ধে নাকের ভিতটা জ্বালা করে। সেগুলো পাশে ঠেলে রেখে, সেই নরককুণ্ডের ভিতর থেকে ওরা খুঁজে খুঁজে বের করে স্পর্শমণি। অতল কয়লাখনির ভিতর যেন তারা সন্ধান পেয়েছে হীরাজহরতের। ভাত! একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, খানকতক ঝল্‌সে-যাওয়া কলাপাতা, তার মধ্যে কতকগুলো বাসি ভাত!

সত্যেন বিহ্বল দৃষ্টিতে ওদের মুখপানে চেয়ে থাকে। কি উল্লাস! সাম্রাজ্য-জয়ের আনন্দ ফুটে উঠেছে ওদের ক্ষুধাতুর মুখে। দু'মুঠো বাসি ভাত নিয়ে কি কাড়াকাড়ি! কেউ এক টুক্‌রো খবরের কাগজ কুড়িয়ে ভাতগুলো তুলে নিয়ে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করেছে; কেউ

টেনে তুলেছে সেই ভাঙা হাঁড়িটা-সুদ্ধ মুখের কাছে। বাকী লোকগুলো সবুর সইতে পারে নি, ডাস্টবিনের কিনারে বুক দিয়ে মুখগুঁজে ঝুঁকে পড়েছে ; দু হাতে সেই পচা ভাত মুঠোমুঠো করে তুলছে মুখে।

মাথাটা গুলিয়ে যায়। সত্যেন আর সহ্য করতে পারে না। চমকে উঠবার মত স্নায়বিক অবস্থাও বোধ হয় ছিল না তখন। ভাত! একমুঠো পচা ভাতের জন্যে ক্ষুধার্ত মানুষের বুকে কি দুঃসহ আর্তনাদ! পথের দু'পাশে রিক্ত দেবতার করুণ কান্নায় পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে মৃত্যুর ছায়া। মাটির ভিতর থেকে আকাশের বুক পর্যন্ত হাত বাড়িয়েছে জীবন্ত ক্ষুধার কালো প্রেতমূর্তি। ভাত! একমুঠো ভাত!

ভিকিরীর অন্ত নেই। ওদেরই মত পথে পথে ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যা হয়; কিন্তু হাত পেতে কারো কাছে ভিক্ষা চাইতে পারে না, পারবেও না কোনদিন। হাঁটতে হাঁটতে, সত্যেন এসে পড়ল ফিরিঙ্গী পাড়ার একটা হোটেলের সামনে।

মস্ত বড় হোটেল। টেম্পল্-হোটেলের মতই নানা আসবাব; উপকরণের নানা প্রাচুর্য। বিজলী আলোর রোশনাই-উজ্জ্বল এ যেন এক নতুনতর জগত। দেশি-বিদেশী কত রকম লোকই আসে সেখানে। বাইরে সারি সারি মোটর আর ট্যাক্সির ভিড়; ভিতরে সুসজ্জিত কক্ষে চলেছে চলমান জীবনের উৎসব।

হোটেলের ও-পাশে নতুন একটা সিনেমা হাউস্। আগে কোন দিন এর নাম শুনেছে বলেও মনে হয় না। মেজেণ্ডা রঙের ফ্লাড-লাইট দিয়ে সাম্নেটা সাজানো; ফটকের দু পাশে মস্ত বড় দুখানা পোস্টারে গ্রেটা আর নোভারোর ছবি। সত্যেন চলতে

চলতে অন্যমনস্ক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এখানেও ছড়িয়ে পড়েছে মহানগরীর বিপুল জনসমুদ্রের ঢেউ! মেয়েপুরুষের অস্পষ্ট কোলাহল খিলানে খিলানে প্রতিধ্বনিত হয়।

হাত ধরাধরি ক'রে কত পুরুষ আর মেয়ে, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ, প্রৌঢ় দলে দলে চলেছে সিনেমা হাউসের দিকে। ফাঁকে ফাঁকে দু-চারজন বাঙালী ছেলেমেয়েও চোখে পড়ে। ওদিকের ফটকটা পার হয়ে তিনটি বাঙালী মেয়ে এগিয়ে আসে, সঙ্গে দু'জন পুরুষ! সত্যেনের দৃষ্টিটা হঠাৎ কেমন উদগ্রীব হয়ে ওঠে। সংবিৎ ক্ষুধার্ত অবসাদে আচ্ছন্ন, তবু জোর ক'রে নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চায়।

হঠাৎ মনে হল—সুরেখা! সুরেখাই বটে; মাঝের ওই লম্বা মেয়েটি। সত্যি! সন্ধ্যার এই অন্ধকারের মতই সত্যি। সুরেখা মজুমদারকে চিনতে ওর কখনও ভুল হতে পারে না। তবু যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। নিজের উপর কেমন সন্দেহ হয়। চোখ দুটো বার বার রগ্‌ড়ে নিয়ে সত্যেন আরও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবার চেষ্টা করে।—হাঁ, তা-ই; কোন সন্দেহ নেই। সুরেখা ছাড়া কেউ নয়,—হতে পারে না।

সত্যেন ঊর্দ্ধশ্বাসে এগিয়ে যায় ফটকের দিকে। সুরেখার উপর সমস্ত অভিমান নিমেষে উবে যায়। সুরেখা তো কোন অবিচার, কোন অন্যায় করে নি। ও নিজেই তাকে এড়িয়ে চলেছে; নির্মম দস্যুর মত দূরে ঠেলে দিয়েছে।

ওরা তখন পোর্টিকো ছাড়িয়ে ও-পাশের সিঁড়ির সামনে গিয়ে পৌঁচেছে। সত্যেন বিকৃত স্বরে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল—'রেখা!'

ফ্লাড লাইটের এক ঝলক সোনালি আলো এবার ওদের চোখে

মুখে ছড়িয়ে পড়ল। কোথায় রেখা! নিমেষে সত্যেনের চমক্ ভেঙে গেল। ওরা একবার পিছন ফিরে চেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলে। মৃদু হাসির গুঞ্জন তুলে এগিয়ে চলল প্রবেশ-পথের দিকে।

একটি মুহূর্তে আশা ও নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাতে ওর জীবনে যেন শতাব্দীর ঝড় বয়ে গেল। নিমেষে পা থেকে মাথা পর্যন্ত অসাড় হয়ে আসে। ক্ষণিকের বর্তমানটুকু ভাববার শক্তিও এখন আর নেই ওর। অসহায় পঙ্গুর মত বসে পড়ল ফটকটার ধারে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন শরীর থেকে খুলে পড়তে চায়।

প্রায় আধঘণ্টা পর সত্যেনের মুহ্যমান সংবিৎটুকু আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠল। দুর্যোগ রাত্রিশেষে দিনের আলো যেমন ক'রে নতুন জীবনের সংকেত নিয়ে ফুটে ওঠে, তেমনি ক'রে ধীরে ধীরে ফিরে আসে ওর হারানো অনুভূতি।

হোটেলের দোতলার বারান্দা আর ঘরগুলো এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। ডিনার চলেছে। এক একটি টেবিল ঘিরে বসেছে ছোট ছোট এক একটি সমাজ। গল্প, কলরব, কানাকনি!—স্রোতের পর স্রোত বয়ে যায়।...অলক্ষিতে ওর চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে সেই ডাস্টবিন্‌টা; ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ক্ষুধাতুর ভিকিরীর দল!—দুর্গন্ধময় পচা আবর্জনার ভিতর ছড়ানো কতকগুলো বাসি ভাত! মানুষের পরিত্যক্ত কদর্য অন্ন!

সত্যেন উঠে দাঁড়াল। অতিকষ্টে দুই হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। পা দুটো আর চলে না; তবুও চল্‌তে হয়। এবার সে সংকল্প করল অতসীদের বস্তিতে ফিরে যাবে। তার আন্তরিক আহ্বান উপেক্ষা

ক'রে সে ভুল করেছে, মস্ত ভুল। ভিকিরীর আবার ভালমন্দ! ইজ্জৎ?—অতসীর আশ্রয়ে থেকে তার ভিক্ষান্নের একমুঠো ভাগ নেওয়াও ছিল এর চেয়ে ভাল।

আবার পেটের মধ্যে শুরু হয়েছে সেই জ্বালা। মাথা ঘুরছে; গা-টা বমি বমি করে। পায়ে একটু হোঁচট লাগলেই যেন শরীরের সমস্ত শিরাগুলো একসঙ্গে ঝন্ঝন্ ক'রে ওঠে। কাঠের পুতুলের মত প্রাণহীন পা দুটো বাড়িয়ে সে জোর ক'রে ফিরে চলে। তপ্ত মরুপথে এই অকারণ চলার কি শেষ হবে না কোন দিন? বাঁচবার নেশা ওর কেটে গেছে। তবু বাঁচতে হবে! কি হবে এমনি ক'রে মৃত্যুর কোলে তিলে তিলে জীবনের গুণ টেনে?

আঁকা-বাঁকা গলিটা যেখানে বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, তারই পাশে একটা বড় বাড়ীর কোণাচিতে ব'সে একজন ভিকিরী হাতে-মুখে কিসের পাতা ঘষে। লম্বা-চওড়া চেহারা; রাতের আলোতেও পেশিগুলো স্পষ্ট দেখা যায়। মস্ত চেহারা, তবুও লোকটা যে ভিকিরী সে-কথা অনুমান করতে সত্যেনের তিলমাত্র দ্বিধা হ'ল না। ভিকিরীদের মুখ দেখেই ও এখন চিনতে পারে। ওদের না-বলা কথা রাত্রিদিন ওর মর্মে মর্মে প্রতিধ্বনিত হয়।

হাতের তেলোয় কতকগুলো লতাপাতা ঘষে' রস নিঙড়ে লোকটা গায়ে-মুখে মাখে। সত্যেন প্রথম ভেবেছিল—হয় তো কোন ওষুধ, বেদনায় মালিশ দিচ্ছে; না-হয় মশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার চেষ্টায় গায়ে টোটকা লাগাচ্ছে। কিন্তু, আর কোন দিন তো এমন কিছু চোখে পড়েনি!

লোকটার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।—রাংচিতার পাতা সেগুলো!

অনেকক্ষণ একদৃষ্টে তার মুখপানে চেয়ে থেকে, কি ভেবে জিজ্ঞেস করে—'ও গুলো গায়ে লাগাচ্ছ কেন?'

লোকটা হাসে, হো-হো শব্দে হেসে ওঠে। এ হাসির অর্থ সত্যেন ঠিক বুঝ্‌তে পারে না। মনে হয়, লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সে ধারণা বদ্ধমূল হওয়ার আগেই হঠাৎ হাসিটা সাম্‌লে নিয়ে সে বলে—'জান না?'

'না।'

'ঘা, ঘা! দগ্‌দগে ঘা না হলে দেবে না কেউ। এত বড মর্দ্দ! খাটতে পারি না? এই ব'লে সবাই পাশ কাটাবে।'—এবার তার মুখে ফুটে ওঠে ফিকে একটু হাসি; যেমন করুণ, তেমনি ভয়াবহ।

সত্যেন কোন কথা না বলতেই আপনমনে আবার সে ব'লে ওঠে—সাত দিন সাত রাত না খেয়ে লোকের দোরে দোরে ঘুরেছি। কে খাটাবে? কোনখানে কাজ নাই।

নিমেষে পৃথিবীটা যেন টলমল ক'রে উঠল। পায়ের তলায় মাটিটা কাঁপছে! সত্যেনের মুখে আর কোন কথা সরে না। স্থির হয়ে অবস্থাটা একটু ভেবে নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। বুক জুড়ে শুধু ফেনিয়ে ওঠে একটী প্রশ্ন: 'কিসের জন্যে বাঁচবে সে? কেন বাঁচবে?'

মাথার ভিতর চিন্তাগুলো তাল-গোল পাকিয়ে কেমন ক'রে নিমেষে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। এবার আর চেষ্টা করেও নিজেকে সামলে নিতে পারল না।

বিরাট দৈত্যের মত একখানা দোতলা বাস্ মাটি কাঁপিয়ে ছুটে আসছে। অসংখ্য ট্রাম,—মোটর,—গাড়ী ঘোড়া,—লোক। প্রাণপণ

চেষ্টাতেও সত্যেন নিজেকে সংযত করতে পারল না। মাথার মধ্যে তখন মহা প্রলয় শুরু হয়েছে। দেখতে দেখতে ঝড়ের বেগে লাফিয়ে পড়ল চলন্ত বাস্‌খানার সাম্‌নে।

ব্যস্ত জনতা শঙ্কিত চীৎকারে 'হাঁ হাঁ' ক'রে উঠল। যাত্রীরা কলরব ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেছে গাড়ীর ভিতর; ড্রাইভার প্রাণপণ শক্তিতে বাস্‌খানা তখন ব্রেক ক'রে ফেলেছে।

মোড়ের পাহারাওয়ালা এসে পিছন থেকে জোরে ধাক্কা দিয়ে সত্যেনকে ঠেলে দিল ফুটপাথের দিকে। অনাহারক্লিষ্ট শরীরে আকস্মিক উত্তেজনার পর সে-ধাক্কা সে সাম্‌লে নিতে পারল না। মূর্চ্ছা-হতের মত মুখ গুঁজে পড়ল গিয়ে পেভমেণ্টের পাথরে।

সংজ্ঞা ছিল না, তা নয়। কিন্তু এমনি নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে ওর মস্তিষ্ক আর স্নায়ুগুলো যে, অত বড় একটা আঘাত অনুভব করবার শক্তি পর্যন্ত নেই। কপাল বয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। পেভমেণ্টের পাথরে চোট লেগে বাঁ দিকের ভ্রূর উপরটা অনেকখানি কেটে গেছে, কিন্তু সে বুঝতেও পারেনি।

কিছুক্ষণ পর যন্ত্রণা শুরু হ'ল। কপালটা দপ দপ করে। মাথার মধ্যে যেন জাঁতাকল চলেছে। এখন আর চেষ্টা ক'রেও উঠে দাঁড়াতে পারে না। একহাতে কপালটা চেপে ধ'রে, অন্য হাতে ভর দিয়ে পিছিয়ে যায় ফুটপাথের একটি পাশে।

কতক্ষণ সেই ভাবে বসে ছিল, সত্যেন নিজেও তা জানে না। তখন রাত্রি প্রায় দশটা, রাস্তায় লোক চলাচল অনেক কমে গেছে।

হঠাৎ চমক ভাঙল: গায়ে হাত দিয়ে কে যেন ডাকে—'এখানে এমন ক'রে বসে আছ যে?'

সত্যেন বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে। আবছা আলোতে ঠিক চিনে উঠতে পারে না।

মৃদু একটু নাড়া দিয়ে সে আবার জিজ্ঞেস করে—'সারাদিন জোটেনি বুঝি কিছু?'

'না।'—মুখপানে একদৃষ্টে চেয়ে সত্যেন বিহ্বলভাবে ব'লে উঠল—'অতসী! তুমি?' কণ্ঠস্বর যেন কান্নায় রুদ্ধ হয়ে আসে।

'হাঁ, আমি। আবার তেমনি না-খেয়ে পথে পথে গড়িয়ে বেড়াচ্চ ত?'

সেই দাবী! পর্য্যাপ্ত আত্মীয়তার অনুযোগ! সত্যেন বিশ্বাস করতে পারে না। জীবনটার আগাগোড়াই এখন দুঃস্বপ্ন ব'লে মনে হয়। হয় তো সিনেমা হাউসের স্বরেখার মত এও একটা ভুল; হ্যালুসিনেশান।

কি বলতে চায়, কিন্তু পারে না; ঠোঁট দুখানা কাঁপে। ভুল ভেঙে যাবার আতঙ্কে জিভটা জড়িয়ে আসে। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে অতসীর মুখপানে।

ভর্ৎসনার সুরে অতসী বলে—'হরি-মটর ক'রে দিনরাত পথে ঘুরে বেড়ানো কি তোমার রোগ দীনু? চারদিন ধ'রে সারা শহর ঘুরেও টিকি দেখবার জো নাই! সেই থেকে উপোস চলছে তো?'

দীনু একটু ইতস্তত ক'রে উত্তর দেয়—'না।'

'না কেন? আমি জানি। কিন্তু এমনি ক'রে রাজ্যিময় টহল না দিয়ে, বাসায় ফিরে দু'দণ্ড শুয়ে থাকলেও ত পারতে!' বলতে

বলতে অতসী হঠাৎ চমকে উঠল—'ও কি ! কপালে—?' একটা অস্ফুট কাতর শব্দের সঙ্গে ব'সে পড়ল ওর পাশে।

—'কি করে কাটল অতখানিটা ? পড়ে গেছলে বুঝি মাথা ঘুরে ?'

'হাঁ। মাথা ঘোরে নি ; তবে কেমন গোলমাল হয়ে গেল, হঠাৎ সামলাতে পারিনি।'—কথা বলতেও সত্যেনের কষ্ট হয়।

অতসী সস্নেহে ঘাড়ে একটা হাত দিয়ে অন্য হাতে মুখখানা আলোর দিকে ফিরিয়ে নিয়ে দেখতে লাগল। প্রায় তিন-আঙুল লম্বা হয়েছে ক্ষতটা ; তখনও চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়াচ্ছে।

দুজনেই নীরবে কি ভাবে। অতসীর চোখে জল আসে। তাড়াতাড়ি দুর্বলতাটুকু গোপন ক'রে, আঁচল দিয়ে দীনুর কপালের নীচেটা মুছিয়ে দিয়ে বলে—আমার হাত ধ'রে আস্তে আস্তে যেতে পারবে না ?

'পারব'—সত্যেন আর দ্বিধা না করে তখনি উঠে দাঁড়ায়। শরীরের সমস্ত জড়তা নিমেষে ঝেড়ে ফেলে মনটা যেন আবার সবল হয়ে ওঠে।

অতসী শঙ্কিত হয়। সত্যেন ওর হাতখানা ধ'রে সামনের দিকে একটু টান দিয়ে বলে—'চল ! ও কি ! কাঁদছ অতসী ?'

'না।'—তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে দীনুর পাশে এসে দাঁড়ায়। তারপর দুজনে এগিয়ে চলে। এক নিঃস্ব আর-এক নিঃস্বের হাত ধ'রে অতিবাহন করে অলকাপুরীর পথ।

'আমায় একবার হাসপাতালে নিয়ে যেতে পার অতসী ? একটু ওষুধ লাগিয়ে নিতাম কপালটায়।'—একটা দীর্ঘশ্বাসে বুকখানা যেন খালি হয়ে পড়ে।

এবার অতসী হেসে ওঠে। 'ওষুধ ! ভিকিরীকে ওষুধ দেয় কেউ ? দেখ না, এক কৌটা ওষুধ পাবে ব'লে হাসপাতালের ধারে কত রুগী

প'ড়ে থাকে ! ওরা অমনি রাস্তায় প'ড়ে মরে, কেউ একবার ডেকেও জিজ্ঞেস করে না ।—বাসায় চল, নেকড়া পুড়িয়ে পলস্তারা ক'রে দেব ।'

'ঠিক বলেছ অতসী । ভিকিরীর আবার ওষুধ ! যারা অসহায় তাদের জন্যে তো নয় ওই সব আয়োজন ।'—ওই বড় বড় দালান-কোঠা, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা !—এত দুঃখের ভিতরেও সত্যেনের মুখে ফুটে ওঠে ক্ষীণ একটু হাসি ।

কতবার সে দেখেছে, ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডগুলোর সামনে—হসপিটালে গেটের দুপাশে পড়ে থাকে কত মুমূর্ষু ভিকিরী ; যন্ত্রণায় ছটফট করে । মাথার কাছে একটা ভাঁড়ে একটু জল, তাও হাত বাড়িয়ে নেবার শক্তি নেই ।—ব্যস্ত জনস্রোত পাশ কাটিয়ে চলে যায় । জীবন্ত মানুষের পথে তারা শুধু কবন্ধের মত রাত্রিদিন দেয় বাধা ; আবর্জনার মত পৃথিবীর মুক্ত বাতাসকে পংকিল ক'রে তোলে ।

সত্যেন ক্রমোই যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়ে । শরীরটা অবসন্ন হয়ে আসে ; পা দুটো সমানে পড়ে না ।

অতসী জিজ্ঞেস করে—"খুব যাতনা হচ্ছে দীনু ? বাসা পর্যন্ত যেতে পারবে না ?"

মুখে বলে, পারব ; কিন্তু শরীর আর চলে না । সর্বাঙ্গ কাঁপে ।

অতসী বুঝতে পারে । সত্যেনের হাতখানা নিজের ঘাড়ের উপর তুলে নিয়ে বলে—'একটু জিরিয়ে নাও ! ক'দিন না খেয়ে একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছ । আমি জানি, তুমি কারো কাছে চাইতে পার নি ।'

'না ।'—অতসীর ঘাড়ে ভর দিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে । এই দুর্বহ জীবনের ভার আর বইতে পারে না ।

মুমূর্ষু পৃথিবী

'একটু আইডিন, না হয় বেনজইন দিলে ব্যথাটা কমত।' সত্যেন ধীরে ধীরে মাটিতে ব'সে পড়ল।

অতসী তাড়াতাড়ি ওর মাথাটা বুকের কাছে চেপে ধরে বলে—'কোথায় পাব ওষুধ? একটু থির হও, আপনি কমে যাবে।'

অতসীর কথা শুনে সত্যেনের কান্না পায়। ও ভাবতে পারে না, এত দরদ কেন!

ভোর না হতেই ওঠে কলরব; রূপকথার প্রেতপুরীতে যেন হঠাৎ যুদ্ধের বাঁশী বেজে ওঠে। অবসন্ন পৃথিবীর বুক থেকে তখনও ঘুমের পর্দা সরে না; তন্দ্রাতুর বাতাসের সর্বাঙ্গে আলিঙ্গনের মাদকতা। শীতার্ত কম্পনের মত ঝিরু ঝিরু শব্দে ভেসে আসে অসংখ্য নিঃস্বের অস্ফুট করুণ আর্তনাদ। মাঝে মাঝে সবল কণ্ঠের চীৎকার, আর সেই সঙ্গে ভাঙা টবের বাক্সগুলোর খটখট শব্দ চাবুক মেরে জড়তাচ্ছন্ন মনটাকে সচেতন ক'রে তোলে।

ওদের কণ্ঠস্বরে যেন মরচে ধ'রে গেছে। ওই একঘেয়ে কান্নায় এখন আর এমন একটু ধার নেই, যাতে ক'রে মানুষের বুকে এতটুকু করুণার স্পর্শ পৌঁছে দিতে পারে। আকাশে ওর প্রতিধ্বনি হয় না। বেসুরো পর্দার এলোমেলো শব্দ শুধু ভোরের বাতাসকে ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে। ছিচকাঁদুনে ছেলের মত রাতদিন ঘ্যান্ ঘ্যান্ ক'রে ওরা যেন সত্যিকারের কান্না ভুলে গেছে। টবের গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দের সঙ্গে এক একটি সুর আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যায়। ভোর চারটেয় শুরু হয়েছে, পাঁচটা বাজবার আগেই সমাপ্ত হয়ে গেল ওদের উদ্যোগ-পর্ব। আর কান্না নেই, শব্দ নেই; কোলাহল থেমে

আসে। এ পাশের ঘরগুলোয় বোধ হয় তখনও কেউ জাগেনি। আবার তেমনি নিঝুম হয়ে পড়ে সারা বস্তিটা! হাল্‌কা ঘুমের আবেশ-টুকু আবার দেখতে দেখতে চোখের পাতায় ঘন হয়ে আসে।

বস্তির এ পাশের ঘরগুলোয় থাকে ভাড়াটেরা, ও পাশের লম্বা চালাঘরগুলোয় ঠিকে ভিকিরীদের আড্ডা। শেষ দিকের বড় দুখানা ঘরে থাকে মাণিক পেয়াদা, পদ্ম আর রাধা বোষ্টুমী। মাণিক ভিকিরীদের ঠিকেদার। অন্ধ-নুলো ভিকিরীও লোকে সে-ই পোষে। পদ্ম ওদের রাঁধুনী। রাধা বোষ্টুমী মাণিকের রক্ষিতা। এ ছাড়া আরও দু-একজন আছে, যারা মাণিক পেয়াদার কেনা-গোলাম। পেটভাতায় তাঁবেদারি করে।

গন্নাকাটা ছিপ ছিপে মেয়েটার নাম পদ্ম। গায়ের রং কালো, কিন্তু দেহের গঠন ওর সত্যি ভাল। হ'লে কি হয়, মেয়েটা যেন অগ্নিচক্রের ঘুমন্ত নাটাই। সারা বস্তিটায় না-হবে-ত একশো পাক দেয় রাতদিনের ভিতর। ভাঙা কাঁসরের মত গলার ট্যাঁক-টেঁকে আওয়াজ প্রতি মুহূর্তে প্রতিধ্বনিত হয় বস্তির এঘর থেকে সে-ঘরে। মাণিকের আড্ডায় প্রায় চল্লিশ জন নুলো ভিকিরী আছে। পদ্ম একাই তাদের ভাত রাধে; আর অবসর সময়ে টহল দিয়ে বেড়ায় ভাড়াটেদের ঘরে ঘরে। এলিজাবেথ মারবারির মত ওর অখণ্ড প্রতাপ একদল যাযাবরের উপরে আধিপত্য বিস্তার ক'রে আছে। বস্তির মেয়েরা ওকে দস্তুরমত ভয় করে। পুরুষের চেয়ে মেয়েদের উপরেই ওর তোক বেশী। কাঁচা বয়েসের মেয়ে দেখলে পদ্ম যেন ক্ষেপে ওঠে।

রাত না পোহাতেই মাণিকের লোকেরা নুলো ভিকিরীগুলোকে রাস্তায় রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে আসে; আবার তাদের ফিরিয়ে আনে

রাতের অন্ধকারে, যখন পথে লোক চলাচল কমে যায়। সারাটা দিন রোদবৃষ্টি মাথায় ক'রে পথে পথে কেঁদে ওরা যা রোজগার করে, তার পাই-পয়সাটি পর্যন্ত জমা দিতে হয় মাণিকের আখড়ায়। সে যোগায় ওদের দিনান্তের এক মুঠো ভাত আর পরনের একফালি জীর্ণ বস্ত্র।

অতসীদের বস্তিতেই সত্যেন ছোট একখানি ঘর নিয়েছে, দৈনিক ৬ পয়সা ভাড়ায়। সত্যেন ভাড়া নিয়েছে, তা ঠিক নয়; অতসীই জোর ক'রে আটকে রেখেছে তাকে, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কঠিন ব্যামো ধরবে সেই ভয়ে। সে চায়নি ওদের বস্তিতে আশ্রয় নিতে, কিন্তু অতসীর অসহায় করুণ দৃষ্টি পলে পলে বাধা দিয়েছে ওর দুরন্ত মনের গতিকে। এই ভিকিরী মেয়েটার দাবীকে অবহেলা করতে ওর সাহস হয় না, মন কেমন দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ উৎপীড়িত বন্দীর মত অন্তর ক্ষণে ক্ষণে বিদ্রোহ ক'রে ওঠে। ওর সব চেয়ে বড় দুঃখ এই যে অতসীকে ও কোনরকমেই বোঝাতে পারে না—এ বস্তির চেয়ে ওই রাজপথ ওর কাছে কত বড়। আকাশের বুক থেকে যে গ্রহ ঠিক্‌রে পড়েছে, মাটির বুকে সে চায় না আশ্রয়; তার চেয়ে মহাসাগরের অতল গহ্বরে সে মিলিয়ে যেতে চায়। কল্লান্তের স্রোতে বুদ্‌বুদের মত যারা ভেসে চলেছে, কে রাখে তাদের হিসাব। সত্যেনও ঠিক তেমনি করেই মিলিয়ে যেত পথের ওই প্রবহমান জনস্রোতে, লোকচক্ষের অন্তরালে।

কেরোসিন কাঠের ফ্রেমে ক্যানিস্তারের টিন-আঁটা দরজাটা বাতাসের ছোঁয়াতেই যেন থর্‌থর্‌ করে। উপরের ফাঁকগুলো দিয়ে ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘরের ভিতর।

মুমূর্ষু পৃথিবী

সত্যেনের চোখে ঘুম একটি মুহূর্তের জন্যেও নামে না। মাঝে মাঝে অবসন্ন দেহমন তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়।

দরজাটায় টোকা দিয়ে অতসী ডাকে—'দীনু!'

তন্দ্রা টুটে যায়। সত্যেন উঠে বসবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। সর্বাঙ্গে যেন পাষাণ চাপানো; ব্যথায় হাত পা জড় হয়ে গেছে; কপালের ঘা-টা আওরে উঠেছে। হয় ত জ্বরও হয়েছে।

দরজাটা খোলাই ছিল। চাপা গলার আড়ষ্ট শব্দে অতসীর বুঝতে দেরী হ'ল না যে, আজ আর দীনুর উঠবার শক্তি নেই। দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে এসে একবার সে স্থির হয়ে দাঁড়াল বিছানার পাশে। ছেঁড়া একখানা মাদুর, আর অতসীর ব্যবহার করা কতকালের পুরান সেই ময়লা বালিসটা! নির্বিকার ভাবে সত্যেন সর্বাঙ্গ ঢেলে দিয়েছে ওই জীর্ণ শয্যায়। পৃথিবীর কোলে এমন করে যেন কতকাল ও নিজেকে ছড়িয়ে দিতে পারেনি। বিছানাটার দিকে চেয়ে অতসী নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে! ওকে শুতে দেবার মত একখানা কম্বল, একটা ফর্সা বালিসও যদি থাকত ওর!

'কে? অতসী!'—সত্যেন ব্যথিত দৃষ্টিতে চায়।

'শরীর কি আজ ভাল নয় দীনু?'—বলতে বলতে অতসী ব'সে পড়ল মাদুরখানার একটি পাশে।—'এ যে জ্বর! গায়ে আগুন ছুটছে।'—কপালে হাত দিয়ে দেখে।

'ও কিছু নয়। ক'দিন ঠাণ্ডা লেগেছে কি-না, তাই'—হাতের তেলোয় মাথাটা রেখে কনুই ভর ক'রে সত্যেন একটু আড় হয়ে বসল।

মুমূর্ষু পৃথিবী

অতসী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চায়। ভাবতে পারে না—কি করবে! গালকের সঞ্চয় ওর কালই হয়েছে শেষ। আবার নতুন দিনের সূর্য উঠেছে আগামী দিনান্তের আসন্ন হাহাকার নিয়ে। একমুঠো চাল আর কয়েকটা আধলার জন্যে অন্ধ বাপের হাত ধ'রে এখনি শুরু হবে ওর দৈনন্দিন খেয়া।

অতসীকে নীরব দেখে সত্যেন হেসে বলে—'কি ভাবছ অমন ক'রে? ভিক্ষেয় যাবে না!'

'সারাটা দিন একলা থাকবে তুমি?'—কি বলতে গিয়ে হঠাৎ কথাটা ফিরিয়ে নিয়ে অতসী আবার বলে—'আজ আর চাকরির খোঁজে বেরিও না যেন, অত জ্বরে—'

'না, বেরুব না; তা ছাড়া, চাকরিই বা দেবে কে? কাল যেটা সম্ভব ব'লে মনে হয়েছে, আজ ভাবতে গেলে সেটাও বিকার ব'লে মনে হয়। পদ্মায় যখন ভাঙন ধরে, তখন বাঁশের পিন দিয়ে তার গতিরোধ করবার চেষ্টা করতে সত্যি লজ্জা করে।'—সত্যেন হাসে, অদ্ভুত রকমের একটা বিচ্ছিন্ন হাসি।

অতসী কোন জবাব দেয় না। হয় ত সত্যেনের কথাগুলো ও ঠিক বুঝে উঠতে পারে না; না-হয়, অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবে।

আপনমনে সত্যেন আবার বলে, অজিজ্ঞাসিত প্রলাপ কাহিনীর মতই ওর কথাগুলো যেন স্রোতের মুখে আপনা আপনি বেরিয়ে আসে।—'কাল গিয়েছিলাম পটলডাঙ্গার একটা মেসে, বাসন-মাজা চাকরের কাজ খুঁজতে। খালি ছিল একটা। কিন্তু নিতে চায় না ওরা। সবাই বলে 'স্পাই।' সত্যি ত! অন্য কিছু ভাবতে পারে না ওরা। কেন ভাববে? শুধু স্পাই মনে করা ও ছাড়া যে

আর বেশী কিছু তাদের মগজে যোগায় নি, সেইটাই ভাগ্য অতসী! সেইটাই সৌভাগ্য আমার।'

অতসী বোঝে না স্পাই কাকে বলে। বোকার মত সত্যেনের মুখপানে চেয়ে সে বলে, 'গরীবদের সবাই অমন গালাগাল দেয়; তাই ব'লে কি মান করে বসে থাকা চলে!'

সত্যেন হো হো শব্দে না হেসে পারে না;—'গালাগাল নয়, ইজ্জৎ! স্পাই কাকে বলে জানো? যারা গোয়েন্দার খবরদারি করে।'

'ওঃ'—ব'লে অতসী উঠে দাঁড়ায়। গোয়েন্দা কাকে বলে, তাও সে জানে না। দীনু হয়ত টের পেলে এখুনি তাই নিয়ে মাষ্টারি আরম্ভ করবে। ওদিকে বাবা তাগিদ সুরু করেছে। পদ্ম এর ভিতর তিনবার এসে উঁকি দিয়ে গেছে দীনুর ঘরে। ফাঁক পেলেই পদ্ম কখন একটা বেফাঁস কিছু ব'লে বসবে। ওই গলাকাটা মেয়েটাকে অতসীও কম ভয় করে না।

দু'পা এগিয়ে গিয়ে অতসী কি ভেবে আবার পিছিয়ে এল। একটু ইতস্তত ক'রে হঠাৎ ব'লে ফেলল—'পালিয়ে যাবে না ত দীনু?'

কথাটা বলবার আগে যে সঙ্কোচ ওকে বাধা দিচ্ছিল, বলবার পর যেন সেটা আরও বেশী আড়ষ্ট করে তুলল।

'না।'—সত্যেন হাসে। তার চোখেমুখে হঠাৎ কেমন একটা ভাবান্তর দেখা দেয়।

অতসী শঙ্কিত হয়ে ওঠে। ওর মনে হয়, দীনুর বোধ হয় মাথায় একটু গোলমাল হয়েছে।

একটু ইতস্তত করে অতসী বলে—'তুমি যে এখানে থাকতে পারবে না, তা জানি। আর কেনই বা থাকবে? ভিকিরীদের বস্তিতে তোমাকে জোর ক'রে আটকে রাখব না। তবুও যে ক'টা দিন আছো, তাই খুব। একটা কাজের যোগাড় হ'লে, ভাল জায়গা খুঁজে নিও; তখন বিরক্ত করতে যাব না।'

সত্যেন একবার কপালটায় হাত বুলিয়ে কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ ক'রে বসে রইল। অতসীকে কি ব'লে ওর মনের কথা বোঝাবে, তা ভেবে পায় না। অশিক্ষিতা ভিকিরীর মেয়ে। রাতদিন কেঁদে কেঁদে হাত পাতে মানুষের কাছে, কিন্তু তার বুকের ভিতর যে উদ্‌গ্রীব দেবতা রাত্রিদিন একান্তে জেগে আছে—সে শুধু চায় সেই মুষ্টিভিক্ষার অন্ন মুঠো মুঠো করে বিলিয়ে দিতে।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে! বেলা কম হয়নি। এর পর দুপুর-রোদে কেমন করে ঘুরবে পাড়ায় পাড়ায়?'—সুস্থ স্বাভাবিক কণ্ঠে সত্যেন অতসীকে বিদায় দেয়।

কিন্তু অতসীর মুখে যেন কেমন একটা ভয়। মনের দ্বিধাটুকু সে কোন মতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না। সত্যেনের মুখপানে চেয়ে আবার সঙ্কোচের সঙ্গে বলে, 'দিনের বেলায় রান্না করতে পারি না। দু'মুঠো চাল যদি থাকত, দোকানে বদল দিয়ে চাট্টি মুড়িমুড়কি এনে দিতাম। সারাদিন না খেয়ে তোমার খুব কষ্ট হবে। শরীর তো তাজা নাই।'

'কোন কষ্টই হবে না! তোমায় তো বলেছি অতসী, কষ্ট আমার হয় না আর। আগে খেতে না পেলে কষ্ট হ'ত; কিন্তু এখন বেশ সয়ে গেছে। এখন বরং খাবার পেলেই কষ্ট হয় বেশী। তোমাদের

বঞ্চিত ক'রে নিজের পেটটা ভরাতে চোখে জল আসে। না খেতে পাওয়ার কথা আর ভাবি না। আমি ভাবি—'

'কি ভাব তুমি?'—অতসী তটস্থ হয়ে ওঠে। হয় তো দীনু হঠাৎ ব'লে ফেলবে সেই কথা, যা ও প্রতিনিয়ত আশঙ্কা করে। তবুও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, থামলে যে! বল না, বল কি ভাব তুমি?'

'কিছু না।'—একটা দীর্ঘশ্বাসে সত্যেনের অনাহারক্লিষ্ট শরীরটা যেন কেঁপে ওঠে।

'কিছু না, নয়। জানি, কি বলতে চাও। আমাকে তুমি ভুল বুঝ না।'—অতসী নীরব হয়ে যায়। ওর চোখদুটো জলে টলটল করে। কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলে—'আচ্ছা দীনু, আমরা ভিকিরী ব'লে এখানে থাকতে তোমার ঘেন্না হয়?'

'অতসী!'—সত্যেনের কণ্ঠস্বর কান্নার আবেগে রুদ্ধ হয়ে আসে; মুখখানা হঠাৎ লোহার কাঠামোর মত শক্ত হয়ে ওঠে।

অতসী চম্‌কে ওঠে। এমন স্বর ও সত্যেনের কথায় কোন দিন শোনেনি। কথাটা ব'লে ফেলে যে কি অন্যায় করেছে, সেটা বুঝতে অতসীর দেরী হ'ল না, একটু থতমত ক'রে লজ্জিত হয়ে বলে,—'আমি আর কিছু ভেবে বলিনি। শুধু আমরা নই; এখানকার সবাই পথ-ভিকিরী। তাই বলছিলাম—হয় তো এখানে থাকতে তোমার কেমন মনে হতে পারে।'

সত্যেন ততক্ষণে সাময়িক আবেগটুকু সামলে নিয়েছে। শান্ত স্বাভাবিক সুরে উত্তর দিল,—'এতবড় দুনিয়ায় দীনুর জায়গা যে কোথায়, তা কেমন ক'রে বুঝবে অতসী। ভিকিরীদের কুঁড়েতে আজ

যেটুকু জায়গা আছে, সেটুকুও দুনিয়াতে আর নেই কোথাও। ঘেন্না আমার হয় না ; হয় লজ্জা। সুস্থ দেহে ভিক্ষান্নের ভাগ নিতে পারছি না আর।'

অতসী আবার সরে এসে বসল ওর পাশে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মত নিবিড় হয়ে।—'ভিক্ষে তোমাকে করতে হবে না। আমি পাঁচ-বাড়ী ফিরে যা রোজগার করি, তাতে তোমারও জুটবে এক মুঠো। না হয় আরও বেশী করে ঘুরব। ক'দিনই বা! পুরুষ মানুষ, শরীরটা সেরে উঠলে; আজ না হোক, দু'দিন পরেও ত একটা কিছু জুটবে।'

হাসিও পায়, কান্নাও আসে। ওর সহজ সরল বিশ্বাস, পুরুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই সুনিশ্চিত কল্পনা, দেখে সত্যেন না হেসে পারে না। অতসীর পিঠে হাত দিয়ে বলে—'তাই হবে, এখন ভিক্ষেয় যাও।'

নিশ্চল দারুমূর্তির মত ব'সে অতসী ভাবে। পাশের ঘর থেকে ওর বাবা তাগিদ দিচ্ছে। এতবেলা অবধি রাধা বোষ্টমীর ঘরখানায় ঝাঁট দেওয়া হয়নি ব'লে, সে চীৎকারে পাড়া মাথায় ক'রে তুলেছে ; পদ্মকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দেয়। ওদিকের চাতালে মাণিক পেয়াদার তর্জন শোনা যায়। ভিক্ষের পয়সা গোপন ক'রে মুড়ি কিনে খেয়েছিল ব'লে, একটা খোঁড়া ভিকিরীকে শাস্তি দিচ্ছে সে। চাপা কান্নার শব্দে বস্তির ঘরে ঘরে যেন দীর্ঘশ্বাসের প্রতিধ্বনি হয়।

আস্তে আস্তে দরজাটা টেনে দিয়ে অতসী আবার বলে—'পালিও না কিন্তু।'

বাইরে পা বাড়াতেই সে আঁৎকে উঠল পদ্মকে দেখে। উপরের কাটা-ঠোঁটখানা চাপা হাসিতে বক্র ক'রে একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে

অতসীর দিকে চেয়ে সে বলে, 'কি লো অতসী! ভিক মাগা বন্ধ করলি নাকি?'

অতসী কোন উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে' গেল, কিন্তু আশঙ্কায় ওর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল আজ। পদ্মর স্বরূপ ও খুব ভালভাবেই জানে। ওই হাসিটুকু ছাপিয়ে ও-বেলায় ফেনিয়ে উঠবে সাত সাগরের বিষের ঢেউ।

জনবিরল বস্তিতে কর্মহীন মধ্যাহ্ন যেন ঝাঁ ঝাঁ করে। সেই মুলো ভিকিরীটা, পদ্ম, আর মাঝে মাঝে রাধা বোষ্টুমী ছাড়া আর কারও কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। একটা খেঁকি কুকুর মস্ত জিভ বের ক'রে অকারণ হাঁপিয়ে বেড়ায় এ-ঘর থেকে সে-ঘরের দরজায়। টপ টপ ক'রে জল ঝরে তার লোলুপ জিভটা বয়ে'।

সত্যেন তেমনি গুটিশুটি দিয়ে জড়পদার্থের মত বিছানায় পড়ে থাকে। কিছুই ভাল লাগে না; এমন কি, বাঁচতে পর্যন্ত ক্লান্তি বোধ হয়। সেই কবে থেকে শুরু করেছে, তিরিশ বছর আগেকার কোন এক অভিনন্দিত প্রাতঃসূর্য ওকে পৃথিবীর পথে ভগীরথের মত বরণ ক'রে এনেছিল! সেই থেকে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত বেঁচেই চলেছে। এ বাঁচার যেন বিরাম নেই। কতদিনের পুরানো একঘেয়ে সেই জীবনের বোঝা মাথায় নিয়ে এগিয়ে চলেছে সীমাহীন পথে। পদে পদে শাণিত কণ্টকের বাধা; এক-পা এগিয়ে যেতে দশ বার পিছিয়ে এসেছে। তবু কেন এই অকারণ বেঁচে থাকা!

মস্তিষ্কটা শুকিয়ে যেন পাথরের মত জমাট বেঁধে গেছে। দেহের শিরা-উপশিরায় কেমন একটা টনটনানি! মনে হয়, চড়া সুরে

বাঁধা পাকখাওয়া তারের মত, একটু টান পেলেই সবগুলো এক সঙ্গে ছিঁড়ে যাবে।

ভাবনার সূত্রে দেখতে দেখতে জট পাকিয়ে যায়। দেওয়ালের টিকটিকি দুটোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে; বিক্ষুব্ধ চিন্তায় উদ্বেলিত মনটা সহসা অন্তরীক্ষের শূন্যতায় ভরে ওঠে।

সকাল থেকে অন্তত সাতবার পদ্ম ওর ঘরে উঁকি দিয়ে গেছে। কেমন একটা উৎসুক জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তার চোখে। সত্যেন দেখেও দেখে না; ইচ্ছা ক'রেই তার চোখ থেকে নিজেকে আড়াল ক'রে রাখতে চায়। তবুও মাঝে মাঝে চোখে চোখ পড়ে যায়। অবিকল সুরেখার মত চাউনি! নিভৃত আলাপের অবসরে এক একবার সুরেখার চোখে যেমন ঝক-ঝক ক'রে উঠত কিসের আগুন, ঠিক তেমনি একটা তীব্র শিখা জ্বলে ওঠে ওই গলাকাটা মেয়েটার চোখে। সত্যেনের ভয় হয়; চকিতে দৃষ্টি ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে থাকে।

'অতসী তোমাদের আপনার লোক বুঝি?'

সত্যেন চমকে ওঠে: সামনে দাঁড়িয়ে পদ্ম! তার ঠোঁটের আগায় বাসি ফুলের মত মরা-মরা এক টুকরো হাসি। পদ্মকে ওর ভাল লাগে না। কাছে এলেই কেমন একটা অস্বস্তিতে ও হাঁপিয়ে পড়ে। একবার মনে হল, নিঃশব্দে গুটিশুটি হয়ে প'ড়ে থাকে। মানুষের সঙ্গে নতুন ক'রে আলাপ করবার প্রবৃত্তি আর নেই। কিন্তু সংস্কারে বাধে। অযাচিত হলেও, মেয়েদের প্রশ্ন উপেক্ষা করা চলে না। অথচ ও ভাবতে পারে না, কি উত্তর দেবে ওই অপরিচিতা মেয়েটির নিরর্থক জিজ্ঞাসার!

একটু ইতস্তত ক'রে সত্যেন হঠাৎ ব'লে ফেলে, 'হাঁ, আত্মীয়।'

পদ্মর মুখেচোখে ফুটে ওঠে ধারাল একটু হাসি। ঠিক অবিশ্বাসের হাসি নয়, কিন্তু বিশ্বাসের সমতাও যেন নেই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এড়িয়ে চলবার চেষ্টায় সত্যেন পাশ ফিরে চোখ বন্ধ করে। পদ্ম আবার জিজ্ঞেস করে, 'ভাড়া নিয়েছ বুঝি ঘরখানা' ?

মনটা ছাঁৎ ক'রে ওঠে। ভাড়া! হাঁ, ভাড়াই ত নিয়েছে। এবার আর কোন উত্তর দেওয়া হয় না। ঘর-ভাড়ার কথা ভাবতে সত্যেন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। মাথাটা আবার কেমন গুলিয়ে যায়।

—অতসী ভিক্ষে করে। সারাটা দিনের প্রাণান্ত চীৎকারে দুমুঠো চাল আর কয়েকটা পয়সা হয় তো কুড়িয়ে আনে লোকের বাড়ি বাড়ি ফিরে। তাতে দুজন লোকের এক বেলার সংস্থান কোন রকমে হয়; তাও নিতান্ত কায়ক্লেশে। তার উপর রোজ ছ'পয়সা হিসাবে দুখানা ঘরের ভাড়া; আর সেই সঙ্গে দীনুর বেমেয়াদী আতিথ্য!

অতসীর অতিথি হয়ে থাকতে ওর এতটুকুও সংকোচ নেই। ও-ও তো ভিকিরী এখন। ভিকিরীর আবার মান-ইজ্জৎ কি! কিন্তু অতসী কেমন ক'রে যোগাবে ওর খরচ! প্রতি মুহূর্তে দুর্বার দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ওই গরীব মেয়েটা যে কেমন ক'রে আজ তিন দিন ধরে দিচ্ছে দু'খানা ঘরের ভাড়া, সে কথা সত্যেন ভেবে উঠতে পারে না। রোজ সন্ধ্যা বেলায় দারোয়ান এসে যখন চোখ রাঙিয়ে ঘরে ঘরে ভাড়া আদায় ক'রে বেড়ায়, তখন তো কই একটি বারের জন্যেও সে ওর ঘরে আসে না। এ ঘরের ভাড়াও হয় তো অতসী দেয়। হয় তো কেন, নিশ্চয় সে-ই মিটিয়ে দেয়।

সত্যেনকে নীরব দেখে পদ্ম বিরক্ত হয়ে ওঠে। মাথা ঝাঁকিয়ে ভিজে চুলের গোছা পিঠের উপর ছড়িয়ে দিয়ে বলে, 'নেশা কর নাকি ?'

এ কথার উত্তর আর তাকে দিতে হয় না। সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কোন কথা বলবার আগেই মুখখানা হাঁড়ির মত ক'রে পদ্ম আপন মনে গজগজ করতে করতে চলে যায়।

পদ্মর দৃষ্টি যে দীনুর মনের ভিতর পৌঁছয় না, তা নয় ; কিন্তু দেহমন এমন একটা দুর্ভেদ্য অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, নতুন ক'রে পৃথিবীর কোন কিছু দেখবার অবকাশ তার থাকে না।

নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বটাকে নাড়া দিয়ে সত্যেন একটু সচেতন ক'রে তোলে। অতসীকে সে আজ মুক্তি দেবে। নিজের দুর্ভাগ্যের বেড়াজালে জড়িয়ে তার সহজ জীবনটাকে নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না। নিমেষে সংকল্পটা স্থির করে নিয়ে সত্যেন সবল মনে উঠে দাঁড়ায়। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত দাঁড়িয়ে উঠে আগে নিজেকে একটু সামলে নেয়। পা দুটোয় আর আগেকার মত জোর নেই। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেই যেন আজকাল চোখে কেমন ঘোলাটে অন্ধকার ধাঁধিয়ে আসে : মাথার মধ্যে পাকস্থলীর বিস্ফোরণের মতই একটা উৎকট জ্বালা হু হু করে।

'না-না হয় না ; হতে দেব না। আমারই জন্যে ওই অসহায় মেয়েটা ডুবে যাবে !'—খরস্রোতে সত্যেনের মস্তিষ্কে বয়ে যায় অসংখ্য সংকল্পের দ্রুত প্রবাহ। দুর্বল মমতার সুযোগ নিয়ে ও তার জীর্ণ নৌকায় কেন চাপাবে নিজের অসহ ভার ? ওর প্রায়শ্চিত্তের বোঝা বইতে অতসীর সর্বস্ব ডুবে যাবে অতল অন্ধকারে। ওই অসহায় অন্ধ বাপ !—সব আশা,

ওর জীবনের যা-কিছু সম্ভাবনা—যত কমই হোক না কেন, বানচাল হয়ে ভেসে যাবে নিরুদ্দেশের পথে।

সত্যেন অস্থির হয়ে পড়ে। নেশার ঝোঁক কেটে যাবার আগে মানুষ যেমন স্তিমিত চেতনাকে মাঝে মাঝে নাড়া দিয়ে সজাগ ক'রে তুলবার চেষ্টা করে, তেমনি ক'রে সে টেনে তুলতে চায় নিজেকে—দুর্ভাগ্যের এই জটিল আবর্ত থেকে।

ঘরে শিকলটা আটকে দিয়ে বেদুইনের মত সে আবার বেরিয়ে পড়ল। অতসীর অনুনয়, ভিক্ষেয় যাবার আগে তার সেই কাতর শঙ্কিত দৃষ্টি যেন লোহার বেড়ির মত পায়ে জড়িয়ে ধরে। পা বাড়াতে সত্যেনের চোখে জল আসে। মনে হয়, অতসী তেমনি ক'রে চেয়ে আছে ওর মুখপানে। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে যেন বারবার বলে, 'পালিও না কিন্তু; সন্ধ্যে না হতেই আমি ফিরে আসব।'

উঠান পার হয়ে সত্যেন যখন গলির মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে, হঠাৎ মুচকি হেসে পাশ কাটিয়ে গেল পদ্ম। সত্যেন চমকে উঠল। কয়েক পা এগিয়েই সে আবার ঘাড় বাঁকিয়ে ওর দিকে চেয়ে তেমনি হেসে বলে—'কোথায় চললে দীনু? অতসী যে মরবে কেঁদে।'

এবারও সত্যেন জবাব দিতে পারে না। কিংবা হয় ত চলে না ওই কেমনতর কথাগুলোর জবাব দেওয়া।—কিন্তু পদ্ম ওর নাম জানল কেমন ক'রে! অতসী তো ডাকেনি কখনও ওদের সামনে ওই নাম ধ'রে।

সত্যেন এগিয়ে চলে।

শন্ শন্ ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। পশ্চিমের আকাশ অন্ধকার

ক'রে জমেছে মেঘ। এখুনি হয়তো বৃষ্টি নামবে। দমকা বাতাসে পথের ধুলো উড়ে চোখে ঝাপটা লাগে। সামনের দিকে দৃষ্টি চলে না।

রাস্তার মোড়ে মুলো আর অন্ধ ভিকিরীগুলো তখনও বসে' বসে' চীৎকার করছে। আসন্ন দুর্যোগের ক্ষিপ্রতায় পথস্রোত চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু ওদের কান্নায় চঞ্চলতার লেশমাত্র প্রতিধ্বনিত হয় না।

স্থবির এক অন্ধ বুড়ী ছোট্ট একটি মেয়ের হাত ধ'রে তখনও ঠুকঠুক ক'রে এগিয়ে চলেছে ভিক্ষে চেয়ে—'আজ একাদশী। অন্ধ অনাথাকে দাও একটি পয়সা—'

ছোট মেয়েটা সারাদিন ঘুরে ঘুরে এবার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে সে থমকে দাঁড়ায়, আর চলতে পারে না। কিন্তু কে বুঝবে তার সেই ক্লান্তি!

আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সারা পথে ধুলো আর আবর্জনার ধূপবান খেলা শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে চলেছে বাতাসের মাতামাতি। চোখ খুলে চাওয়া যায় না। পথের দুপাশে দোকানগুলো দেখতে দেখতে বন্ধ হয়ে গেল। ফিরিওয়ালারা ঝাঁকা গুটিয়ে আশ্রয় নিয়েছে গাড়ীবারান্দায়।

বুড়ীটা তখনও চীৎকার ক'রে হাত বাড়ায়, একটি পয়সার আশায়। সঙ্গের মেয়েটা কাঁদে।

সত্যেন প্রায় জোর করেই তাদের হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে গেল বড় বাড়ীটার খিলানের নীচে। ঝড়-বৃষ্টিতে তখন আকাশ যেন ভেঙে পড়েছে।

মুমূর্ষু পৃথিবী

অতসীকে সে আজ মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু নিজে পায়নি একটি মুহূর্তের জন্যেও মুক্তি। যতই চেষ্টা করে অতসীকে ভুলবার, ততই যেন মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

বৃষ্টির চাপ কেটে গেছে; মাঝে মাঝে ইল্‌সে গুঁড়ি ঝরে। রাস্তায় একহাঁটু জল জমেছে। ফুটপাথের উপরেও যেন ঢেউ খেলে যায় নোংরা জলের। কোথাও এতটুকু দাঁড়াবার জায়গা নেই। বন্যার মত মহানগরীর পঙ্কিল বুক ধুয়ে নেমেছে বর্ষণের জল। যারা পথ-ভিকিরী, পথেই বেঁধেছে জীবনের বাকী দিনগুলোর আস্তানা, তাদের জগতে নিমেষে হয়ে গেছে মহাপ্রলয়। কার্তিকের হিমেল হাওয়ায় বুকের পাঁজরাগুলো পর্যন্ত ঠক্‌ঠক ক'রে কাঁপে। তার উপর এই বর্ষা! শতছিন্ন কাপড় নিয়ে উলঙ্গ শরীরটা কোন-রকমে ঢাকবার উপায়ও নেই আর; ভিজে শপ শপ করে। জট-পাকিয়ে-যাওয়া রুক্ষ চুলগুলো বয়ে জল ঝরছে। বুকের ভিতর হাত দুটো শক্ত ক'রে চেপেও কাঁপুনির বেগ থামান যায় না।

পথের ধারে এখানে-সেখানে দু-একটা বাড়ীর রোয়াকে কেঁচোর দলার মত কাঙালের দল ভিড় জমিয়েছে শীতে আড়ষ্ট হয়ে। রাস্তার অন্ধ ভিকিরীগুলো পথ অনুমান করবার চেষ্টায় অকারণ এদিকে সেদিকে হাত বাড়িয়ে ঘুরে মরে। আশ্চর্য! এদের দেখে সত্যেনের চোখে আর জল আসে না। বেশ সয়ে গেছে এদের কান্না। এমনি করেই কাটবে ওদের রাত। আজ আর দিনান্তের সেই একমুঠো ভাতও জুটবে না। শীত গ্রীষ্ম দুই-ই ওদের কাছে সমান হয়ে গেছে। তবুও চেষ্টা করবে, হয় ত সারাটা রাত ধ'রেই চেষ্টা করবে একটু আশ্রয় পাবার। মাঝে মাঝে চোখের পাতায় যখন ঘনিয়ে আসবে সারাদিনের

ক্লান্তি, তখন পা দুটো যাবে যেখানে-সেখানে থেমে। অতর্কিতে পাহারাওয়ালার সাড়া পেয়ে রাতচোরা ভীরু জানোয়ারগুলোর মত হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়বে নর্দমায়।

একটা পানের দোকানের ছাউনির তলায়, এক পাশে দাঁড়িয়ে সত্যেন ভাবে।—অতসী বোধ হয় এখনও বাসায় ফিরতে পারেনি। এই এক-হাঁটু জল ভেঙে আজ কোন্ শহরতলী থেকে ফিরতে হবে কে জানে! অন্ধ বাপের হাত ধ'রে এক-পা এক-পা ক'রে এগিয়ে আসতে হবে সারাটা পথ। হলই-বা, কি যায় আসে ওর! সত্যেন চেষ্টা ক'রেও এ কথাটা ভাবতে পারে না। অতসীদের পর ভাবতে তার সত্যিই কষ্ট হয়। আজ আর ওদের চেয়ে বেশী আপনার কে-ই বা আছে ওর? এমন একখানা চেনা মুখ বুকের নিভৃত তলায় উঁকি দেয় না, যার কাছে গিয়ে অন্তত একটি মুহূর্তের জন্যেও নিঃসঙ্কোচে আশ্রয় নিতে পারে।

তড়িৎ ওরই মত ভেসে গেছে কোন নিরুদ্দেশের পথে। বান্ধবীদের স্মৃতিগুলো পিছনের পথে ক্ষীণ আলেয়ার মত ভাসে, অতীত জীবনের দিক্‌চক্রবালে আবার একে একে মিলিয়ে যায়। শুধু সুরেখার স্মৃতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপে ওকে এখনও বিব্রত করে, মাঝে মাঝে বিপন্ন করতেও ছাড়ে না। কখনও হয়তো ঠোঁট দুখানা একবার কেঁপে ওঠে; কিন্তু পরমুহূর্তেই ফিকে হাসির সঙ্গে নাকটা কুঁচকে নিয়ে অন্য কিছু ভাববার চেষ্টা করে। এমনি সব নানা আলাপিত, যাদের কথা ওর সময় সময় মনে হয়, তাদের কাছে সহানুভূতি চাইবার প্রবৃত্তি ভুল-বশেও মনে জাগে না একবার।

বৃষ্টিতে ভিজে মাথাটা যেন আরও ভারী হয়ে উঠেছে। চোখের

পাতায় কেমন একটা ব্যথা, পায়ের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ঝিরঝির করে অবসন্নতা। জ্বরটা বোধ হয় এ-বেলা বেড়ে উঠেছে।

কাপড়খানার এমন অবস্থা নেই যে, আঁচল দিয়ে মাথাটা একটু মুছে ফেলতে পারে।—তবুও বেঁচে থাকতে হবে! বাঁচবার কি অদম্য নেশা মানুষের বুকে! শুধু বাঁচবার জন্যেই বাঁচতে চায় তারা, এত ভালবাসে জীবনকে! তাই তিল তিল ক'রে সয়ে নেয় মৃত্যুর সহস্র লাঞ্ছনা!

—আঁচলে শক্ত কি একটা বাঁধা! চাবি? চাবি! অতসীদের ঘরের চাবিটা ওর আঁচলে বাঁধা। সকালে ভিক্ষেয় বেরুবার আগে অতসী কখন বেঁধে রেখে গেছে চাবিটা, যদি ওদের ঘরে কিছু দরকার হয় দীনুর। কিংবা ওকে আটকে রাখবার ফন্দিতে—

কি লাভ ওর মত একটা বেকার নিষ্কর্মা ভিকিরীকে আটকে রেখে? ওদের বস্তির সেই নুলোটার যে মূল্য, সেটুকু মূল্যও নেই দীনুর। সেও কাঁদতে জানে, দশ জনের কাছে হতাশ হয়ে, অন্তত একজনের কাছেও একমুঠো চাল না-হয় একটা আধলা আদায় করবার ধৈর্য আছে তার।

অতসী! একটা কাঙালের মেয়ে, উদয়াস্ত হাত পেতে বেড়ায় লোকের দরজায় দরজায়! উপবাসে উপবাসে উই ধ'রে গেছে তার জীবনের মূলে। জ্ঞান হওয়ার পর থেকে কোন দিন দুমুঠো ভাত পেট ভ'রে খেতে পেয়েছে কি-না, সে কথা স্মরণ করতেও পারে না সে। তবুও হাসিমুখে তুলে দেয় তার ভিক্ষালব্ধ অন্নের ভাগ নিজেকে বঞ্চিত ক'রে।

অতসীর সেই অকারণ সংকোচ, অনুনয়-ভরা কাতর দৃষ্টি, স্পষ্ট ভেসে ওঠে ওর চোখের সামনে। সন্ধ্যার এই আকাশের মতই যেন অতসীর

প্রকৃতিটা বর্ষণোন্মুখ। তার অফুরন্ত অনুভূতি যেন তৃষিত মানুষকে ঘিরে অজস্র ধারায় ঝরে পড়তে চায়। সে কাঁদতে জানে না, তাই নিঃশব্দে ঝরে তার চোখের জল। দারিদ্র্য ধুয়ে যায় করুণার বন্যায়।

না, না; পারবে না ও অতসীকে অমন নির্মমভাবে আঘাত করতে। তার সেই বিশ্বাসকে চুরমার ক'রে তাকে দেউলিয়া করতে পারবে না। সারাটা দিনের পর এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় ক'রে অতসী বাড়ী ফিরেছে তার অন্ধ বাপের হাত ধ'রে। হয় তো নিরুপায় হয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

রাত্রি তখন বারোটা। সত্যেন অধীর হয়ে ওঠে। দ্রুতপদে এগিয়ে চলে অতসীদের বস্তির দিকে।...হঠাৎ কি ভেবে আবার থেমে যায় মাঝপথে। তা হোক্, আজ সে বিজয়ীর মতই উপেক্ষা করবে ব্যথিত ধরিত্রীর করুণ ক্রন্দন। ওরা এসেছে, অমনি করে পলে পলে মৃত্যুর বুকে মিলিয়ে যাবে ব'লেই এসেছে পৃথিবীতে। কি লাভ ওদের বেঁচে থেকে? কেন বাঁচবে ওই প্রাণহীন কঙ্কালের দল! অতসী, তার বাবা, সেই নুলো ভিকিরীটা—আরও কত হাত-পা-কাটা ক্ষুধার্ত অপদেবতা কিলবিল করে ওর চোখের সামনে। এখুনি বুঝি বিশ্বের শ্বাসরোধ ক'রে তুলবে ওরা।

ওই, ওপারের ফুটপাথে একটা পঙ্গু ভিকিরী পা টেনে টেনে চলেছে এগিয়ে—'একটি পয়-সা দা-ও গো!'

সত্যেনের মাথাটা হঠাৎ যেন বিগড়ে গেল আবার। আঁচল থেকে চাবিটা খুলে, ছুঁড়ে দিল দূরে—রাস্তার সেই আবর্জনাময় জলস্রোতে।

অতসীর বাবার নাম উপেন। গরীব গৃহস্থের ঘরে উপেনের

জন্ম। ওরা জাতিতে কায়স্থ। গরীব ব'লে একেবারে ভিকিরী হবার মত গরীব কোন দিন ছিল না। নিজের বলতে একটা বাস্তু ভিটে আর বিঘে-কয়েক আবাদী জমিও ছিল। উপেন পনের টাকা মাইনেয় চটকলে কাজ করত। পর্যাপ্ত না হলেও, একমুঠো মোটা ভাত, আর পরনে একখানা ন-হাত ধূতির অভাব কখন হয় নি। তেমনি করেই চলছিল দিন।

মাত্র বারো বছর আগেকার কথা! কাল-বৈশাখীর ঝড়ে যেমন দেখতে দেখতে পৃথিবীর রূপটা বদ্‌লে যায়; সবুজ কচিপাতার শাখায় শাখায় আঘাত লেগে শান্ত প্রকৃতির বুকে প্রলয়ের বিভীষিকা ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনি ক'রে ওদের জগতে বয়ে গেল একটা ভাঙনের ঝড়। তিনটি বছর বিছানায় প'ড়ে থেকে উপেন ধীরে ধীরে উঠল অতসীর হাত ধ'রে, চিরদিনের মত অমূল্য সম্পদ চোখ দুটি হারিয়ে। আকাশের অফুরন্ত আলো, পৃথিবীর বিচিত্র রূপ, প্রিয়জনের মুখে হাসির হালকা রঙ জন্মের মত বিদায় নিল ওর দৃষ্টিপথের রুদ্ধ বাতায়ন হ'তে। চটকলের সেই চাকরি,—জমি, এমন কি, বাস্তু ভিটেটুকু পর্যন্ত গেল তার আগে।

অতসীর মা যতদিন বেঁচে ছিল, ততদিন নিজে খেয়ে না-খেয়েও যোগাত একমুঠো অন্ন! কিন্তু দিনের পর দিন শুধু উপবাসের সঙ্গে লড়াই ক'রে ক'দিন বাঁচতে পারে মানুষ! দুগ্ধপোষ্য ছেলেটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় শুধু ভাতের ফেন আর চিঁড়ের ক্বাথ খাইয়ে কোন রকমে দু'বছর বাঁচিয়ে রেখেছিল। শেষে তাও আর জুটল না। প্রতিবেশীর সহানুভূতি শেষ হয়ে এলো। অবোধ শিশু যখন পেটের জ্বালায় চীৎকার করে, মায়ের শীর্ণ পাঁজরা ক'খানা

ভেঙে পড়ে হাহাকারে। সেই কচি ছেলের মুখেও ফুটে ওঠে অনশনের ক্লেশ; দিনে দিনে কাঁদবার শক্তিটুকু পর্যন্ত লোপ পেয়ে আসে।

আজও জ্বল্ জ্বল্ করে চোখের সামনে! নিস্তব্ধ দুপুর রাতে পাড়া নিশুতি হয়ে যায়, খোকার চোখে ঘুম নামে না। কেমন একটা অস্ফুট কাৎরানি! থেকে থেকে চীৎকার ক'রে ওঠে; দুরন্ত পিপাসায় গলার ভিতর বুঝি আটকে যায় তার কান্না। মা পাগলের মত দু'হাতে বুকে চেপে ধরে সেই ক্ষুধার্ত শিশুকে, কিন্তু স্তনে দুধ নেই; একমুঠো ভাতের অভাবে শুকিয়ে গেছে মায়ের বুকের দুধ! তবু তুলে দেয় খোকার মুখে সেই বিশীর্ণ স্তনের শুকনো বোঁটাটুকু।—যদি নামে, একবার কোন রকমে যদি নেমে আসে এক ঝলক দুধ! না হয়, বুকের খানিকটা রক্ত।

উপেন তখন চোখে দেখে না—কিন্তু বুঝতে পারে। মুমূর্ষু পত্নীর পাশে ব'সে সে কান পেতে শোনে তার অন্তরের হাহাকার, আর ক্ষুধার্ত শিশুর আর্তনাদ। ছেলেটা তিল তিল ক'রে ফুরিয়ে গেল। তারপর গেল তার মা।—অন্ধের চোখে যে জল গড়ায়, সে জল বুঝি অশ্রু নয়! রিক্ত উপেন উপবাসক্লিষ্ট অতসীর হাত ধরে পথে দাঁড়াল। অতসী তখন ন বছরের মেয়ে।—গ্রামের মায়া ছেড়ে ওরা আশ্রয় নিল এসে শহরের রাজপথে।

সেই থেকে ওরা ভিকিরী। পেটের জন্যে হয়ত উপেন ভিক্ষে ক'রত না। কিন্তু ওই কচি মেয়েটাকে না খাইয়ে মেরে ফেলতে আর সাহস হয় না। প্রথম প্রথম মেয়েটার হাত ধ'রে এর ওর বাড়ী সাহায্য চেয়ে বেড়াত; কখনও আপিসে কখনও আদালতে বাবুদের কাছে গিয়ে জানাত তার দুর্ভাগ্যের কাহিনী। কেউ বা দয়া করে দিত

একটা পয়সা, কেউ বিরক্তির সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করত। মাপ-করা সহানুভূতি নিয়ে মানুষের ক'দিন চলে! তাই আবার নতুন পথ দেখতে হয়।

চোখের সামনে যে ওলট-পালট হয়ে গেল, ন বছরের মেয়ে অতসীর মাথায় তার সবটুকু চিন্তা যোগায় না। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি বাপের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে হাতে-পায়ে যখন ক্লান্তি নেমে আসে, তখন আর চলতে ভাল লাগে না; পথের মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে। উপেনের বুকের কাছে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বলে—'বাড়ী যাবে না বাবা? কত দিন ত হয়ে গেল!'

'বাড়ী! হাঁ, বাড়ী যাব বই কি মা। আর ক'দিনই বা!—' অতসীর মুখখানা দেখতে পায় না; হাত দিয়ে অনুভব করে তার মুখচোখ। চোখের জলে আঙুলগুলো ভিজে ওঠে।

অতসী ভাবে: ওর নিজের হাতে লাগান শশা-গাছটা বুঝি এতদিনে আঙুল বাড়িয়ে মাচানের কাঠিগুলো জড়িয়ে ধরেছে। সাতুদের ছাগলটা আর নাগাল পাবে না তার কচি ডগা। থোপনা গাঁদায় কুঁড়িগুলো বাড়ী আলো ক'রে ফুটেছে। পানুরা কখন তুলে নিয়ে যাবে বেড়ার ফাঁক দিয়ে।

ওদের ভাগ্যবিধাতা হাসেন। সেই হাসি, যার উত্তাপে মায়ের বুক শুকিয়ে হয় সাহারা; অন্ধের অশ্রু জমাট বেঁধে যায় বুকের তলায়।

'তোর মায়ের কথা আর মনে পড়ে না, না-রে?'—উপেন আকাশের দিকে মুখ তুলে একটু আলো খুঁজবার চেষ্টা করে। একটু! আগুনের ফিন্‌কির মত এতটুকু আলোও যদি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, অতসীর মুখখানা একবার দেখে নেয়। খোকা আর তার

মায়ের মুখের আদল আছে ওর চেহারায়। খোকার কপালটা হয়েছিল ঠিক অতসীর মত। উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে বুকের ভিতরটা টন্ টন্ ক'রে ওঠে।

'বাবা! কোথায় থাকবে আজ?'—অতসী ভয়ে ভয়ে বলে।

উপেনের চেহারাটা মাঝে মাঝে এমন বদ্‌লে যায়, কণ্ঠস্বরে এমন একটা আর্ত্তা ফুটে ওঠে যে, দেখেশুনে ওই ন বছরের মেয়ের মনেও আতঙ্কের ছোঁয়া লাগে।

'ভয় কি মা? যেখানে সন্ধ্যে হবে, সেখানেই থাকব আমরা। কত লোক থাকবে সেখানে।'—অতসীর ঘাড়ে হাত দিয়ে উপেন ওর গা-ঘেঁষে দাঁড়ায়; একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে আবার এগিয়ে চলে।

দিন কেটে যায়। কোলের অভাগী পথেই বেড়ে ওঠে। অতসীর গায়ে পায়ে দেখতে দেখতে ছাপিয়ে ওঠে ভরন্ত যৌবন। পথচারীদের দৃষ্টি চঞ্চল হয় ওর দিকে চেয়ে। উপেন চোখে দেখে না, তবুও বোঝে। মনটা তার শঙ্কিত হয়ে পড়ে। এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকতে উপেনের ভয় করে। মনে হয়, দু'পাশের লোলুপ দৃষ্টি বুঝি কখন গ্রাস ক'রে ফেলবে অতসীকে। অতসী ওর জীবনের শেষ সম্বল! অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি, ভাঙা মাটির প্রদীপের মত মিটমিট ক'রে জ্বলছে; কখন দম্‌কা হাওয়ায় হয় ত নিবে যাবে। তারপর হবে সব অন্ধকার—

অতসী দিন দিন বড় হয়। মনে ওর গড়ে ওঠে আশা-নিরাশার নতুন জগৎ। দারিদ্র্যের ক্রূর ভ্রূকুটিকে বিদ্রূপ ক'রে সর্বাঙ্গে ছাপিয়ে ওঠে অনাবশ্যক প্রাচুর্য। জীর্ণ কাপড়খানা দিয়ে তখন আর নিজেকে ঢাকা চলে না। পথচারীদের দৃষ্টির সামনে অকারণ সে সংকুচিত হয়ে পড়ে। শঙ্কা ওর উপেনের চেয়ে কম হয় না।

অথচ কিসের শঙ্কা, তা বোধ হয় অতসী তখনও ভাল রকম বুঝতে শেখে নি।

নিজে থেকে না বুঝলেও বাইরের জগৎ তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে পদে পদে বুঝিয়ে দিতে চায়। ওরা যখন পাড়ায় পাড়ায় ভিখ মাগে, রাস্তার ছোঁড়াগুলো ওর পিছু নেয়। হাতছানি দেয়, নানা ইঙ্গিতে বারবার ডাকে অতসীকে। তাদের দৃষ্টি যেন সরীসৃপের মত ওর সর্বাঙ্গে পিলপিল ক'রে ওঠে। বাপের হাতটা আরও শক্ত ক'রে ধ'রে অতসী বলে—'বাবা, চল ভিন পাড়ায় যাই।'

উপেন চলতে চলতে থমকে দাঁড়ায়। হাতড়ে হাতড়ে অতসীর মাথায় হাতখানা রেখে দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বলে—'পাড়া বদ্‌লালে কি কপাল বদ্‌লায় মা?—গেরস্তদেরই বা দোষ কি! একটির পর একটি—' ক'জনকে দেবে?

'তা হোক্ বাবা, পাড়ার লোকগুলো'—কি একটা বলতে গিয়ে অতসী থেমে যায়।

লুঙি-পরা সেই বেঁটে ছোঁড়াটা আধ-খাওয়া পোড়া-বিড়ির টুক্‌রোটা কানে গুঁজে তখন স্থির দৃষ্টিতে ওরই দিকে চেয়ে আছে; মুচকি মুচকি হাসে আর শিস্ দেয়।

অতসী শিউরে ওঠে। মনে হয়, ছেলেটার চোখ দুটো বুঝি ঠিক্‌রে পড়বে ওর গায়ে! ছেঁড়া আঁচলটুকু দিয়ে কায়ক্লেশে শরীরটা ঢেকে বাপের হাত ধ'রে হন্ হন্ ক'রে এগিয়ে চলে।

ইচ্ছে হলেও উপেন কোন কথা জিজ্ঞেস করে না। অনুমান ক'রে নিতে ওর বিন্দুমাত্র ভুল হয় না, অতসী কেন তাড়াতাড়ি পাড়া ছেড়ে পালাতে চায়।

রাস্তাটা ছাড়িয়ে ওরা মোড় ফিরল। বেশ চলতে চলতে হঠাৎ যেন অতসীর মনে লাগল লঘু একটা পিছুটান। ইচ্ছে করে ফিরে চাইতে—ছেলেটা নিশ্চয়ই পড়েছে অনেক পিছনে। না হয়, অন্য পথ ধ'রে ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে এতক্ষণ। মনটাকে আরও একটু শক্ত করে নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে এক নজর চায়।—যায় নি সে! এগিয়ে এসেছে মোড়ের কাছাকাছি।

চক্‌চকে একটা নতুন সিকি দেখিয়ে ছেলেটা হাসে! সিকি—চার আনা, অনেকগুলো পয়সা এক-সঙ্গে!

অলক্ষ্যে অতসীর গতি একটু শ্লথ হয়ে আসে। কি জানি, যদি দেয় ওই সিকিটা ওদের ভিক্ষে! ঠিক বিশ্বাসও হয় না। কেন দেবে? মিছেমিছি অতগুলো পয়সা কেউ দেয় কখনো!

উপেন হতাশকণ্ঠে বলে—'আজ আর ভিন্ পাড়ায় গিয়ে কখন সাধব মা! হয় ত বেলা হয়ে গেছে অনেক।'

'বেলা?'—অতসী সূর্যের দিকে একবার মুখ তুলে চায়। একটু ইতস্তত ক'রে ঢোক গিলে বলে—'বেলা ত খুব বেশী হয়নি বাবা।'

ছেলেটা আবার শিস্ দেয়; একেবারে অতসীর কাছে, ওর নিতান্ত কাছে দাঁড়িয়ে আস্তে চাপা শিস্ দিয়ে সিকিটা চোখের সামনে তুলে ধরে। তারপর এগিয়ে যায় ক্ষিপ্রগতিতে, ওদের পাশ কাটিয়ে সরে যায় সামনের দিকে।

অতসীর গা-টা যেন কেমন ছম্‌ছম্ করে ওঠে। বেশ চেহারা ছেলেটার! পরনের নীল লুঙিখানা বোধ হয় রেশমি; কেমন ঝলমল করে! ওই সিকিটা পুরো পেলে ও একখানা পুরানো শাড়ি কিনত

বাসনওয়ালীদের কাছে।—এ কাপড়খানা এখন ওর ছোট হয়। তা ছাড়া কতদিনের কাপড়, ছিঁড়ে জালজাল হয়ে গেছে।

—'বাবা, আজ আর যাব না ভিক্ষেয়। চল, যা চাট্টি চাল পেয়েছি তাই ফুটিয়ে দেব তোমাকে।'

'আমাকে?—আমার জন্মে ত ভাবি না মা। বাঁচা ভিন্ন আমার আর উপায় নেই, তাই খেতে হয় একমুঠো। নইলে কতদিন আগেই চুকিয়ে ফেলতাম এ বালাই। না খেয়ে তিল তিল করে মরতে পারলে আমার যে কি আনন্দ হ'ত, তা তুই বুঝবি না অতসী, বুঝবে ভগবান। না, ভগবানেরও হয় ত তা বুঝবার শক্তি নেই মা। সে পাথর!'—উপেন হাত বাড়িয়ে অতসীর মাথাটা খোঁজে, বুকের কাছে একবার টেনে নেবে ব'লে।

উপেন আর সাহস করতে পারে নি অতসীকে নিয়ে পথের পাশে রাত কাটাতে। তাই পথের মায়া কাটিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছে আবার ঘরের কোণে, চাঁপাতলায় ছোট একটা খোলার বস্তিতে। দেহের সঙ্গে সঙ্গে অতসীর মনও যে সচেতন হয়ে ওঠেনি তা নয়—তবু মাঝে মাঝে অসতর্ক মুহূর্তের সুযোগ নিয়ে বাইরের জগৎ উল্টো হাওয়ার দোলায় ওর ছোট-খাট অনুভূতিগুলোকে টাল খাইয়ে দেয়। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মন আস্ত একটা সিকিকে জয় করতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ে। চকিতে-দেখা একটা নতুন সিকি-আধুলির কথা ভুলতে, কমপক্ষে তিনদিন সামনে লড়াই করতে হয় নিজের সঙ্গে।

অতসীরা যে ঘরে থাকে, তার সামনের বড় বস্তিটায় আছে কতগুলো ছোট ছোট কারখানা; ছাতার বাঁট তৈরি হয় সেখানে।

যেতে আসতে অতসী নিবিষ্ট মনে চেয়ে দেখে। ছেলেগুলো কেমন সুন্দর কাজ করে। রাশীকৃত বেত আর বাঁশের টুক্‌রো আগুনে ঝলসে নিয়ে চোখের নিমেষে ওরা তৈরি করে রকমারি ছাতার বাঁট। ও-ও যদি শিখতে পারত অমনি একটা কাজ, তা হলে আর লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষে মেগে বেড়াতে হত না। ভিক্ষে ওর ভাল লাগে না। একদিন দু-দিন নয়, রোজ লোকের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে, না হয় পরনের একখানা কাপড়, না হয় দুবেলা দুমুঠো পেটের ভাত।

দিন চলে। শীর্ণ নদী যেমন করে বৈচিত্র্যহীন স্রোতে ক্রমে ক্রমে মাটির বুকে নিজেকে ক্ষয় করে এগিয়ে চলে, তেমনি করে পথের বুকে জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা মিলিয়ে ওদেরও কাটে দিন। কোন পরিবর্তন নেই; এমন কি, একটা আকস্মিক কল্পনাও আর মনে জেগে ওঠে না।

অতসী এখন সবই বোঝে। তাই, অন্ধ বাপকে কথায় কথায় দুঃখ-দৈন্যের খুঁটিনাটি শোনাতে এখন তার ইচ্ছে হয় না। মনের কথা মনেই চেপে রাখে। নিতান্ত অসহ দুঃখে যখন আর পারে না নিজেকে সামলে নিতে, তখন শুধু কাঁদে; বুক ছাপিয়ে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা।

কোথাও সোয়াস্তি নেই। এখানে এসেও আবার তেমনি করে পিছনে কেউ লেগেছে। পাড়ার ছোঁড়াগুলো দুদিন বেশ শান্ত ছিল; অতসীও হাঁপ ছেড়ে বেঁচে ছিল নতুন জায়গায় এসে। কিন্তু আবার শুরু হয়েছে ওকে নিয়ে কাণাকাণি আর ইসারা। বিড়িওয়ালা থেকে আরম্ভ করে ছাতার কারখানার ছোঁড়াগুলো পর্যন্ত—সবাই যেন চন্‌মন ক'রে চায় ওর দিকে। ওদের দৃষ্টি, কথা বলার কেমন বিশ্রী একটা ভঙ্গী অতসীর সর্বাঙ্গে শেয়াকুলের কাঁটার মত জড়িয়ে ধরে; ও অতিষ্ঠ হয়ে

ওঠে। ভাবতে পারে না, ওরা কি চায় ওর মত একটা কাঙাল মেয়ের কাছে!

তবে কি ভিকিরী ব'লে রাতদিন ওরা অমনি বিদ্রূপ করে! ভিকিরী ত সে ইচ্ছে ক'রে হয় নি। ওর বাবা, ওই অন্ধ অসহায় বাপ আজ একমুঠো ভাতের জন্যে করে ভিক্ষে। কিন্তু এমন ভিকিরী ওরা ছিল না চিরদিন। হয়ত থাকবেও না পরে—

ভাবতে গিয়ে অতসীর মনটা কেমন শঙ্কিত হয়ে পড়ে। নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটুকু ভাবতেও সঙ্কোচ হয় এখন। সামনের পথে এগিয়ে চলবার সেটুকু সম্বলও যেন নেই আর।

ও-দিকের কারখানাটায় কাজ করে তিনটি মেয়ে। ওর চেয়ে বয়েস তাদের অনেক বেশী, তবু বেশ কাজ করে তারা। বাঁশের ছড়িগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আগুনে সেঁকে কেমন কায়দায় তৈরি করে ছাতার বাঁট; অতসী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে।—এক দুপুর খেটে নগদ ছ'আনা পয়সা নিয়ে ওরা হাসিমুখে বাড়ী ফিরে যায়।

ও-ও পারে খাটতে, ওদের চেয়ে অনেক বেশী। এক দুপুর কেন, সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি খেটেও যদি ছ'আনা পয়সা পায়, তা হলে বেঁচে যায়। পেটের দায়ে ভিক্ষে করার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে ওদেরই মত হাসিমুখে পৃথিবীতে বাঁচতে পারে। বাবা! ওর বাবা নিশ্চয়ই অমত করবে না। সেও ত পাবে একটু বিশ্রাম। বুড়ো হাড় ক'খানা ঠক্ ঠক্ করে পাড়ায় পাড়ায় কেঁদে বেড়াতে বাবার কি কম কষ্ট হয়!

অতসীর বুকের ভিতর একটা ঘুমন্ত মানুষ যেন সব কিছু নাড়া দিয়ে

হঠাৎ জেগে ওঠে। আশৈশব সঞ্চিত জড়তাকে দূরে ঠেলে দিয়ে স্থির মনে এগিয়ে যায় সাম্‌নের কারখানাটার দিকে।—ছেলেগুলো হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে, কিন্তু আজ সে ভ্রূক্ষেপও করে না। রাস্তা থেকে পা বাড়িয়ে পরচালায় উঠতে গিয়ে চকিতে একবার থম্‌কে দাঁড়ায়, তারপর মনটাকে বেশ শক্ত ক'রে নিয়ে বলে—'মালিকের সঙ্গে একবার দেখা হবে না?'

ছোঁড়াগুলো চাপা হাসির সঙ্গে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। কিন্তু ওর চোখের দিকে চেয়ে আজ আর কোন কুৎসিত ইঙ্গিত করবার সাহস তাদের হয় না। অথচ ওরাই, ওই ছেলেগুলোই করেছে প্রতিদিন কত কুৎসিত ইসারা!

কারখানার মালিক বলতে অতসীর ধারণাটা খুব অসাধারণ না হলেও নিতান্ত সাধারণ ছিল না। কিন্তু ওদেরই ভিতর থেকে একটা ছেলে যখন আঙুল দেখিয়ে দিল পিছনকার তক্তপোষখানার দিকে, মনটা যেন কেমন দমে' গেল।

—সেদিন ও-পাড়ায় ভিক্ষেয় গেলে যে-লোকটা ওকে সিকি দেখিয়েছিল, কতকটা তেমনি চেহারা! বয়েস বোধ হয় তার চেয়ে কিছু বেশী। তক্তপোষের উপর পা ছড়িয়ে ব'সে লোকটা ছাতার বাঁটগুলোয় রং-পালিশ দিচ্ছে। গায়ে একটা ময়লা ফতুয়া; মাথায় একরাশ চুল—তেলে চবচব করে।

মুহূর্তে কি ভেবে নিয়ে অতসী এগিয়ে গেল। সমস্ত সংকোচ সে প্রাণপণ শক্তিতে ঠেলে রাখবে আজ।—'আপনি?'

'হাঁ।'—লোকটা যেমন দম-দেওয়া জাপানী পুতুলের মত ছিট্‌কে ওঠে। হাত দুখানা দুই হাঁটুর উপর লম্বা ক'রে ছড়িয়ে দিয়ে বলে—

'আরে, তুমি যে! আমাদের নতুন পড়শী!'—চোখে-মুখে, তার সারা দেহে কেমন একটা অদ্ভুত চঞ্চলতা!

অতসী খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। মনে হ'ল, ভাল করে নি হঠাৎ এমন ক'রে কারখানায় ঢুকে। বুকের ভিতরটা কেঁপে কেঁপে ওঠে; হৃৎপিণ্ড যেন অস্বাভাবিক রকম দ্রুত হয়ে উঠেছে। তবুও সাহসে ভর ক'রে বলে—'একটা কাজ দেবেন?'

'কাজ?'—লোকটা হা হা ক'রে হেসে ওঠে।—'নিশ্চয়ই! কি কাজ করবে তুমি?'

'ওই ওদের মত ছাতার বাঁট তৈরি—' সংকোচে কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে।

অতসীর কথা শেষ না হতেই সে আবার হেসে ওঠে।

—'অমনি হয় না মাইরি, সিখতে হয়।'

'শিখবো। যে-ক'দিন না পারি, বিনি মাইনেতে—'

লোকটা তেমনি ক'রে ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বিশ্রী একটা হাসির সঙ্গে দম টেনে টেনে আবার বলে—'বিনি মাইনেয় কেনে, অমন ডাগর বয়েস! মাইরি ডবল মাইনে দেব। রোজ সাঁঝবেলায় এসে সিখে যেও এই ঠাঁয়ে।'

কথা শেষ হয়, কিন্তু হাসি আর থামতে চায় না।

ভয়ে অতসীর তালু পর্যন্ত শুকিয়ে ওঠে। কি ভয়ংকর লোকটার চোখের চাউনি! মনে হয় যেন ওর সমস্ত শরীর মুঠো ক'রে ধ'রে এই মুহূর্তে গ্রাস ক'রে ফেলবে। ইচ্ছে করে, ছুটে পালায়; কিন্তু পা ওঠে না। গলার ভিতরটা এমন শুকিয়ে উঠেছে যে, চীৎকার করলেও হয় ত আর আওয়াজ বেরুবে না।

মুমূর্ষু পৃথিবী

পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত জড়িত পায়ে অতসী কোন রকমে ধীরে ধীরে কারখানা থেকে বেরিয়ে আসে। বুকের ভিতর অদম্য বেগে ফেনিয়ে ওঠে কান্না! অতর্কিত মূর্চ্ছার ভারে শরীরটা মাটির বুকে আছাড় দিয়ে পড়তে চায়।

লোকটা উঠে আসে; তেমনি করে হাসতে হাসতে উঠে আসে ওর পিছু পিছু। টানা টানা হাসির সঙ্গে অস্পষ্ট শব্দে অতসীর কানে আসে আবার সেই কথাগুলো—ডবল মাইনে দেব। রোজ সাঁঝবেলায় এসো শিখতে। অমন ডাগর বয়েস—

অতসী প্রাণপণ শক্তিতে দেহটা টেনে এনে টলতে টলতে বাড়ী ঢুকল। উপেন তখন আনমনে বসে' উনুনে ফুঁ দিচ্ছে; উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করছে অতসীর পায়ের শব্দ।

পরদিন থেকে আবার তেমনি চলে নিত্যস্রোতের জোয়ার-ভাঁটা। কালকের কথা মুছে যায় ওর অতীতকালের আঁচলে। সেই লোকটা, কারখানার সেই ছোঁড়াগুলো—সকলের সামনে দিয়ে প্রতিদিন তেমনি ক'রেই চলতে হয় আবার অন্ধ বাপের হাত ধ'রে মুষ্টিভিক্ষায়।

অতসী মনে করে, ওদের পানে চাইবে না; দেহটাকে কাঁটা-লাগামে বেঁধে হেঁট-মুখে জোর ক'রে এগিয়ে চলে। তবুও যেন আচম্বিতে কখন্ ওদেরি চোখে গিয়ে আহত হয় ওর ভীরু দৃষ্টি।

'এই যে, পড়শী!'—লোকটা গলা-ঝাড়া দিয়ে ঠুং করে বাজায় একটা টাকা।

বুকের ভিতর কেমন ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে। আড়ষ্ট হয়ে উপেনের গায়ে গা দিয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায় বড় রাস্তার দিকে। হয় ত

কখন মনটা একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। ইচ্ছে হয়, একবার চেয়ে দেখে—ওটা টাকা না আধুলি!—কিন্তু পরক্ষণেই আসে গ্লানি। নির্মম কশাঘাতে নিজেকে সংযত করে নেয়।

লোকটা কি অদ্ভুত! রোজ অমনি করে; অতসীকে দেখে ওর সারা গা যেন আউড়ে উঠে। নতুন পাড়ায় এসে দুদিন হাড ক'খানা একটু জুড়িয়েছিল। আবার জ্বালাতনে উদ্‌বাস্ত ক'রে তুলল এরা।

তবু ওই রাস্তা দিয়েই চলতে হয়। অতসীদের বাড়ী থেকে বেরুবার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। যতবার সে যাতায়াত করে ততবারই যেন লোকটার রাস্তায় দরকার পড়ে। একটা না একটা ছুৎনোর অভাব হয় না ওর। কখন হুপিং কাশির রোগীর মত কাশ্‌তে কাশ্‌তে দম আট্‌কে ফেলে, কখন বা ইচ্ছে ক'রেই দোকানের সেই তক্তপোষখানার উপর ছড়িয়ে দেয় কতকগুলো পয়সা।

অতসীর হাসি পায়। চোখ পড়লেও, দৃষ্টিটা ফিরিয়ে নিয়ে আন্‌মনা গতিতে ও পাশ কাটিয়ে যায়। তাও রেহাই পাবার জো নেই। লোকটা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এক একদিন সাম্‌নে, না হয় নিতান্ত পাশে এসে ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলে—"ময়ূরকণ্ঠী সাড়ি আর পাঁচটাকা নগদ, ফি মাসে—"

অতসী হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারে না; ভয়ে কেমন বিকল হয়ে যায়। দেহমনে রাত্রিদিন তীব্র দারিদ্র্যের যে অসহ জ্বালা হু হু করে, তারই তাড়নায় মাঝে মাঝে বুকের ভিতর বুভুক্ষিত নারী আর্ত্তনাদ ক'রে উঠতে চায়—'দাও, ওগো দাও তোমাদের করুণার দানে আঁচল ভ'রে।' কিন্তু পারে না। মুখে যোগায় না

কোন উত্তর। গুরুভার আতঙ্ক চেপে বসে জিভটার উপর; মগজটা কেমন অবসন্ন হয়ে আসে। নিজের অজ্ঞাতসারে কখন বড় বড় চোখ-দুটো তুলে চায় ওর মুখপানে। লোকটার সারা গা হেসে ওঠে অনুভূতির মাদকতায়। গুন্ গুন্ সুরে আওড়ায় পুরানো গানের একটা কলি—"সই কও না কথা মুখ তুলে—"

অতসী পিছিয়ে আসে। মুহূর্তে ওর মনটা আবার রুখে দাঁড়ায়: অস্ফুট উচ্চারণে কামনা করে পৃথিবীর সমস্ত পুরুষের মৃত্যু।

"বকুলমালা করবে আলা তেলচোঁয়ানি তোর চুলে; সই, কও না কথা মুখ তুলে।"—অতসীর মুখের সামনে অদ্ভুত ভঙ্গীতে হাত নেড়ে সে আবার ফিরে গিয়ে বসে সেই ভাঙা চৌকিটার উপর।

চারদিন হ'ল উপেনের জ্বর। সেই সঙ্গে আবার সুরু হয়েছে তার চোখের অসহ্য যন্ত্রণা আর মাথাব্যথা। চোখদুটো হারিয়েও চোখের যন্ত্রণা ঘুচল না। ফসল শেষ হয়েছে, কিন্তু পঙ্গপাল বাসা বেঁধেছে ওর শুক্‌নো ক্ষেতের ফাটলে।—তবুও বাঁচতে হবে! উপেন হাসে। সেই জীবনজোড়া অন্ধকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে অদৃষ্টের পরিধিটা মেপে নেবার চেষ্টা করে।

দুহাতে কপালের শিরাদুটো টিপে ধ'রে অতসী রাত্রিদিন ব'সে থাকে বাপের শিয়রে। কখন চোখদুটো জলে ঝাপসা হয়, আবার কখনও নিঃশ্বাস পর্যন্ত থরিয়ে ওঠে শুষ্কতায়।

'অতসী!—' কি বলতে গিয়ে উপেন থেমে যায়। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে অতসীর মুখখানা একবার অনুভব করবার চেষ্টা করে। উদ্‌গত

দীর্ঘশ্বাস চেপে জিজ্ঞেস করে—"আজও কিছু না খেয়ে রইলি মা ?"

'না বাবা, একবার ত খেয়েছি তখন।'—অতসী জানে, উপেন সে কথা বিশ্বাস করবে না ; তবুও বলে। তা ছাড়া বলবারও যে নেই কিছু।

উপেন একটুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বলে—'আজকাল আমার কিছুই মনে থাকে না রে, সব ভুল হয়ে যায়। শুধু ভুলতে পারি না খোকার সেই কান্না, আর তোর মায়ের কথা—' হঠাৎ তার চোখ দুটো অসহ ব্যথায় টনটন ক'রে ওঠে। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে অতসীর হাতখানা দুহাতে চেপে ধ'রে বারবার চোখেমুখে বুলিয়ে নেয়।

'ঘরে একমুঠো চালও নেই অতসী। সব জানি আমি ; চোখে না দেখলেও, তোর মুখে হাত দিয়ে বুঝতে পারি মা। আমি যে বাবা।'—উপেন পাশ ফিরে শোবার চেষ্টা করে।

এ ক'দিন ওরা ভিক্ষেয় বেরুতে পারে নি। ঘরে সত্যিই চাল নেই। থাক্‌বেই বা কেমন ক'রে, ওদের প্রতিদিনের মুষ্টিভিক্ষা দিনান্তেই শেষ হয়। উপেন কতবার অতসীকে বলে, দু'বাড়ী সেধে শুধু তার মত দুমুঠো চাল আনতে। কিন্তু অতসী চায় না ওকে ছেড়ে যেতে। তার কথা শুনে, উপেনেরও হয়ত সাহস হয় না একলা ছেড়ে দিতে।

কিন্তু চলে না। এমনি করে দিনের পর দিন উপবাসে, ক'দিন চলে ! অতসীর মনটা এক একবার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। চোখের জল ওর নিমেষে শুকিয়ে যায়। অন্ধ বাপের মুখে একটু জল-সাবুও তুলে দিতে পারে নি আজ ক'দিনের ভিতর। হঠাৎ কি ভেবে

সব ভয় তুচ্ছ ক'রে সে একাই বেরিয়ে পড়ে পথে। উপেনের বাধা মানে না।

রাস্তার মাঝখানে এসে একবার চারিদিকে চেয়ে পা দুটো কেমন শঙ্কায় জড়িয়ে আসে। এই জনসঙ্কুল মহানগরীর পথে ও আর কোনদিন একা চলেনি। প্রবহমান জনস্রোত যেন ঘূর্ণিবাতাসের মত চারিদিক থেকে ওকে জড়িয়ে ধরতে চায়। অতসী ত্রস্ত হয়ে ওঠে। অজ্ঞাতসারে পা-দুটো একবার পিছিয়ে আসে, আবার পর-মুহূর্তেই সঞ্চিত শক্তিতে এগিয়ে চলে এলোমেলো ক্ষিপ্র গতিতে।—ঘরে অন্ধ বাপ আজ পাঁচদিন অনাহারে!

ক্ষণিকের উত্তেজনায় অতসী অনেক দূর এগিয়ে যায়। কিন্তু জোটে না; একমুঠো চাল বা একটি পয়সাও জোটে না কারো কাছে। আজ আর সে অন্যদিনের মত চাইতেও পারে না হাত পেতে। দেখতে দেখতে ওর রক্তেও জমে ওঠে উপবাসের গ্লানি। পা দুটো ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আসে।

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে অতসী আনমনে কি ভাবে। রাস্তা দিয়ে এত লোক চলেছে, কিন্তু তার দিকে আজ একটি লোকও ফিরে চায় না; কেউ ইসারা করে না; একটা দু'আনি, একটা আনি, এমন কি একটা পয়সা পর্যন্ত তুলে ধরে না কেউ। সেদিন ও-পাড়ার ছোঁড়াটা দিতে চেয়েছিল একটা নতুন সিকি—

অতসী যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, তা নিজেও বুঝতে পারে নি। চেতনা যখন ফিরে এল, তখন রাত্রি প্রায় আট-টা। পথে লোকজনের ভিড় অনেক কমে' এসেছে। মোড়ের ভিকিরীগুলো একে একে কখন

উঠে গেছে সব। চারিদিকে চেয়ে, ভয় ও উদ্বেগে মনটা যেন হঠাৎ কেমন বিকল হয়ে পড়ে।

বাবা একলাটি প'ড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে; হয় ত অস্থির হয়ে উঠেছে ওর দেরী দেখে। অতসী আর স্থির থাকতে পারে না। ক্ষিপ্রপদে ফিরে চলে বাড়ীর পথে। অবসন্ন পা সমানে পড়ে না, তবুও চলে প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে টেনে নিয়ে।

—গলিটার বাঁকে আলো-আঁধারিতে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে; হাতে তার খাবার! মস্ত একটা ঠোঙা-ভর্তি খাবার নিয়ে কোথায় চলেছে সে। অতসীর গতি শ্লথ হয়ে আসে; দেখতে দেখতে থেমে যায় গলিটার মাথায়। অতগুলো খাবার! একলাই খাবে ছেলেটা ওই অতগুলো খাবার! মাথার ভিতর কেমন ঝিম্ ঝিম্ ক'রে ওঠে। অতসী সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ঠোঙাটার দিকে। খাবারগুলো যেন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে; মোমের পুতুলের মত টলমল ক'রে ন'ড়ে ওঠে! ঠোঙাটা ছাপিয়ে উপছে পড়তে চায় মাটিতে।

মুহূর্তে সব অনুভূতি ঘোলা হয়ে উঠল। স্বপ্নাবিষ্টের মত গিয়ে দাঁড়াল ছেলেটার পাশে। ইচ্ছে করে, দুহাত দিয়ে ওর মুখ চেপে ধ'রে, গলাটা টিপে শ্বাসরোধ ক'রে দেয়। কিন্তু পারে না। রাস্তায় পুলিসটা খট খট শব্দে বুঝি এই দিকেই এগিয়ে আসে! পাশের মুদির দোকানে বসে' অনেকগুলো লোক জটলা করে।

অতসী আরও একটু সরে' যায় ছেলেটার আছে; একেবারে গা-ঘেঁসে দাঁড়ায়। চোখ দিয়ে যেন আগুনের শিষ বেরুচ্ছে তখন। হাত দুটো চঞ্চল হয়ে ওঠে।

অতসীর মুখপানে চেয়ে ছেলেটা হঠাৎ ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল।

অতসী শিউরে ওঠে। ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিমেষে বিবশ হয়ে গেল আতঙ্কে। অতি কষ্টে দেয়ালটা ভর ক'রে মূর্চ্ছাহতের মত সেইখানে ব'সে পড়ল।—স্তিমিত চেতনা গ্লানিতে জর্জরিত হয়ে আসে।

সেদিনও জুটল না ভিক্ষে। অতসী যখন বাড়ী ফিরে এলো তখন রাত্রি প্রায় দশটা। এতক্ষণ উপেন উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে ছিল ওর পথপানে; সবে মাত্র নেমেছে একটু ঘুম, তার উপবাসক্লিষ্ট শীর্ণ কঙ্কালটাকে ঘিরে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে অতসী কান পেতে শোনে ওর ঘুমন্ত পিতার দ্রুত নিঃশ্বাস। ঘুমিয়েছে, না-খেয়ে না-খেয়ে কাহিল হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে আজ। সে ঘুম ভাঙাবার ইচ্ছে হল না তার। যেমন চুপি চুপি ঘরের মধ্যে এসেছিল, আবার আস্তে আস্তে পা টিপে তেমনি বেরিয়ে গেল।

ঘরে আজ প্রদীপটি পর্যন্ত জ্বলে নি। সঞ্চয় বলতে একটি আধলাও নেই ওদের। এমন এক-ছটাক চালও নেই, যা দিয়ে কিনে আনবে একটু বার্লি, না-হয় একটু সাবু!

ভালভাবে মনে পড়ে না; শুধু আবছা একটা স্মৃতির ছাপ লেগে আছে ওর বুকে। উপেনের কাছে যতটুকু শুনেছে, তাতে অনুমান ক'রে নিতে অসুবিধা হয় না—কেমন ক'রে দিনের পর দিন না খেয়ে মরেছে খোকা আর মা। দীর্ঘশ্বাসটা বুকের ভিতর আটকে যায়। খোকা বেঁচে থাকলে আজ মস্ত বড় হ'ত! ওরা দুজনে রোজগার ক'রে খাওয়াত বাবাকে—

হঠাৎ চিন্তাটায় কেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে যায়; ভাবতে পারে না। অতীত ও বর্তমান একসঙ্গে নির্মম ভ্রূকুটি করে ওর দিকে চেয়ে। ইচ্ছে

করে, চীৎকার ক'রে কাঁদে ; ওদের জীবনে যেমন ক'রে আগুন ধরেছে, তেমনি ক'রে আগুন জ্বালিয়ে দেয় সারা পৃথিবীতে।

পাঁচদিন কেটেছে অনাহারে। কালও হবে তা-ই। তার পর দেখতে সুরু হবে সেই পালা। যেমন ক'রে গেল ওর মা—ওর ভাই—ঠিক তেমনি ক'রে যাবে ওই অন্ধ বাপ। তার পর? তারপর যা ঘটবে, তা অতসী ভাবতেও পারে না। উদ্বেলিত দ্রুত চিন্তায় শরীরের সবটুকু রক্ত যেন নিমেষে চন্‌চন্‌ ক'রে উঠে পড়ে ওর মগজে। নিঃশ্বাসটা ঘন হয়ে ওঠে ; পা দুটো কাঁপে, বুকের ভিতর গুম্‌রে ওঠে কেমন অস্বস্তি। মন্থর পদে অতসী রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। মগজটা চৌচীর হয়ে ফেটে এখুনি বুঝি জ্বলে উঠবে আগুন!—গায়ের আঁচলটা খুলে নিয়ে অতসী কোমরে জড়ায়। নগ্ন বুকে হু হু ক'রে লাগে উত্তপ্ত বাতাস।

ওদের গলিটা তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কারখানার লোকগুলো দোকান বন্ধ ক'রে কখন চলে গেছে সব। শুধু দু-একটা ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসে অস্পষ্ট কথার শব্দ।

অতসী এগিয়ে যায়। ঘুমন্ত পৃথিবীর পথে ওর পায়ের জড়তা নিঃশেষে উবে গেছে।—সেই কারখানাটার ভিতর থেকে দেখা যায় আলোর ক্ষীণ রেখা। লোকটা কতদিন দেখিয়েছে ওকে টাকা ; আস্ত একটা রূপোর টাকা, না হয় আধুলি। যেতে-আসতে কতবার শুনিয়েছে হাত-ভরা পয়সার শব্দ, চোখের সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে সিকি, দু'আনি, আনি, পয়সা—কত কি!

একটা, অন্তত একটা পয়সাও যদি আজ দেয় ওকে! অতসী দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ায় ; কান পেতে শুনবার চেষ্টা করে সেই

লোকটার কণ্ঠস্বর। ইচ্ছে করে, একবার কড়াটা নাড়ে; কিন্তু পারে না। মনটা আবার কেমন পিছিয়ে আসে। শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ ক'রে কপাটের ফাঁক দিয়ে একবার চেয়ে দেখে, লোকটা আছে কি-না।—আছে! সেই তক্তপোষখানায় ঠিক তেমনি ক'রে পা ছড়িয়ে বসে' আছে।

ঘরে আর কেউ নেই। সে একা চৌকির উপর রাশীকৃত পয়সা ঢেলে হিসেব মেলাচ্ছে। তাকের উপর জ্বলছে একটা কেরোসিনের ডিবে। পয়সাগুলো ঝক্ঝক্ করে; টাকা, আধুলি, সিকি, দু'আনি—অনেক। একসঙ্গে অনেকগুলো ঢেলেছে সে হাতের কাছে।

চেয়ে থাকতে থাকতে অতসীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ মাতাল হয়ে ওঠে। দাঁতে দাঁত চেপে একবার ভেবে নেবার চেষ্টা করে। ক্ষুধার্ত আর্তনাদে সংবিৎ লুপ্ত হয়ে আসে। নিজের অজ্ঞাত সারেই কখন জোরে দরজার কড়াটা নেড়ে দেয়।

প্রেতমূর্তির মত আচম্বিতে সেই লোকটা দরজা খুলে সামনে এসে দাঁড়াল—'পড়শী!'—উল্লাসে তার সর্বাঙ্গ যেন সাপের জিভের মত লক্লক্ করে। দু'হাত বাড়িয়ে অতসীর দিকে এগিয়ে আসে। ওর কাছে, একেবারে বুকের কাছে এসে দাঁড়ায়।

অতসী বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে; চেতনা তখন হারিয়ে গেছে অতল অন্ধকারে। হাত-পা যেন অসাড় হয়ে জমে গেছে। চৌকাঠখানা চেপে ধ'রেও নিজেকে সামলে নিতে পারে না। শরীরটা আস্তে আস্তে ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। নগ্ন বুকে আচলটা জড়িয়ে নেবার কথাও মনে নেই তখন।

'হেঁ-হেঁ, হেঁ-হেঁ'—হেসে লোকটা গায়ে হাত দিতে আসে। অতসীর সর্বাঙ্গ থর থর ক'রে কেঁপে উঠল। একবার শুধু মনে হল, সে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। তারপর নিমেষে লুপ্ত হয়ে গেল তার সব অনুভূতি। মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়বার আগেই লোকটা দু'হাতে জড়িয়ে ধরল তার সংজ্ঞাহীন দেহটা।

* * * *

এমনি ক'রে দিনের পর দিন জীবনের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম ক'রে দিন কাটে; কাটল জীবনের আরও তিনটী বছর। সূর্যোদয়ের আশা তাদের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। জীবনের গতিতে এতটুকুও পরিবর্তন ঘটে না। শুধু মাঝে মাঝে এক বস্তি ছেড়ে আর-এক বস্তিতে আশ্রয় নেয়; এক ফুটপাথ ছেড়ে চলে অন্য ফুটপাথ ধ'রে।

২

যতটুকু পেয়েছে, তার বেশী এককণা পাবার আশাও সে করে নি কোন দিন; কিন্তু সেই পরিমিত পাওয়ার একবিন্দু হারাবার নৈরাশ্যও অতসী সইতে পারে না। যে পদ্মকে সে দস্তুরমত ভয় করত, এমন কি, যার দিকে মুখ তুলে চাইতেও ওর শঙ্কা হয়েছে, আজ সামনা-সামনি তাকেই শুনিয়ে সে ব'লে উঠল—"অত তেজ ভগবান সইবে না পদ্ম। আমি না দেখি, দশজনে দেখবে—"

পদ্ম শুনেও শোনে না; মুখোমুখি ঝগড়াটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় শুধু একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতসীর মুখপানে চেয়ে আনমনে কাজে চলে যায়।

'অমন ক'রে কা'কে শাপমন্যি দিচ্ছ?'—একতারাটা নামিয়ে রেখে দীনু অলসভাবে ব'সে পড়ল অতসীর পাশে।

প্রথমটা অতসী কোন উত্তর দিল না। দীনুর বিরুদ্ধেও যে ওর অভিযোগ নেই তা নয়; তবু কি ভেবে শেষে উত্তর দেয়—'ওই গায়াকাটী, আবার কে! রাজ্যিসুদ্ধ নিয়েও যেন ওর পোষায় না। ছোট জাত কি না! তাই—'

দীনু হঠাৎ আঁৎকে ওঠে; মনটা বিব্রত হয়ে পড়ে নিজের কাছে জবাবদিহি করতে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে অতসীর পিঠে হাত দিয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করে—'কি হল শুনি?'

'থাক।'—অতসী সরে' বসে ; পিঠ ঝাড়া দিয়ে দীনুর হাতের স্পর্শ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয়। অভিমানে মুখখানা কালো হয়ে ওঠে।

দীনু সত্যি বোঝে না তার দুঃখ। অতসীর এই প্রচ্ছন্ন অভিমান যে কার উপর, সেটা হয়ত অনুমান করে নিতে পারে সে ; কিন্তু চায় না করতে। অকারণ অনুমান ক'রে অস্পষ্টকে স্পষ্ট করবার আকাঙ্ক্ষা আর নেই ওর। নির্মম দারিদ্র্যের সঙ্গে রাত্রিদিন অক্লান্ত যুদ্ধ ক'রে চেতনাটা কেমন বিকল হয়ে পড়েছে। নিজের কাছেই নিজের অস্তিত্ব যেন দিন দিন অস্পষ্ট হয়ে আসে। বাইরের জগৎ, পিছনে ফেলে আসা সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন অতীত—সমুদ্র পারের কষ্ট-কল্পিত চক্রবালের মত মাঝে মাঝে নিভৃত মনের আকাশ প্রান্তে ধরা দেয়। কিন্তু নিজেকে একটী ক্ষণের জন্যেও আর মিলিয়ে নিতে পারে না সেই বিস্মৃত দিনের সঙ্গে।

এখন ও ভিকিরী। ভিকিরী ছাড়া অন্য পরিচয় যে ছিল কোন দিন, সে কথা আজ ঘুমের ঘোরেও একবার মনে ভেসে ওঠে না। আশ্চর্য ! অতবড় একটা জগৎ কেমন ক'রে দেখতে দেখতে ছোট হয়ে গেল। অতীত জীবনের যত উৎসব—সমৃদ্ধির সমস্ত অনুভূতি, পারিপার্শ্বিক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা—সব ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হ'ল ভাঙা ওই একতারাটায়।—অতসী কিনে দিয়েছে ; তার চেনা কোন্ বুড়ো ভিকিরীর কাছ থেকে কান্নাকাটি ক'রে আদায় করেছে ওটা, মাত্র তিন আনা পয়সায়। বাড়ীভাড়ার পয়সা বাকী রেখে, হঠাৎ সে ক'রে ফেলেছে অমনি একটা দুঃসাহসিকতা।

একতারাটা দীনু ভালবাসে ; অতসী কিনে দিয়েছে ব'লে নয়, ওই

জীর্ণ একতারাটি তার নিরালম্ব জীবনটাকে তবুও কিছুক্ষণের জন্যে ক্ষীণ একটা অবলম্বনের সুতোয় বেঁধে রাখে। যে কথা মুখে ফুটে বলতে ও রাত্রিদিন বাধা পেয়েছে, সেই না-বলা কথার প্রতিধ্বনি হয় ওই একতারার তারে। মরচে-ধরা সরু প্রাণহীন তারটা অক্লান্ত কণ্ঠে জানায় আবেদন; মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌছে দেয় রিক্তের করুণ কান্না।

অতসী কাঁদে। দুই হাতে মুখ লুকিয়ে কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে। চাপা কান্নার স্রোত ঢেউ তুলে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহে; কুক্ষি-ছুটো হাফরের মত কাঁপে।

দীনু এতক্ষণ লক্ষ্য করে নি। করলেও, মনস্কতার অভাবে কান্নাটা ঠিক ধরা পড়েনি ওর চোখে।

'বেলা বাড়ছে—অতসী!'—গায়ে হাত দিয়ে দীনু ডাকে; আবার অতসীর কাছে স'রে বসে,—'বেরুবেনা আজ?'

'না।'—কণ্ঠস্বর যেন চাপা পড়েছে গুরুভার পাথরের তলে।

করতল থেকে অতসীর মুখখানা মুক্ত করতে গিয়ে দীনু হঠাৎ চম্‌কে উঠল। সামনের চুলগুলো কাটা! কাটা নয়, পোড়া! বিদ্‌কুটে পোড়া গন্ধ তখনও জমে' আছে রুক্ষ চুলের গোছায় গোছায়।

বিহ্বল দৃষ্টিতে দীনু কিছুক্ষণ চেয়ে রইল অতসীর মুখপানে। ভাবতে পারে না সে, কেমন ক'রে আগুন ধ'রে গেল ওর চুলের গোছায়। নিতান্ত অপ্রতিভের মত অতসীর মাথায় হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল—'কেমন ক'রে পুড়ল অতসী?'

এবার অতসী জ্বলে' উঠল অভিমানে। দীনুর হাতখানা দূরে ঠেলে দিয়ে বলল—'জানি না। আমি জানতে চাইনা।'—তারপর দ্বিতীয়

কোন প্রশ্নের অপেক্ষা না রেখে উন্মত্তের মত ছুটে গেল ঘরের ভিতর।

অতসীর এই রূপান্তর আর কোনদিন সে দেখেনি। দীনু যেন মুহূর্তে কেমন হতভম্ব হ'য়ে গেল। গোড়া থেকে অতসী আপনা-আপনি যতখানি পরিষ্কার হয়েছিল ওর চোখে, তার সবটুকু যেন আকস্মিক আবর্ত্তে আবার ঘোলা হয়ে উঠল।

পদ্মর প্রতিদিনের আচরণ, অতসীর অপ্রত্যাশিত শাপ-শাপান্ত— আরও কত খুঁটিনাটি ঘটনার ছিন্ন টুক্‌রোগুলো আপনমনে মেলাতে মেলাতে দীনু নিজের ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল।—তেমনি বিশ্রী চুলপোড়া গন্ধে ঘরখানা ঝাঁঝাল হয়ে আছে, তারই সঙ্গে মিশেছে চামড়া-ঝলসানো একটা তীব্র গন্ধের ঝাঁঝ। মাথার ভিতরটা কেমন জ্বালা ক'রে ওঠে! দীনু বুঝতে পারে না, কতখানি পরিবর্ত্তন ঘটেছে ওর আস্তানার আবহাওয়ায় এই অলস ভোরের একটিমাত্র প্রহরে। হঠাৎ চম্‌কে ওঠে বালশটার দিকে চেয়ে, সেটা তখনও ধূমিয়ে ধূমিয়ে পুড়ছে!

ভোর না হতেই ও বেরিয়ে পড়েছিল একতারাটি হাতে নিয়ে রাস্তায়। ক্লান্ত চোখ থেকে নিদ্রার জড়তা তখনও কাটে নি। মরণোন্মুখ সহযাত্রীদের প্রাত্যহিক তীর্থযাত্রার কলরব সইতে পারে না ব'লে, ওরা জাগবার আগেই দীনু পালিয়ে যায় পথে।

আগুন নিবে গেছে; কিন্তু ভিজে বালিশটার গায়ে তখনও জড়িয়ে আছে ধোঁয়া। তেলচিটে-ময়লার পুরু আবরণ ভেদ ক'রে ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো মুক্ত হতে পারে নি।

বালিশটার গায়ে, আশে পাশে ছড়িয়ে আছে কতগুলো লম্বা চুল। সেই আধ-পোড়া রুক্ষ চুলগুলো দেখে আর কোন অসুবিধা হয়

না আগাগোড়া অনুমান ক'রে নিতে। তবুও দীনু ভাবতে পারে না, কেমন ক'রে তাঁর ঘরে হল এই অগ্নিকাণ্ড? কাজটা যে পদ্মর তাতে কোন সন্দেহ নাই; সে-ই আগুন ধরিয়ে দিয়েছে অতসীর একরাশ চুলের গোড়ায়। কিন্তু, কেন? কি লাভ তার, অতসীকে অমন ক'রে শাস্তি দিয়ে?

মনটা পাক খেয়ে যায়। এতদিনের ভিতর অতসীর কথা সে কখনও এমন ক'রে ভাবেনি। চলার পথে যে অতসী পান্থ-পাদপের মত পাশে পাশে রয়েছে পিপাসার জল নিয়ে, তার সম্বন্ধে নিজের এই নির্লজ্জ উদাসীনতা যেন আজ ওকে চাবুক মারে।

ক্ষিপ্রপদে দীনু ঘর থেকে বেরিয়ে চীৎকার ক'রে ডাকল—'অতসী!'

সাড়া নেই। অতসীরা কখন চলে গেছে ভিক্ষেয়। ওদের ঘরে চাবিসুদ্ধ তালা আটকান।

দীনু বিমূঢ়ের মত চেয়ে থাকে। এইমাত্র, এক মুহূর্ত আগে অতসী জবাব দিয়েছে ভিক্ষেয় যাবে না ব'লে। অথচ দীনুকে একটা ডাক দিয়ে যাবারও সবুর সইল না তার!

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দীনু কি ভাবছিল। অন্যমনস্কতার অবসরে তর্জনীটা কখন আঘাত ক'রে বসল একতারার তারে।

একতারার ঝংকার শুনে পিছন থেকে চাপা ব্যঙ্গের সুরে হঠাৎ পদ্ম ব'লে উঠল—'ফিরতে হবে গো, হাত বন্ধ।'

দীনু ফিরে চাইতে না-চাইতেই চটুল গতিতে পদ্ম ওর সামনে দিয়ে চ'লে গেল ভাড়াটেদের ঘরে।—মনটা সত্যি বিষিয়ে ওঠে।

এই বেহায়া মেয়েটাকে ও একতিলও যেন সহ্য করতে পারে না। মনে হয়, দৃঢ়মুষ্টিতে ওর চঞ্চল দেহটাকে দুহাতে নিংড়ে উন্মত্ত রক্তকণিকার সবটুকু কদর্যতা নিমেষে নিঃশেষ করে দেয়। আবার পরমুহূর্তেই লজ্জিত হয়ে পড়ে অসঙ্গত চিন্তার আকস্মিক প্রতিঘাতে।

ভাল না বাসলেও, মেয়েদের অশ্রদ্ধা করতে ওর সংস্কারে বাধে। রক্তে রক্তে যে দেনা-পাওনা জড়িয়ে আছে সৃষ্টির প্রথম রাত্রি হতে নারী আর পুরুষের সর্বাঙ্গে, তার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে ওর প্রত্যেকটি নর্ম-কণিকা যেন মূর্ছিত হয়ে পড়ে। অতীত মুছে গেছে, কিন্তু এখনও মনটা মাঝে মাঝে জেগে উঠতে চায় নিষ্ক্রিয়তার শিকল ভেঙে।

একতারাটা বুকের উপর আঁকড়ে ধ'রে দীনু যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় আবার বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

গ্রাম্য বাউল যেমন করে গান গেয়ে চাল সাধে, তেমনি ক'রে দীনুও ফিরে বেড়ায় একতারা বাজিয়ে লোকের দরজায় দরজায়। প্রথম কয়েকদিন বেশ কষ্ট করতে হয়েছে নিজেকে নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে। কিন্তু এখন আর কোন অসুবিধাই হয় না। একতারাটায় আঙুলের আঘাত দিয়ে ঘড়ির কাঁটার মত নির্বিকার গতিতে একটির পর একটি গৃহস্থের দ্বার অতিক্রম করে। গান খুব ভাল গাইতে পারে না। শৈশবের স্মৃতিস্তূপ হতে মাঝে মাঝে টেনে তোলে গ্রাম্যগানের দু-একটা অসম্পূর্ণ কলি। কোনটা ব্যর্থ সুরের আঘাতে ভেঙ্গে পড়ে, কোনটা জীবন্ত হয় ওর রিক্ত মনের ছোঁয়াচ লেগে।

মুমূর্ষু পৃথিবী

হাঁটতে হাঁটতে আজ দীনু এসে পড়েছে অনেক দূরে; দক্ষিণ অঞ্চলের সহরতলী ছাড়িয়ে লোকালয়ের প্রায় শেষ প্রান্তে। দুপুর গড়িয়ে গেছে, কিন্তু তখনও হয়নি দিনান্তের সংস্থান। হাত পেতে ও চায় না কারো কাছে, গান শুনে আপনা থেকে যে যা দেয়, একটা পয়সা বা আধলা, তা-ই কুড়িয়ে নেয় মাথা নাচু ক'রে। মুষ্টিভিক্ষা নেবার মত মনটাকে এখনও তৈরি করতে পারেনি বলেই অতসীর দেওয়া ঝুলিটা আনতে রোজই ভুল হয়ে যায়।—পারবে না সে, কোন দিনই পারবে না।

এবার ক্লান্তি আসে। বেশী দূর এগিয়ে যাবার মত শরীরের অবস্থা নেই আর, ইচ্ছেও করে না। সামনের বড় বাড়ী দুটো সেরে নিয়ে আজকের মত বাসায় ফিরবে।

ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে দীনু ইতস্তত করে। ঐশ্বর্যের মণিকোঠায় পা বাড়াতে ওর সাহস হয় না। ভয় ঠিক করে না, ওই আবহাওয়া—রোরুদ্যমান পৃথিবীর বুক ঝাঁঝরা ক'রে গ'ড়ে তোলা ওই প্রাচুর্যের উই-ঢিবিগুলো ওর বঞ্চিত-দেবতাকে উৎপীড়িত করে। বুভুক্ষিত মানুষের হাহাকার ওদের অনাবশ্যক সঞ্চয়ের প্রাচীর ভেদ ক'রে মনের দরজায় গিয়ে পৌছয় না কোন দিন।

দীনুর কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে আপনা-আপনি উথলে ওঠে—

ও মন, স্বপন যেদিন ভাঙবে রে তোর
ধরবে আগুন মনে।
হায়, মরবি খুঁজে সোনার হরিণ
গহন গভীর বনে॥

ফটকের ভিতর পা বাড়াতেই দারোয়ান গর্জন ক'রে উঠল—'উধার দেখো।'

প্রথমটা দীনু একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর কি ভেবে ঠিক আগের মতই আবার নির্বিকারভাবে এগিয়ে চলল পাশের বাড়ীর দিকে।

পিছন থেকে কে ডাকে! শব্দটা কানে পৌছয়, কিন্তু বিশ্বাস হয় না। হয়ত অন্য কাউকে ডাকে; না-হয়, শুনবার ভুল। না, ভুল নয়। ওকেই ডাকে সেই হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা। ভিতরে শোনা যায় নারীকণ্ঠের ঝংকার; তিরস্কার! ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে তিরস্কার করে দারোয়ানটাকে।

দীনু উৎকর্ণ হয়ে শুনবার চেষ্টা করে। মুহূর্তে অতীত স্বপ্নের আবছা অনুভূতিগুলো ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ওই আবেষ্টন, ওই ঝংকার —ওরই পিছনে জ্বলে নরমেধ যজ্ঞের বিরাট অগ্নিকুণ্ড!

এবার আর দারোয়ানের চোখ দুটো ধক্ ক'রে ওঠে না; ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় ভিতরে।

এমনি ঘর,—চিত্রিত আস্‌বাবে সাজানো সুসজ্জিত কক্ষ দীনুর ক্ষীণ স্মৃতিতে অতিক্রান্ত পথের মাইলস্টোনগুলোর মত আজও আঁকা আছে।—সামনের সোফায় ব'সে একটি তরুণী। সর্বাঙ্গে আধুনিকতার চূড়ান্ত পরিপাটি। রূপের প্রাচুর্য নেই সত্যি, কিন্তু অফুরন্ত সৌষ্ঠব যেন নিবিড়ভাবে ঘিরে আছে সারাটি দেহ।

দীনু হতভম্বের মত চেয়ে থাকে। কার্পেট-মোড়া মেঝেয় পা বাড়াতে ওর সংকোচ হয় আজ।—পরনের শতচ্ছিন্ন কাপড়খানায় জমে উঠেছে রাজ্যের ময়লা। দিনের পর দিন ধূলো-মাটি জমে' চুলগুলোয়

জটা বাঁধবার উপক্রম হয়েছে। মুখখানা কদাকার হয়ে উঠেছে কত দিনের অবিন্যস্ত দাড়ি আর গোঁফে। চোখের চাউনিতে পর্যন্ত ফুটে উঠেছে কেমন একটা বিকৃতি।

'আর একবার গাও তো ওই গানটা।' অঙ্গুলিসংকেতে বসবার অনুমতি জানালেন তিনি।

ধীরে ধীরে অবস্থাটা স'য়ে নিয়ে দীনু সেইখানেই ব'সে পড়ল মাটিতে।—গান? কি গান গাইবে ও! গানের সব উৎস শুকিয়ে গেছে ওর জীবনের মরুপথে। আজ যে সুর ক্ষণে ক্ষণে আর্তনাদ করে ওই জীর্ণ একতারার শব্দটুকু ঘিরে, সে শুধু প্রতিধ্বনি—ওর মৃত আত্মার করুণ কান্নার প্রতিধ্বনি।

দীনুকে নীরব দেখে তিনি আবার বললেন—'গাও না, যে গানটা গাইছিলে তখন।'

অগত্যা গান ধরতে হয়। কিন্তু দীনুর বুকে তখন অতীত ও বর্তমানের প্রচণ্ড সংঘাতে যে প্রলয় সুরু হয়েছে, তা শুধু অন্তর্যামীই জানেন। ওর চোখে নেমে আসতে চায় জলের জোয়ার। এমনি ক'রে গান গাইতে তো কেউ ওকে বলে নি কোন দিন। ওর না-বলা ব্যথা, রিক্ত-জীবনের পুঞ্জীভূত বেদনা যেন আজ হাহাকার ক'রে উঠতে চায় গানের সুরে। ফেনিল আবর্তে রুদ্ধ কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে—'মরবি খুঁজে সোনার হরিণ গহন গভীর বনে—ও তুই মরবি কেঁদে রে—'

ব্রততীর মনটা যেন সকাল থেকে অকারণ বেদনার্ত হয়ে উঠেছিল। ওর চারিদিকে ভিড় করেছে পর্যাপ্ত ঐশ্বর্য আর স্তুতি-গান। মায়ের মৃত্যুর পর হ'তে একটি দিনের জন্যেও পায় নি মুক্তির বাতাস।

অনাবশ্যক সহানুভূতির ভারে জীবনটা তিল তিল ক'রে চাপা পড়েছে জগদ্দল পাষাণের তলে। যারা ওকে ভালবাসে, তারা শুধু বেড়াজাল বুনে আটকে রাখতে চায় ওর তৃষিত সত্তাকে; চোখের সামনে থেকে মুছে নিতে চায় পৃথিবীর রূপ। প্রতিদিনের সহযাত্রী মানুষ যারা, তারাও দেখতে দেখতে ওর কাছে হেঁয়ালি হয়ে ওঠে।

দীনুর আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে ব্রততী বলে—'তুমি কি পাড়াগাঁয়ের লোক?'

'হাঁ'—ব'লে দীনু আনমনে আঁচল দিয়ে একতারার তারটা মুছবার চেষ্টা করে। ব্রততীকে অমন ভাবে চাইতে দেখে শঙ্কা হয়, হয় তো সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কখন ভেদ করবে ওর দৈন্যের আবরণ।

ব্রততীর মনে পড়ে মায়ের কথা—পল্লীগ্রামের কথা। ওর মামা-বাড়ি ছিল পল্লীগ্রামে। ছেলেবেলায় সে কতবার গেছে মায়ের সঙ্গে। সকাল না হতেই দাদু ব্রততীকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন গ্রামের পথে। জেলেরা তখন মাছ ধ'রে ফিরত। চাষীরা লাঙ্গল ঘাড়ে ক'রে দলে দলে যেত মাঠের পথে। দাদুকে দেখে পথের পাশে হুঁকোটা নামিয়ে রেখে তারা সসম্ভ্রমে গড় হয়ে প্রণাম করত। সবুজ ঘাসে ঝরে পড়ত হলুদ রঙের বাবলা ফুল। সোনালি গালিচার মত আজও ঝলমল করে ওর চোখের সামনে। ব্রততীর কথা যেন ফুরাতে চাইত না। অর্থহীন অজস্র প্রশ্নে দাদু অস্থির হয়ে উঠতেন।

দীনু একটু ইতস্তত ক'রে উঠে দাঁড়াল। দুপুর গড়িয়ে গেছে; আবার ফিরতে হবে চার মাইল পথ।

তরুণী সচেতন হয়ে উঠলেন। টেবিলের উপর থেকে হাতব্যাগটা টেনে নিয়ে, একটি আধুলি বের ক'রে ছুঁড়ে দিলেন দীনুর পায়ের কাছে।

দীনু তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আধুলিটা না কুড়িয়ে মাথা নীচু ক'রে বলে—'মাত্র একটা গান করেছি, তার জন্যে আট আনা পয়সা!—তা ছাড়া, এত দরকারও হয় না আমার, একটি দুটি ক'রে পয়সা কুড়িয়েই দিন কেটে যায়।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে ব্রততী আর একবার ওর মুখপানে চেয়ে বলল—'তা হোক। ওটা দিলাম তোমাকে।'

'আপনি দিলেন; কিন্তু আমি ত নিতে পারব না। অভাব আমার সত্যি; তাই ব'লে দশজনের পাওনা একাই কুড়িয়ে তাদের ফাঁকি দিতে চাই না।'—কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেলে দীনু যেন কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। ওর সর্বদাই ভয়, পাছে কারো চোখে ধরা পড়ে যায় তিরিশ বছরের সেই জীর্ণ ইতিহাসের কোন পাতা!

ব্রততী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে বলে—'তুমি ভিকিরী নও?'

—'না। হাঁ, ভিকিরী ছাড়া আর কি?' দীনু একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়ে।

কথাটা শুনে তরুণী যেন হঠাৎ চমকে উঠলেন। ওর কথা শুনে সত্যি মনে হয়, ও ভিকিরী ছিল না কোন দিন! উৎসুক হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন—'তবে?'

একটু ইতস্তত ক'রে দীনু বলে—'গান গেয়ে যে একটা-দুটো পয়সা পাই, তার বেশী—'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে তরুণী লঘু হাসির সঙ্গে বলেন—'বেশ ত, ওটা নয় আগাম দিলাম। রোজ এসে গান শুনিয়ে যেও।'

'একই পাড়ায় রোজ ভিক্ষে করতে আসা চলে না।' দীনু মাথা নীচু ক'রে ভাবে।

'তবে, একদিন পর একদিন এসো। ঠিক এসো কিন্তু, এমনি সময়। বেশ লাগে তোমার গান।'—উত্তরের অপেক্ষা না রেখে ব্রততী উঠে পড়ে। সত্যি বেশ লাগে ওর গান। মন্থর পদে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। মনে হয়, ওই ভিকিরী বাউলের জীবনটাও বোধ হয় ওর চেয়ে ভাল। পৃথিবী-সুদ্ধ লোক ওকে খুশী করবার জন্যে মিথ্যা অভিনয় করে না। ও গান গায়, ভিক্ষে করে। যারা বন্ধু তারা কারণে-অকারণে রাত্রিদিন ওর স্তুতি গান করে না। মানুষ ওর কাছে মানুষ হয়েই দেখা দেয়; সেই মুখোমুখি পরিচয়ের মাঝখানে কৃত্রিমতার অদৃশ্য প্রাচীর পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে না।

ব্রততী হাঁপিয়ে ওঠে, মনটা অস্বস্তিতে ভ'রে যায়; ওর সমাজ, নিরবচ্ছিন্ন আভিজাত্যের সতর্ক পরিবেশ যেন অক্টোপাসের মত ঘিরে ধরেছে অন্তরের মানুষটাকে। ইচ্ছে হয়, চীৎকার ক'রে কাঁদে। কিন্তু পারে না। স্যার সি. কে. রায়ের মেয়ে ও। প্রতি পদক্ষেপে বাঁচিয়ে চলতে হবে বংশ-মর্যাদা—ওদের আকাশ ছোঁয়া আভিজাত্য। এই চাকর-খান্‌সামা, চলমান বিশ্বের জাগ্রত মানুষের দল—সকলের চোখে ও হয়ে থাকবে চিরন্তন হেঁয়ালি। দুর্বোধ্য,—মানুষের কাছে ওকে থাকতে হবে চিরদিন দুর্বোধ্য।

অগত্যা আধুলিটা কুড়িয়ে নিয়ে দীনু ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। জীবনের ভার যেন ক্রমেই অসহ্য হয়ে ওঠে।

মনটা এমন তিক্ত হয়ে উঠেছে যে, আজ আর কিছুই ভাল লাগে না। অতসীর চুলগুলো মিছেমিছি পুড়িয়ে দিয়েছে ওই গলাকাটা মেয়েটা। ফলে, হয় ত অতসীর কাছে দীনুও দায়ী হয়ে পড়েছে

অনেকখানি। ওরা বোঝে না, বুঝবার মত শক্তিও বোধ হয় নেই ওদের—দীনুর জীবনে যে বিপ্লব এসেছে, সে দুরন্ত বিপ্লবের মুখে পদ্ম আর অতসী কতটুকুই বা! সেই ভাঙনের মুখে ওদের বালির বাঁধ একটী মুহূর্তের জন্যেও আটকাতে পারে না জল-স্রোতের উচ্ছ্বাস। কিন্তু সে ভুল ভেঙে দিয়ে, ও চায় না অতসীকে উৎপীড়িত ক'রে তুলতে।

চলতে চলতে দীনু হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। পথের পাশে একটী মেয়ে আঁচলে কুড়িয়েছে কতকগুলো বাসি ভাত, পাশে ব'সে চীৎকার করে একটি পাঁচ-ছ বছরের শিশু। ছেলেটা একমুঠো ভাতের জন্যে ছটফট করে; কিন্তু মা একহাতে শক্ত ক'রে চেপে ধরেছে তার কচি হাত দুটো, অন্য হাতে মুঠো মুঠো ভাত নিজের মুখে তুলছে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ ক'রে। ছেলেটা প্রাণপণ চেষ্টা করেও হাত বাড়াতে পারে না। চীৎকার ক'রে কাঁদে; নিষ্ফল হাহাকারে আর্তনাদ করে তার ক্ষুধার্ত দেহের যন্ত্রগুলো!

দীনু করুণ দৃষ্টিতে একবার চেয়ে দেখে। ইচ্ছে করে, মেয়েটার হাত দুটো মোচড় দিয়ে ভেঙ্গে দেয়। কিন্তু পরমুহূর্তে মন বেদনার্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুধার্ত মানুষের সত্যিকারের রূপ যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে ওর চোখের সামনে। বুকের দুধ দিয়ে যার দেহের প্রত্যেকটি অণুপরমাণু পুষ্ট করেছে বিপুল আনন্দে, আজ তারই মুখের ভাত কেড়ে নিতে ওর বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই! অম্লান মুখে গিলে চলেছে ক্ষুধার্ত ছেলেকে অসুরের মত দূরে ঠেলে রেখে।

মেয়েটার মুখপানে বিমূঢ়ের মত চেয়ে দীনু বলে—'দাও না ওকে দু মুঠো ভাত! ছেলেটা না খেয়ে—'

'মরুক্‌। হাড় ক'খানা বাতাস পাবে।'—ওর যেন কথা বলবারও অবকাশ নেই। দেখতে দেখতে ভাতগুলো প্রায় নিঃশেষ ক'রে ফেলল। একসঙ্গে এত ভাত মুখে তুলছে যে, গালদুটো রবারের ব্যাগের মত ফুলে ওঠে। আপন মনে বিড বিড ক'রে বলে—'হেঁ, খেয়ে দিক ভাতগুলো সব।'

দীনুর মনটা বিরক্তিতে ভ'রে ওঠে। ছেলেটার জন্যে কষ্ট হয় না; কষ্ট হয় তার মায়ের কথা ভেবে। কতকাল না খেয়ে, হৃৎপিণ্ডটা পর্যন্ত পাথর হয়ে গেছে। একবার মনে হয়, ছেলেটাকে ডেকে দু পয়সার খাবার কিনে দেয়; আবার কি ভেবে হন হন ক'রে এগিয়ে চলে, দৃষ্টিপথ থেকে ওদের আড়াল করবে ব'লে। ও সইতে পারে না আর। সেই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার তাণ্ডব অগ্নিশিখা যেন দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীময়! চোখ দুটো ঝল্‌সে যায়; মনে হয়, পথের ওই গাছপালাগুলোতেও এখুনি জ্বলে উঠবে আগুন।

দীনু কিছু দূর এগিয়ে যেতে-না-যেতেই মেয়েটা হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল। কেউ যেন প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে তার মাথায়। চাইতে ইচ্ছে হয় না, তবু না চেয়ে পারে না সে যন্ত্রণা-কাতর চীৎকার শুনে। ছেলেটা প্রাণপণ শক্তিতে কামড়ে ধরেছে মায়ের ঘাড়ে। মা দু'হাতে তার গলা টিপে ধ'রেও ছাড়াতে পারে না। চোখের সামনে অমনি ক'রে ভাতগুলো শেষ হতে দেখে, সে আর সইতে পারে নি। ওই শিশুর অন্তরের ঘুমন্ত দেবতা হঠাৎ জেগে উঠেছে উন্মত্ত দানবের মূর্তিতে।

ছুটে গিয়ে দীনু জোর ক'রে ছেলেটার চোয়াল দুটো চেপে ধরল; তার কশ ব'য়ে তখন রক্ত ঝরছে। মেয়েটা থর থর ক'রে

কাঁপে ; ভয়ে মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ছেলেটা তখনও ফুলে ফুলে উঠছে ক্ষুব্ধ আক্রোশে।

পথচারী ওরা। ওদের জন্যে কিসের দরদ ?—তবু পারে না। অমনি আর্ত অবস্থায় মেয়েটাকে ফেলে যেতে কষ্ট হয়। ছেলেটাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়ে দীনু দু পয়সার খাবার কিনে দেয় তার হাতে। তারপর আবার ফিরে আসে ; মেয়েটার দিকে চেয়ে আনমনে দাঁড়িয়ে ভাবে।

মেয়েটি হঠাৎ আছাড় দিয়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে। দু'হাতে পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ওঠে—'তুমি পালিও না। আমায় বাঁচাও, দুষমনটা হাড়ের ভিতর দাঁত বসিয়েছে।'

দীনু একবার আকাশের দিকে মুখ তুলে চায়, তারপর স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মেয়েটার মুখপানে। অস্তগামী সূর্যের শেষ আভাটুকু ছড়িয়ে পড়েছে তার মুখে। হঠাৎ দীনু আঁৎকে ওঠে; বুকখানা দ্রুত স্পন্দনে তোলপাড় করে। এ যেন চেনা মুখ! মনে হয়—কতকাল আগে, জীবনের কোন এক নিভৃত মুহূর্তে বারবার চেয়ে দেখেছে ওই মুখখানা। বয়স তার চব্বিশের বেশী নয়। মুখের রেখায় রেখায় তখনও লেগে আছে গার্হস্থ্য জীবনের ছাপ।

সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসে। একবার মনে হয়—ভুল, ওর জীবনব্যাপী ভুলের চলচ্চিত্রে এও একটা ভ্রান্ত ছবি। দীনু বিশ্বাস করতে পারে না তার অতীতকে ; বর্তমানটা চোখের সামনে প্রতি-নিয়ত স্বপ্নের জাল বুনে চলে। উৎক্ষিপ্ত আবেগে সারা অন্তর বিদ্রোহ ক'রে ওঠে—'না, না ; হতে পারে না। জীবনের ভাঙা পেয়ালায় যে বুদ্‌বুদ গাঁজিয়ে ওঠে, সে শুধু মিথ্যার পঙ্কিল গ্লানি!'

স্বপ্নাবিষ্টের মত দীনু ধীরে ধীরে ব'সে পড়ল সেইখানে। মেয়েটার চেতনা বোধ হয় তখন লুপ্ত হয়ে এসেছিল। অবসন্ন পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে আসে। কালো পর্দার অন্তরালে কেঁপে কেঁপে ওঠে মানুষের দীর্ঘশ্বাস।

দীনুর কোলে মুখ লুকিয়ে মেয়েটি ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগল!

স্যার সি. কে. রায়ের একমাত্র মেয়ে ব্রততী। ব্রততী যখন দশ বছরের, তখন স্যার সি. কে. হয়েছেন বিপত্নীক। বিপত্নীক পিতার সর্ব্বস্নেহের আবেষ্টনে স্বপ্নলোকের কল্পলতার মত ব্রততী ধীরে ধীরে বেড়ে উঠেছে অবাধ স্বাচ্ছন্দ্যে। ওর জীবনের প্রত্যেকটি কলোচ্ছ্বাস স্যার সি. কে'র জীবনে পলে পলে জাগ্রতির ছোঁয়া দিয়েছে। রাত্রি-দিন যে বৃত্তিগুলো ওঁর বাইরের জগতে ছড়িয়ে থাকে ঐশ্বর্য্যের ব্যাপ্তিকে ঘিরে, ব্রততীর স্পর্শ যেন যাদুমন্ত্রে সেগুলো ফিরিয়ে আনে মুহূর্তে তার শাসন-সীমার অপরিসর গণ্ডীর ভিতর নিদ্রাতুর দুরন্ত শিশুর মত শৃঙ্খলিত ক'রে। ব্রততীর জীবনে স্যার সি. কে. ছাড়া আর কারো অবস্থিতি যেমন তিলার্ধের প্রতিষ্ঠা নিয়েও ওকে চঞ্চল ক'রে তুলতে পারে না, স্যার সি. কে.'র জীবনেও তেমনি নিবিড় দীপ্তিতে ভোরের শুকতারার মত জ্বল্ জ্বল্ করে ওই ব্রততী।

ব্রততী বেড়ে ওঠে; দেখতে দেখতে আপন উল্লাসে দুকূল ছাপিয়ে উথলে ওঠে জীবনের স্রোত। তারই সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে নিতান্ত আপনার একটা নতুন জগৎ। চারিদিকে একে একে যাত্রীর ভিড় জমে; বন্ধু, বান্ধবী, স্তাবক, তারপর প্রণয়প্রার্থীর দল। রাত্রিদিন ওকে ঘিরে যেন গুঞ্জন করে তারা। ব্রততী সুন্দরী;

অনবদ্য সৌষ্ঠব ওর অঙ্গে অঙ্গে জড়িয়ে আছে পুষ্পিত মাধবীমণ্ডপের মত। সারা দেহ যেন প্রতি ভঙ্গিমায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে উৎসবের গানে।

বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী শঙ্কর গুপ্তের কাছে ব্রততী নাচ শেখে। এই ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সে প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে বিদ্যুৎপর্ণার ভূমিকায়। ভারতী-বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সঙ্গে ডমিনিয়ন স্টেজে অজন্তা-নৃত্যে দিয়েছে সে অসামান্য নৈপুণ্যের পরিচয়। তারপর থেকেই ব্রততী হয়ে উঠেছে ওদের মহলে আলোচনার বস্তু। রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছে ওর নাম; মুখর প্রতিভার পরিচয় মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে শিলঙের শৈল-নিবাস থেকে আরম্ভ ক'রে ডায়মণ্ড হারবারের স্টীমার পার্টির মজলিস পর্যন্ত। নতুন ব্যারিস্টার মিঃ স্যানিয়াল, প্রোফেসর ডাট, ডক্টর শৈলেন ব্যানার্জী—এঁরা যেন অফুরন্ত হয়ে উঠেছেন ব্রততীর স্তুতিগানে।

কিন্তু আর ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে মনটা কেমন শিথিল হয়ে আসে; ব্রততীর জগতেও নেমে আসে কেমন ক্লান্তি। জীবনটা যখন প্রতিফলিত হয় ওর মুখেচোখে—সারা দেহে, স্যার সি. কে. হঠাৎ আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। সস্নেহে ব্রততীর মুখখানা বুকের কাছে টেনে নিয়ে শঙ্কিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন—'তোর কি কোন অসুখ করেছে তাতু?'

'না, বাবা!'—শাড়ীর আঁচল থেকে অকারণ একটা সূতো টেনে ব্রততী আঙুলে জড়ায়। ভেবে পায় না, কি উত্তর সে দেবে তার অসহায় বাপকে।

নিজের উদাসীনতাকে স্যার সি. কে. যেন ক্ষমা করতে পারেন না।

মনে হয়, কাজের ভিড়ে কখন ব্রততী সরে' গেছে দূরে। একটু ইতস্তত ক'রে আবার বলেন—'ওরা কেউ আসে নি বুঝি আজ?'

বাপের সংকোচ দেখে, ব্রততীর মুখে ক্ষীণ একটুকরো হাসি ফুটে ওঠে—'কা'রা বাবা?'

'অজয়, শৈলেন—ওরা সব।'

'বাবা!'—ব্রততী মুখ তুলে চায়। হঠাৎ বেদনার্ত চোখদুটো যেন বাপের দিকে চেয়ে ঝিমিয়ে আসে। বলি বলি ক'রেও সে বলতে পারে না। মনে হয়, ওঁর মনটা বুঝি পীড়িত হয়ে পড়বে। তবুও একটুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বলে—'ওঁরা! হাঁ, এসেছিলেন সবাই। এই কিছুক্ষণ হ'ল গেছেন একে একে। সবাই যেন এক একটা আলাদা মডেলের টকিং মেসিন। মানুষকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে।'

ব্রততীর কথাগুলো—তার এই আকস্মিক ভাবান্তর স্যার সি. কে. ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে বলেন—'তুই কি ওদের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস তাতু?

ব্রততী খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে, 'ঝগড়া! ওঁরা যদি জানতেন কেউ ঝগড়া করতে, তা হলে বেঁচে যেতুম বাবা। তবুও তো দেখতে পেতুম, অন্তত একটা মানুষের সত্যিকারের চেহারা। ঝগড়া করতে হলেও বিদ্রোহ করবার সাহস থাকা দরকার। যারা শুধু স্তুতি করে, তারা ঝগড়া করতে পারে না।'

'কি যে বলিস মা, কিছুই বুঝি না। তোর মনের কথা আমার কাছে খুলে বলতে কি সংকোচ হয় তাতু?'

—ব্রততীর মুখের উপর থেকে এলোমেলো হাল্‌কা চুলের গোছা-গুলো সযত্নে কপালের দু'পাশে সরিয়ে দিতে দিতে স্যার সি. কে. মৃদু

গলায় আবার জিজ্ঞেস করেন—'শৈলেন? শৈলেনকেও কি তোর ভাল লাগে না মা?'

ব্রততী হাসে। তেমনি ক'রে হেসে জবাব দেয়—'ভাল আমার সবাইকেই লাগে বাবা। কিন্তু তার চেয়ে বেশী হয় দয়া। ওঁদের শুধু দয়া করতেই ইচ্ছে করে।'

বাপের বিস্ময় যেন আরও বেড়ে ওঠে। ব্রততীর মনটাকে তিনি কোনমতেই ধরতে পারেন না। কি বলবেন, ভাবতে গিয়ে বুক ছাপিয়ে দীর্ঘশ্বাস ওঠে। ব্রততীর মুখপানে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে কি যেন খুঁজবার চেষ্টা করেন।

ব্রততী তাঁর অন্যমনস্কতাকে হঠাৎ একটু নাড়া দিয়ে বলে—'আমার কি ইচ্ছে করে, জানো বাবা? ইচ্ছে করে—এই শহর, লোকজন, গাড়ী, বাড়ী, আলো—সব ছেড়ে দিয়ে আমরা চলে' যাই দূরে। অনেক দূরে—ছোট্ট একটি গাঁয়ের পাশে, নদীর ধারে, ঘর বেঁধে থাকব শুধু তুমি আর আমি। মাঝে মাঝে আসবে যাবে দু-একজন সত্যিকারের মানুষ।'

এবার স্যার সি. কে. হো হো শব্দে হেসে ওঠেন। ব্রততীর কথা শুনে তিনি না ব'লে পারেন না—'ওরে পাগলি মা, দু'দিন পরেই সেরে যাবে সব। দিন এলে সবই ভাল লাগবে। অমন বয়েসে আমাদেরও মাঝে মাঝে অমনি বৈরাগ্য হ'ত। নিতান্ত ক্ষণিক ওটা। মনের মত ঘর-সংসার হলে, শেষে আর কিছুই চাইবি না। কি যেন বলেছেন তোদের কবি? বল্ না, সেই লাইন দুটো একবার!—বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে সব আমাদের জন্যে নয়, ওই রকম কি যেন'...কথাটা শেষ না ক'রেই স্যার সি. কে. আবার হেসে উঠলেন জোরে।

পিতার কর্মক্লান্ত মনটাকে আঘাত করতে ব্রততীর ইচ্ছা করে না। সেই উচ্ছ্বসিত হাসির সঙ্গে যোগ দিয়ে সে সুর ক'রে বলে—'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, সে আমার নয়। অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়, লভিব মুক্তির স্বাদ।'

'তবে?'—স্যার সি. কে. যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। ব্রততীর মাথাটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। মুখখানা প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

মনটা গুছিয়ে নিয়ে ব্রততী হঠাৎ উঠে বসে; 'তুমি ত এখনো চা খাওনি বাবা? আপিসের পোষাকটাও বদলাবার সময় হয় নি বুঝি? যাও, ততক্ষণে জামা-কাপড় বদলে বাথরুম থেকে ফিরে এসো; আমি চা-টা তৈরি ক'রে আনি।'

সি. কে. বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে বলেন—"থাক্ তাতু, ওরাই আনবে, মা। বরং কিছুক্ষণ বোস আমার কাছে। সারাদিন থাকি শুধু কাজ আর কাজ নিয়ে, তুই কখন স'রে যাস্ দূরে।'—চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে।

'ওরা পারবে না, বাবা। দেখ তো, পাঁচ মিনিটে হয়ে যাবে আমার'—ব্রততী ত্রস্ত পদে বেরিয়ে গেল।

স্যার সি. কে. শিথিল ভাবে হাত পা ছড়িয়ে কোচের উপর শুয়ে পড়লেন;—'ঠিক অমনি রোগ ছিল ওর মায়ের। ঐশ্বর্য যেন তাকে পীড়া দিত। সে সইতে পারত না পৃথিবীর এই কোলাহল, এই তীব্র আলো। ছোট একখানি ঘর বাঁধতে চাইত নদীর ধারে, না-হয় পাহাড়ের কোলে;—শুধু সে আর আমি। তাতুর মনে সেই পুরনো রঙটার ছোপ লেগে আছে। ওটাও বেশী দিন থাকবে না। দিনের

পর দিন ফিকে হয়ে, শেষে মিলিয়ে যাবে ওর বিচিত্র জগতের নানা বর্ণে।'

রবিবার। ব্রততীর চায়ের টেবিলে প্রভাতী মজলিস জমে উঠেছে। ওদের মহলের বিখ্যাত নর্তকী মুরলা নন্দী আজ এখানে নিমন্ত্রিতা। মিসেস গুপ্তা, প্রোফেসর দেবশঙ্কর তথা শঙ্কর গুপ্ত, মিস্টার স্যানিয়াল, মসিয়ে ডাট্ এবং ডক্টর ব্যানার্জীও আমন্ত্রিত হয়েছেন তাতুর চায়ের আসরে।

প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের চেয়ে সমৃদ্ধতর না হলেও, আজকার আসর যে একটু বিশিষ্টতর হয়ে উঠেছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

সকালটা সত্যি বেশ জমে উঠেছিল। কিন্তু মিস্টার স্যানিয়ালের সঙ্গে দত্ত সাহেবের কেমন একটু রেশারেশির আঁচ দেখা দিল। সেটা কিছুদিন থেকেই ভিতরে ভিতরে পাকিয়ে উঠেছিল। ওঁদের সেই রুদ্ধ প্রবাহ মনের গোপনতম স্তরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠলেও তার আভাস একটী দিনের জন্যেও বাইরে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু ব্রততীর চোখ এড়িয়ে ওঁরা এক পা-ও বাড়াতে পারেন নি তার চলাপথের ত্রিসীমানায়। ব্রততীর হাসি পায়; অত্যন্ত করুণার হাসিতে ওর সারা অন্তর যেন ওদের শুধু ক্ষমা করতেই চায়। তার বেশী এক কণাও সে দিতে চায় না; নিতেও হয় ত চায় না এতটুকু শ্রদ্ধার দান।

আজ চায়ের টেবিলে নিতান্ত তুচ্ছ উপলক্ষ্য নিয়ে ডাট্-স্যানিয়ালী অন্তর্বিপ্লবটা যেন হঠাৎ প্রখর হয়ে উঠল। উপলক্ষ্য বিশেষ কিছু নয়; তবু ওই চেয়ারখানির উপর সাময়িক অধিকার বিস্তারের সুযোগ

হারিয়ে, দত্ত সাহেব যেন সিংহাসনচ্যুতির ক্ষোভে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। অনবধানতার অবসরে মিঃ স্যানিয়াল কখন দখল ক'রে বসেছেন ব্রততীর পাশের চেয়ারখানা। এই সামান্য ব্যাপারটা দেখতে দেখতে এমন ঘনিয়ে উঠল যে, ওরা পরস্পরকে যেন আর তিলার্দ্ধও সহ্য করতে পারছিলেন না।

পুরুষদের এমনিতর অবস্থাভেদ হয় ত মেয়েদের চোখেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে বেশী। ব্রততী দেখেও দেখে নি; ক্ষমা করবার মত ধৈর্য তখন ছিল না ব'লেই সে আগাগোড়া উপেক্ষা ক'রে যাচ্ছিল। কিন্তু আর-সকলে উত্তাপটা যেন ঠিক স'য়ে নিতে পারছিল না। কৌতুক অনুভব করছিল একমাত্র মুরলা। তার ধাতটা আগাগোড়াই স্বতন্ত্র। মেয়ে হলেও, মুরলা বাঙালী মেয়েদের বাইরে। নাচের দোলার সঙ্গে সাগরপারের ঢেউ রক্তে মিশে, জীবনের সুরটা এমন উঁচু পর্দায় উঠে পড়েছে যে, নিজের বাইরে পৃথিবীর অন্য কিছু উপলব্ধি করবার মত মনের অবস্থা তার খুব কমই থাকে। যখন থাকে, তখন মন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া নিয়ে নতুনতর নাচের ছন্দে দুলতে চায়।

নানা আলোচনার ভিড়েও মিসেস্ গুপ্তা এতক্ষণ লক্ষ্য করছিলেন সেই ডাট্-স্যানিয়ালী। দত্ত সাহেব তখন প্রায় নির্বাক; মিস্টার স্যানিয়াল মাঝে মাঝে তবুও যোগ দিচ্ছিলেন চলতি আলোচনায়। হঠাৎ কি ভেবে দেবশঙ্করের পত্নী সাধনা দেবীকে উদ্দেশ ক'রে মিসেস্ গুপ্তা ব'লে উঠলেন—'মেয়েদের নাচ দেখে যাঁরা প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠেন, আপনি কি বলতে চান—তাঁরা সকলেই বোঝেন সত্যিকারের আর্ট?'

'—আর্ট বোঝেন কি-না, জানি না। তবে একটা কিছু যে নিশ্চয়ই

বোঝেন, সে কথা অস্বীকার করা চলে না। নইলে, প্রশংসায় অমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবার কোন মানে হয় না।'—জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে দেবশঙ্করের মুখপানে চেয়ে সাধনা দেবী মৃদু একটু হাসলেন।

সহাস্যে মাথা দুলিয়ে দেবশঙ্কর আরও একটু জোরের সঙ্গে ব'লে উঠলেন—'নিশ্চয়ই।'

ওদের আলোচনার ভিতর হঠাৎ কি নিয়ে যে এই সাইড-টকএর সূচনা হ'ল, দেবশঙ্কর সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। কিছুক্ষণ আগে মিস্টার দত্ত আর্টের কথা নিয়েই লম্বা-চওড়া সার্মন্ দিয়েছেন। তখন এঁরা সবাই ছিলেন নির্বাক্, উর্ধ্বশ্বাসে গিলে গেছেন ওঁর শার্লেতানি লেক্‌চারগুলো।

মিসেস্ গুপ্তা বেশ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে বললেন—'মানে ত হয়ই একটা। আর, মানে হয় ব'লেই অব্যয়ের মত বেশ চলে যাচ্ছে। প্রয়োগের হাঙ্গামা নেই।'

দত্তসাহেব একটু সজাগ হয়ে বসলেন। সাধনা দেবী মিসেস্ গুপ্তার কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে হতভম্বের মত মুখপানে চেয়ে রইলেন।

দত্তসাহেবের দিকে চেয়ারখানা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে মিসেস্ গুপ্তা চাপা হাসির সঙ্গে বলেন—'মানেটা যদি আর্ট হিসাবেই ধরা যায়, তা হলে সেই আর্ট ষোল আনা নির্ভর করে আর্টিস্টের রূপ আর প্রস্‌পেক্টের উপর।'

এবার সাধনা ও দেবশঙ্কর উভয়েই হো হো ক'রে হেসে উঠলেন—'প্রস্‌পেক্ট! আর্টিস্টের রূপ আর তার প্রস্‌পেক্ট? প্রস্‌পেক্টটা কিসের শুনি! আরও বড় ডাক্তার হবার?'

ব্রততী ইচ্ছে ক'রেই মুরলার সঙ্গে অন্য কথায় জড়িয়ে রইল।

ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত কতদূর গড়াবে সেটা অনুমান করতে তার মোটেই বিলম্ব হ'ল না।

মিসেস্ গুপ্তা বেশ শ্লেষের সঙ্গে বললেন—'বড় ডাক্তার হবার নয় মশায়, দর্শকের তথা স্তাবকের ভবিষ্যৎ জীবনকে ফুলে ফলে সমুজ্জ্বল ক'রে তুলবার।'

'তার মানে?'—দত্তসাহেব আরও একটু উদ্‌গ্রীব হয়ে নড়ে চড়ে বসলেন।

মিসেস্ গুপ্তা বলেন—'এই যে ব্রততীর অজন্তা নৃত্য—যা নিয়ে মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরাই মাতামাতি করল অত বেশী, তার মূল চার্ম কি ওই আর্ট? মোটেই নয়; ওর রূপ, ঐশ্বর্য আর সেই সঙ্গে অপর পক্ষ থেকে ওকে মুগ্ধ করবার সতর্ক প্রয়াস। নইলে, ওর যে দুটো নাচ সত্যি খারাপ হয়েছিল, খারাপ না হলেও অন্তত ভাল হয় নি, সেই দুটো নাচেরও ভূয়সী প্রশংসায় অনেকে মাতাল হয়ে উঠেছিলেন। সে মাতলামি আর্টের নেশায় নয়, প্রসাদের লোভে! পেটুক ছেলেরা চোখের সাম্‌নে রাজভোগ বা ওই রকম হাত-ভরা সাইজের কোন সন্দেশ দেখলে যেমন লোলুপ হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি। উদগ্র কামনার চঞ্চলতায় দর্শকদের সর্বাঙ্গ লোলুপ হয়ে ওঠে, মেয়েদের অর্ধ-উলঙ্গ দেহ-পেশির স্পন্দন দেখে। তারই মানে আর্ট?'

মিস্টার স্তানিয়াল হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন—'এক্‌জাক্টলি সো! আপনার উপমাটা আরও পরিষ্কার ক'রে বলতে হ'লে বলা যেতে পারে যে, মনিবের হাতে মাংসের টুক্‌রো দেখলে আদুরে কুকুরের যে অবস্থা হয়, প্রস্‌পেক্‌টিভ চেনা মেয়ের লাস্য দেখে, স্তাবকদের অবস্থাও হয় ঠিক তেমনি।'

মিস্টার ডাট্ প্রবল আপত্তি জানিয়ে বললেন—'দ্যাট'স্ ভাল্গার্, এণ্ড মাস্ট বি উইথ্ড্রন্।'

'কখ্খন নয়। দ্যাট'স্ ফ্যাক্ট! য়্যাণ্ড মাস্ট বি য়্যাডমিটেড।'—মিঃ স্যানিয়াল মিসেস্ গুপ্তার মুখপানে চেয়ে তাঁর মতামতের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিন্তু দত্তসাহেব ততক্ষণে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন। কথাগুলো যে ওঁকে উদ্দেশ করেই বলা হ'ল, সেটা বুঝতে তাঁর বাকী রইল না। তিনি রাগে ফুলে ফুলে ওঠেন—'দ্যাট'স্ মোস্ট আন্কাল্চার্ড। আই উড সার্টেন্লি লাইক্ টু—'

ওঁর কথা শেষ না হতেই ডক্টর ব্যানার্জী, দেবশঙ্কর ও সাধনা দেবী একসঙ্গে হেসে উঠলেন। সে হাসি যেন থামতে চায় না।

এবার দত্তসাহেব ঘুষি পাকাবার উপক্রম করলেন। মিস্টার স্যানিয়ালের চোখে মুখে কেমন একটা প্রসন্নতা।

ওঁদের অবস্থা দেখে সকলেই বোধ হয় একটু শঙ্কিত হ'য়ে উঠেছিলেন। ব্রততীকে উপলক্ষ্য ক'রে দুজনের মনে যে ঈর্ষার বিষ সঞ্চিত হয়েছিল, সেটা আজ জ্বলে উঠবার উপক্রম হ'ল আপনা-আপনি।

ব্রততী অনেক দিন থেকেই হাঁপিয়ে উঠেছিল এই পরিস্থিতির চাপে। তার উপর ডাট্-স্যানিয়ালী ব্যাপারে মনটা আরও তিক্ত হয়ে উঠল।

দেখতে দেখতে ব্রততীর মুখখানা যেন কেমন কঠিন হয়ে ওঠে। কোন কথা না ব'লে সে ঝড়ের মত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ব্রততীর এই আকস্মিক রুদ্রতায় সকলেই হঠাৎ কেমন থতমত খেয়ে গেলেন।

তার চেহারা দেখে কোন কথা বলবার সাহস তাঁদের হ'ল না। সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেন।

মুহূর্ত পরেই ব্রততী আবার কি ভেবে ফিরে এলো তেমনি উগ্র ভৈরবীমূর্তিতে। কিন্তু এবার আর কারো দিকে দৃক্‌পাত না ক'রে মুরলার কাছে বিদায় চেয়ে বলল—'কিছু মনে ক'রো না নন্দী, শরীরটা আমার ভাল নেই আজ। তোমরা গল্প সল্প কর, আমি বরং একটু—'

তারপর দেবশঙ্করের দিকে ফিরে জানাল, 'আজ থেকে এক মাসের ছুটি দিতে হবে মাস্টার-মশায়, একটু রেস্ট নেবো। এ ক'দিন আর নতুন কোন ফিগার শিখব না।'

—কারো উত্তরের কোন অপেক্ষা না রেখে, ব্রততী শক্ত শক্ত পা ফেলে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মুরলা ডাক দিয়েও আর কোন উত্তর পেল না। ওরা জানে, খেয়াল ওর বরাবরই অমনি প্রখর।

দেবশঙ্করবাবু ও সাধনা দেবী হাসতে হাসতে উঠে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে মুরলা, ডক্টর ব্যানার্জী এবং মিসেস্ গুপ্তাও বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। ডাট্‌-স্তানিয়ালী সংগ্রামের রেশ তখনো পূর্ণমাত্রায় বাতাসটা ভারী ক'রে রেখেছে।

ব্রততী অস্থিরভাবে পড়ার ঘরে পায়চারি করে। মনে একটুও স্বস্তি নেই। প্রসঙ্গটা ভুলবার জন্যে অকারণ আলমারি থেকে বইগুলো টেনে টেনে পাতা উল্টায়। জীবনের পর্দাগুলো যেন হঠাৎ কেমন বেসুরো ও খাপছাড়া হয়ে পড়েছে।

দরজা বন্ধ। বাইরে থেকে কে কড়াটায় মৃদু আঘাত করে। ব্রততী একবার ভাবল, খুলবে না। হয়ত আবার ওরা এসেছে পিছু পিছু ছুটে।

ওর নিষ্কৃতি নেই ; তিলার্দ্ধের জন্যেও মুক্তি নেই ওদের ক্ষুধাতুর কবল থেকে। ওরাই একটু একটু ক'রে জ্বালিয়ে দেবে তূষের আগুন—ওর সারা জীবন ধিকি ধিকি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ভাবতে ব্রততীর শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে।

কি ভেবে জিজ্ঞেস করল—'কে ?'

'আমি, মোতি।'

ব্রততী বাঁচল ; হাঁপ ছেড়ে বাঁচল—'মোতি-দা ?'

—তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে একমুখ হেসে সে মোতির সাম্‌নে এসে দাঁড়াল, একেবারে তার বুকের কাছে। নিতান্ত অপ্রত্যাশিত! মোতি-দা যে হঠাৎ এসে উপস্থিত হবে আজ, তা ও ভাবতেও পারে নি।—'কখন এলে তুমি মোতি-দা ?'

'সকালের গাড়ীতে। তোমাদের তখন ইস্কুল বসেছিল ও ঘরে, তাই দেখা করিনি। নইলে—'

'তা বেশ করেছ। ইস্কুলই বটে ; যাক্, তোমার দেশের খবর সব ভাল ত মোতি-দা ?'—ব্রততী স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে মোতির মুখ-পানে। মনটা নিশ্চিন্ততায় ভরে ওঠে।

'ভালই আছে দিদি। ওদের আবার ভালমন্দ! যাক্, সে কথা পরে বলব'খন। নীচে কে একজন বৈরাগী এয়েছে দিদি, তোমায় গান শোনাতে—' মোতি দুপা এগিয়ে আবার ফিরে দাঁড়াল ওর উত্তরের অপেক্ষায়।

'বৈরাগী! হাঁ, বৈরাগী—দীনু বৈরাগী। ও বেশ গান গায় মোতি-দা, খুব ভাল লাগে আমার। একটু বসতে বল, আমি যাচ্ছি কাপড়টা বদলে।'—ব্রততী তাড়াতাড়ি চ'লে গেল নিজের ঘরে।

মুমূর্ষু পৃথিবী

অনেকদিন পর আজ হঠাৎ মোতি-দাকে দেখে ব্রততীর মনটা যেন নিমেষে হাল্‌কা হয়ে গেল। অস্বস্তির গুরুভার এতক্ষণ পাষাণের মত চেপে বসেছিল ওর বুকে; শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল।

মোতি ওদের বাড়ীর পুরনো চাকর। চাকর বললে হয় ত অন্যায়ই হয়। ওই মোতি ছেলেবেলা থেকে ব্রততীকে মানুষ করেছে বুকে ক'রে। ওর মা তখন বেঁচে ছিল।

অনাবশ্যক সজ্জার আড়ম্বর যেন ব্রততীর ভাল লাগছিল না। দামী শাড়ি, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আজ সত্যি ওকে পীড়া দিচ্ছিল। পোষাকী সভ্যতার নাগপাশে রাত্রিদিন নিজেকে বেঁধে রাখতে চায় না সে। মনে হয়, যেন বন্দী হয়ে আছে প্রাচুর্যের অন্দর মহলে।

নিতান্ত সাধারণ একটা ব্লাউস ও সূতি একখানা শাড়ি পরে' ব্রততী সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, এমন সময় হঠাৎ দেখা মুরলার সঙ্গে—তার পিছনে লীলা হালদার। মুরলা অবাক্ হয়ে চায়। মুহূর্তে ব্রততীর সর্বাঙ্গে, ওর চোখে মুখে যে পরিবর্ত্তন ফুটে উঠেছে, সেটা যে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল—মুরলা কল্পনা করতেও পারে না। এই কিছুক্ষণ আগে সে ব্রততীকে দেখেছে কালবৈশাখীর আসন্ন ঝড়ের মূর্তিতে।

ব্রততী একটু অপ্রতিভ হয়ে বলে—'তুমি কি এতক্ষণ একাই বসে-ছিলে নন্দী ?'

'না।'—মুরলা মৃদু হাসির সঙ্গে উত্তর দেয়—'রাস্তায় মিস্ হালদারের সঙ্গে দেখা। কিছুতেই ছাড়লেন না; তাই ফিরতে হ'ল আবার।'

'ধন্যবাদ! শুধু ধন্যবাদ নয়, তার চেয়েও বেশী কিছু। মিস্ হালদার যে দয়া ক'রে এতদূর এসেছেন, সেটা আমার সৌভাগ্য। কি বল মুরলা?'—প্রসন্ন হাসির সঙ্গে ব্রততী অভিবাদন করল লীলা হালদারের দিকে চেয়ে।

মুরলা সহাস্যে বলে—'নিশ্চয়ই। মিস্ হালদার যুগান্তর এনেছেন বাংলা দেশে। ওঁর আগে কোন মেয়েই সাহস করে নি ফিল্‌মে নামতে। উনিই পাইওনিয়ার—'

'পাইওনিয়ার নয়, মার্টার বলুন।'—ব'লে মিস্ হালদার হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন।

মিস্ হালদারের হাত ধ'রে মৃদু একটা ঝাঁকানি দিয়ে ব্রততী ওদের নিয়ে নীচে এলো—'চলুন একটু গান শোনাই, কেমন?'

'গান!'—মুরলা হতভম্ব হয়ে চায় ওর মুখপানে। একটু আগে যে ব্রততীকে দেখেছে উগ্রভৈরবীর মত সব কিছু ওলটপালট ক'রে দিতে, এখন তার মুখে গান শোনাবার প্রস্তাব যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না সে।

ওরা যখন নীচে নেমে এলো। দীনু তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছে চলে' যাবার চেষ্টায়। ভয়ে ভয়ে ব্রততীর মুখপানে চেয়ে বলে—'আজ যাই তা হলে; আর-একদিন আসব?'

'না। তোমার গান শোনাব ব'লে ধরে' আনলুম ওদের।'—লীলা ও মুরলার হাত ধরে ব্রততী জোর ক'রে বসাল।

ওদের কাছে ব্রততীর জীবনের যেন এটা সম্পূর্ণ অজানা এক দিক। মুরলা কোন দিন ভাবতেও পারে নি যে, বাড়ীতে ভিকিরী ডেকে

এমনি ক'রে গান শুনবার অদ্ভুত খেয়াল অন্তত ব্রততীর মত মেয়ের থাকতে পারে।

দীনু মাথা চুলকিয়ে একটু ইতস্তত করে বলে—'বড্ড দেরী হয়ে গেল। বেলা হয়েছে অনেক। পাঁচ-বাড়ী ফিরলে, তবে দিন চলবার উপায় হবে। আজ আর—'

'আজ আর না-হয় পাঁচ-বাড়ী না-ই ফিরলে। এইখানেই দেব সেটা পুষিয়ে—' ব্রততী আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না রেখে ব'সে পড়ল।

মিস্ হালদার মুরলার পিঠে হাত দিয়ে চটুল হাসিতে সারা গা দুলিয়ে ব্রততীর দিকে চেয়ে বলে—"লাকী বেগার!"

মুরলা কথাটা এড়িয়ে যেতে চায়; তার সাহস হয় না আজ আর ব্রততীকে নিয়ে কোন টিপ্পনী কাটতে। ওর তখনকার সেই চেহারাটা সে এখনও ভুলতে পারে নি।

দীনুকে ইতস্তত করতে দেখে ব্রততী আবার বলে—'ওঁদের দেখে কি তোমার সংকোচ হচ্ছে দীনু?'

'সংকোচ! ভিকিরীর আবার সংকোচ?'—আপন মনে বলতে বলতে দীনু মেঝেয় ব'সে একতারায় সুর ধরল।

ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বাংলার পল্লীগান; হিন্দী ঠুংরির আমেজ নেই, উর্দ্দু গজলের ভাঁজ নেই, মোৎসার্টের ছোঁয়াচ লাগে নি, বিঠোফেনের চার্ম নেই, তবু কত সুন্দর! কত সহজে ছুঁয়ে যায় মনের প্রত্যেকটী তার!

মুরলা কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনুর মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—'তোমায় কোথায় দেখেছি বল তো?'

দীনু হঠাৎ শিউরে উঠল। পরক্ষণেই নিজেকে সহজ ক'রে নিয়ে বলে—'পথে কিংবা এমনি কারো বাড়ীতে।'

'তা হবে; খুব চেনা মুখ! কিন্তু তোমার গান কোনদিন শুনেছি ব'লে ত মনে হয় না।'—মুরলার চোখে একটা তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা! দীনুর কেমন ভয় করে। হেঁট মুখে একতারা বাঁধতে বাঁধতে বলে—'আজ্ঞে না।'

কিন্তু তার সম্বন্ধে মুরলার কৌতূহল যেন সহজে মিটতে চায় না; ধারাল দৃষ্টিতে আপাদমস্তক চেয়ে দেখে।

মিস্ হালদার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে একটা টাকা বের ক'রে দীনুর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—'ফিল্‌মে গেলে তোমার উন্নতি হ'ত।'

দীনু হাসে, অত্যন্ত ম্লান ফিকে একটু হাসি—মৃতের হাসির মত প্রাণহীন।

ব্রততী মিস্ হালদারের দিকে চেয়ে বলে—'টাকা ও নেবে না। এক পয়সার বেশী নেয় না।'

'তার মানে?'—মিস্ হালদার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

ব্রততী মৃদুকণ্ঠে বলে—'ও বলতে চায়, সেইটাই ওর ন্যায্য পাওনা।'

মুরলা হেসে উঠল—'আই সি,—ডিগ্‌নিটি আছে।'

লীলা হালদারও সে হাসিতে যোগ দিয়ে কেটে কেটে বলে—'দ্যাট্'স এ নভেল ওয়ে অব মনোপোলাইজিং।'

ওদের আচরণে ব্রততী ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে মুখ-ফুটে কিছু বলতে পারে না।

মুরলা আবার যখন বলল—'রেস্‌পেক্টেবল্ বেগার', ব্রততী

অনুনয়ের সঙ্গে জানাল—'কারুকে অমন খোঁচা দিয়ে কোন কথা না বলাই ভাল, বিশেষত তার সামনে—' ব্রততী অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল।

দীনু নির্বিকার ভাবে ব'লে উঠল—'আপনি ব্যস্ত হবেন না। ভিক্ষে করা যাদের পেশা, তাদের গায়ের চামড়া গণ্ডারের চামড়ার চেয়েও শক্ত।'

লীলা ও মুরলা দুজনেই অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। কথাটা উল্টে দেবার উদ্দেশ্যে লীলা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে—'তোমার নামটা বল তো—আর ঠিকানা! আই'ল্ ট্রাই'।

সত্যেন হাতজোড় ক'রে বলে—'নাম? আমার নাম দীনবন্ধু। আর ঠিকানা?—ভিকিরীর ঠিকানা কি দেবো বলুন? পথে পথে ঘুরে বেড়াই, পথই সব।'

দীনবন্ধু টাকাটি নিতে কোনমতেই সম্মত হ'ল না। ব্রততী ও মিস্ হালদার অনুরোধ করলে ও বলে—'পৃথিবীতে আমার মত ভিকিরীর অভাব নেই; আমার চেয়েও কাঙাল—অসহায় মুলো কত কেঁদে বেড়াচ্ছে আপনাদেরই ফটকের সামনে। টাকাটা ভাঙিয়ে এক পয়সা ক'রে দিলে চৌষট্টি জন মানুষ একবেলা মুড়ি খেয়ে বাঁচবে।'

মিস্ হালদারের দেওয়া টাকাটি মেঝের উপরেই পড়ে রইল। দীন-বন্ধু ব্রততীর কাছে পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেল। ব্রততী, লীলা ও মুরলা অবাক্ হয়ে চেয়ে ছিল, হয় ত ভাবছিল ওরই কথা। মুরলার মনে একটা ক্ষুব্ধ আক্রোশ আস্ফালন ক'রে ওঠে; ভিকিরীর এত স্পর্দ্ধা সে যেন বরদাস্ত করতে পারে না। ব্রততীকে উদ্দেশ ক'রে বলে—

'ছোট-লোকদের অত আস্কারা দিয়ে মাথায় তুলতে নেই। ভিকিরীর আবার বড়-মানুষী!'

ব্রততী হেসে বলে—'সত্যিকারের মানুষকে আমরা ভুলে গেছি, তাই হঠাৎ মানুষ দেখলে আমাদের মেজাজ কেমন বিগড়ে যায়।'

মুরলা রাগান্বিত স্বরে ব'লে ওঠে—'এই আবর্জনাগুলোকেও তুমি মানুষ বলতে চাও?'

হাঁ; অন্তত আমাদের চেয়ে। পোড় খেয়ে খেয়ে বাইরের খোলসটা ওদের নষ্ট হয়ে গেছে। পালিশের চটকে চোখ ঝলসে দেয় না।'

মুরলা যেন আরও উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল ব্রততীর কথায়; যথেষ্ট ঝাঁঝের সঙ্গে সে প্রতিবাদ জানিয়ে বলে—'ওটা তোমার মনের কথা নয়। যাদের তুমি সহ্য করতে পার না, তাদের নিক্তিতে সকলকে ওজন করতে চাও কেন? ওরাও যদি মানুষ হয়, তা হলে—'

মুরলার কথা শেষ না হতেই ব্রততী বাধা দিয়ে বলে 'থামো। চোখের জল ফেলে যারা কাঁদতে জানে, তাদের হাসি মুখস্থ করা নয়।'

বিতর্ক ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠবে বুঝে, মিস্ হালদার প্রসঙ্গটা চাপা দেবার উদ্দেশ্যে বললেন—'চলুন মিস্ রয়, আপনার পড়ার ঘরে গিয়ে একটু বসি। স্যার সি. কে. বোধ হয় বেরিয়েছেন?'

'হাঁ। চলুন।'—ব'লে ব্রততী দু'জনকেই সঙ্গে নিয়ে উপরে চলে গেল।

রাস্তায় এসে দীনু একবার ওদের কথা ভাবে। ওদের ঐশ্বর্য

দেখে সে ঈর্ষা করে না, কিন্তু সংসর্গ ওকে অতীতের মাঝখানে টেনে নিয়ে ব্যথিত ক'রে তোলে। মুরলার ডান্স সে দেখেছে এম্পায়ারে। ভাগ্যিস্ মুরলা কথায় কথায় বেশী দূর এগিয়ে পড়ে নি!

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে, আবার গিয়ে দাঁড়ায় পাশের বাড়ীর দরজায়। একতারাটায় কয়েকবার শব্দ করতেই দরজা খুলে ছোট্ট একটী মেয়ে বেরিয়ে এসে বলে—'বাড়ীতে অসুখ।'

মনে এতটুকুও আঘাত লাগে না। এমনি নৈরাশ্য, এমনি উপেক্ষা যেন রক্তে রক্তে সয়ে গেছে। দ্বিরুক্তি না ক'রে দীনু আনমনে এগিয়ে চলে অন্য বাড়ীর দিকে। গৃহস্থকে আগমন জানাবার জন্যে আবার তেমনি ক'রে ঝংকার তোলে। কিন্তু এবারে শিশু নয়, বিরক্তির সঙ্গে গজ গজ করতে করতে একটী প্রৌঢ়া বিধবা দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলেন—'বাপরে! মুখপোড়া ভিকিরীদের জ্বালায় বাড়ীতে তিষ্ঠনো দায়।'—তারপর কি ভেবে, কণ্ঠস্বরটা একটু ছোট ক'রে জানিয়ে দেন—'হাত বন্ধ, ফিরতে হবে।'

দীনু তেমনি অম্লান, নির্বিকার। কিন্তু আর ইচ্ছা করে না সামনের বাড়ীর দিকে যেতে। মাথার উপর সূর্য প্রচণ্ড হ'য়ে উঠেছে। গায়ের চামড়ায় প্রখর-রৌদ্রের তীব্র স্পর্শ লাগে। মনে হয়, ফাট ধরবে এবার সারা গায়ে।

মুরলা ও মিস্ হালদার একখানা ফিটনে ক'রে এইমাত্র গেল ওর পাশ দিয়ে। ওদের চোখে কেমন একটা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি! দীনু বিব্রত হয়ে পড়ে।

সকাল থেকেই মনটা আজ বিশ্রী হয়ে ছিল। তার উপর ব্রততীর বাড়ীতে যে অতীত-দিনের-ছোঁয়া লাগল তাতে ওর সারা মন যেন হঠাৎ বানচাল হয়ে পড়ল। সেই ভোর থেকে বাড়ী বাড়ী ঘুরে এগারোটি পয়সা পেয়েছে আজ। ছ'পয়সা ঘরভাড়া দিয়ে, মাত্র পাঁচটি পয়সা হাতে থাকবে। প্রতিদিন পাড়ায় পাড়ায় বেড়িয়ে যে কয়টি পয়সা রোজগার করে, তার পাইপয়সাটি পর্য্যন্ত তুলে দেয় অতসীর হাতে। দরজার পাশে অতসী ছোট্ট একটা উনুন পেতেছে। দিনান্তে একবার ফুটিয়ে নেয় তিন জনের মত চাল; তার সঙ্গে কোনদিন থাকে একটা বেগুন পোড়া, কোন দিন বা দুটো আলুভাতে।

আজ আর সত্যেনের ইচ্ছা করে না বস্তিতে ফিরতে। অতসীও হয় ত সারাদিনে পাঁচ-ছ' পয়সার বেশী পায় নি; সেই সঙ্গে, খুব বেশী হলে হয় ত পেয়েছে সেরখানেক পাঁচ-মিশালী চাল। ওই অন্ধ বুড়ো বাপকে টেনে টেনে নিয়ে কতদূরই বা চলতে পারে সে!

—বড় রাস্তার পাশে, সরকারী বাগানটার রেলিং-এ ঠেস দিয়ে সত্যেন অবসন্নভাবে বসে পড়ে। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। গাছের ছায়ায় ঝাঁকা-গুলোর উপর মাথা রেখে অকাতরে ঘুমচ্ছে এক দল দিনমজুর। যুদ্ধশ্রান্ত পদাতিকের মত যে-যার আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে চলমান পৃথিবীর নিরালা কোণে।

এবার একজন-দুজন ক'রে ভিকিরী এসে ফুটপাথে জমে। বাগানের ওই কোণে, বড় মেহগ্নি গাছটার ডালপালাগুলো যেখানে নুইয়ে পড়েছে পথের দিকে, চার-পাঁচজন কুষ্টরোগী এসে ছেঁড়া নেকড়ার পুঁটলিগুলো একে একে নামিয়ে ক্লান্তভাবে ব'সে পড়ল। সত্যেন

স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে। এক-টোকা রুক্ষ চুল মাথায় যে মেয়েটা এতক্ষণ তেলচিট-ধরা ময়লা কাপড়খানা আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্ছিল ফুটপাথে শুয়ে, ওদের সাড়া পেয়ে সে চোখ মুছতে মুছতে গুটিশুটি উঠে বসল। মেয়েটার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। কতকালের সঞ্চিত ময়লা চামড়াটাকে যেন ঢেকে ফেলেছে; গায়ের রঙ কোন দিন ফর্সা ছিল কি-না, সেটাও আজ ভাববার বিষয়। পরনের কাপড়খানা দিয়ে কায়ক্লেশে কোমর পর্যন্ত ঢেকে রেখেছে; অন্য কাপড়খানা গায়ে জড়িয়ে শীতার্ত রোগীর মত ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপে। হয় ত জ্বর হয়েছে, জলন্ত রৌদ্রে সারাদিন ফুটপাথে পড়ে থেকে এইবার ধরেছে সন্ধ্যার কাঁপুনি।

ওদের ঝোলাগুলো একে একে নিয়ে মেয়েটা ঢালে তার আঁচলে। আধসের-তিনপো চাল আর কয়েকটি ক'রে আধলা, দুটি কি একটি পয়সা! সকাল থেকে সারা দুপুর উত্তপ্ত ফুটপাথে ব'সে, না-হয় আগুনের হল্‌কার মত সেই প্রখর রৌদ্রের ঝলাসে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে, এর বেশী একটী পয়সাও রোজগার করতে পারে নি ওরা, পারেও না। ওদের কান্না শুনে শুনে মানুষের হৃৎপিণ্ডে কড়া পড়ে গেছে।

রেলিঙের গায়ে কালিমাখা যে মাটির হাঁড়িটা টাঙানো ছিল, সেটা ওদের। পাশেই ভাঙা ইটের একটা উনুন। মেয়েটি একবার এদিক-ওদিক চেয়ে গা-মোড়া দিয়ে উঠল। ফুটপাথের লোহার চৌবাচ্চা থেকে এক হাঁড়ি জল ভর্তি ক'রে এনে বসিয়ে দিল সেই উনুনের উপর।

দেখতে দেখতে সত্যেনের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। ওই জল! গোরু-ঘোড়ার জন্যে রাস্তার পাশে যে লোহার চৌবাচ্চা, তারই পচা জল ওরা খায়—তাই দিয়ে হয় ওদের রান্না! শরীরটা কেমন শির্‌শির্

করে; ভাবতে মাথার মধ্যে আবার তেমনি ঝিমঝিম ক'রে ওঠে। মনে ভেসে ওঠে—দিনের পর দিন যে সব ক্ষুধার্ত মানুষের বীভৎস ছবি সে তিন মাস ধ'রে দেখেছে।

এঁটো পাতা আর ছেঁড়া কাগজগুলো কুড়িয়ে এনে মেয়েটা উনুনে জ্বাল দেয়। কখনো বা হেঁটমুখে মাটিতে বুক দিয়ে ফুঁ দেয়, নিবন্ত আগুনটাকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করে। ফুঁ দিতে দিতে চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল হয়ে ওঠে। চোখ ছাপিয়ে জল আসে; বারবার আঁচল দিয়ে সে মোছে। চেয়ে থাকতে থাকতে সত্যেনের চোখেও কখন নেমে আসে একটু তন্দ্রা। মুহূর্তে মনটা সরে যায় ব্যথিত ধরিত্রীর সীমানার বাইরে।

তন্দ্রা টুটে যায়।—ওদের রান্না হয়ে গেছে। মেয়েটা তার গায়ের কাপড়খানা খুলে পাট ক'রে মাটিতে পেতেছে। এখন আর লজ্জা নেই ওর; গরম ভাতের গন্ধে সমস্ত সত্তা যেন মাতাল হয়ে উঠেছে। ওর নারীত্ব, জন্মগত শালীনতা-বোধ—সব যেন মূর্ছিত হয়ে পড়েছে ভাতের গন্ধে। কাপড়ে ভাতগুলো ঢেলে, এপাশ ওপাশ ক'রে ছড়িয়ে দেয় একখানা কাঠি দিয়ে। আপনা-আপনি জুড়োবার দেরীটুকুও যেন সইছে না।

মেয়েটি আর সেই পাঁচজন কুঠে ভিকিরী—সবাই মিলে একসঙ্গে বসল ভাতগুলো ঘিরে। শুধু ভাত, আগুনের মত গরম কতকগুলো ভাত আর খানিকটা নুন।—গোগ্রাসে গিলছে!

সত্যেনের চোখ দুটো নির্বাক্-বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। ও ঝুঁকে পড়ে' দেখে—ভিকিরীগুলোর সর্বাঙ্গে দগদগে ঘা; হাত-পায়ের আঙুলগুলো প'চে প'চে খুলে গেছে! ওদের দিকে চেয়ে থাকতে

থাকতে সারা দেহ অবশ হ'য়ে আসে। ও আর সইতে পারে না। ইচ্ছা করে, মেয়েটাকে জোর ক'রে তুলে আনে ওদের কাছ থেকে। কিন্তু পারে না। তখন আর হাত-পা নড়াবার শক্তিও যেন নেই ওর। মাথার মধ্যে কেমন যন্ত্রণা হয়, বুকের ভিতরটা হাহাকার ক'রে ওঠে।

ওর পাশে এসে ব'সল একজন চেনা ভিকিরী; পথের আলাপ। হাতে একটা বেহালা; মাথায় একরাশ চুল। কাপড়খানা গিরিমাটিতে রঙিয়েছে, কিন্তু দেহটাকে অমনি রঙ বদ্‌লে মানুষের মত ক'রে তুলতে পারে নি।

লোকটা ক্ষীণ হেসে ওকে অভিবাদন করে। সত্যেনও একবার হাসে তার মুখপানে চেয়ে। বুঝতে দেরী হয় না; চেহারা দেখে বেশ বোঝা যায় তার অতীত জীবনটা। মুখে চোখে তখনও লেগে আছে প্রাক্তন জগতের ছাপ।

তার দিকে চেয়ে যেন সত্যেনের হঠাৎ মনে হ'ল, ও নিজেও ভিকিরী। সত্যেন সেন,—দীনু এখন ভিকিরী?—ভিক্ষে করে, সত্যি করে ভিক্ষে লোকের দরজায় দরজায়! কিন্তু কেন? হাত দুটো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে; এখনও পেশীগুলো বেশ সবল আছে। ওর মাংসে, শিরায়, ধমনীতে এখনও বইছে রক্তের স্রোত। ভাবতে ভাবতে মনটা গ্লানিতে ভরে ওঠে; সর্বাঙ্গ রী-রী করে ধিকারে। ভিকিরী? ভিকিরী ও? ওদেরই মত অমনি পথভিকিরী? ওই কুঠে লোকগুলোর মত! ওই—

দীনুর সমস্ত সংবিৎ যেন হঠাৎ কেমন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

একবার মনে হল অতসীর কথা। অতসীর শরীর আজ ভাল ছিল না। হয় ত এতক্ষণে ফিরেছে ভিক্ষে ক'রে; মাথায় নেকড়ার পটি বেঁধে উনুনে ফুঁ দিচ্ছে। চোখ দুটো লাল হয়ে উঠেছে আগুনের তাতে।

তা হোক। অতসীকে সে আর কিছুতেই ক'রবে না ক্ষমা। ওই অতসী, তার ওই ভীরু কাতর দৃষ্টিই করেছে ওকে ভিকিরী।—একতারাটা তুলে ধ'রে সত্যেন মুহূর্তে কি ভেবে নিয়ে জোরে বাড়ি মারল ফুথপাথের পাথরে; জীর্ণ যন্ত্রটা ভেঙে চুরমার হ'য়ে ছড়িয়ে পড়ল রাস্তায়!

ভিক্ষে আর ক'রবে না ও। আর ফিরবে না অতসীদের বস্তিতে। ট্যাঁক থেকে পয়সাগুলো বের ক'রে ছুঁড়ে দিল সেই কুঠে ভিকিরীগুলোর দিকে। পাশের লোকটা হতভম্বের মত চেয়ে রইল ওর মুখপানে। সত্যেন তাকে একটী কথাও না ব'লে হন্‌হন্‌ ক'রে চলল অন্য দিকের ফুটপাথ ধ'রে।

অতসীর শরীরটা সত্যি অসুস্থ। তবু মাথায় পটি বেঁধে উনুনে ফুঁ দিতে হয়। ভিজে খড়-কুটো: একগুণ জ্বলে ত দশগুণ জ্বালায় তীব্র ধোঁয়ার প্রাচুর্যে। চোখ লাল হয়ে ওঠে, কপালের শিরাদুটো দপ দপ করে। মনে হয়, হঠাৎ কখন ছিঁড়ে যাবে বুঝি।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। ঘরের ভিতরে একলাটি অন্ধকারে ব'সে উপেন গুন্‌গুন্‌ সুরে গান করে; গান ঠিক নয়, একটা করুণ আবৃত্তি। অতীত জীবনের শবদেহ নিয়ে আপন মনে করে তার পোস্ট্-মর্‌টেম। গায়ের রুক্ষ চামড়ায় মাঝে মাঝে বাতাসের যে স্পর্শ

লাগে, তাতে কখন কখন মনে হয় বাইরের জগতে বুঝি নেমেছে এবার রাত্রের ঘন অন্ধকার; বাতাসের চেয়ে নিজের নিশ্বাসই যেন উষ্ণতর হয়ে উঠেছে।

ভাত হয়ে এলো। কিন্তু দীনু তখনও ফিরল না দেখে অতসী ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কখন সূর্য ডুবে গেছে, তবুও ফিরল না। এত দেরী তো কোন দিন হয় না ওর। বুঝি বা সাধ্‌তে সাধ্‌তে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছে আজ! না-হয়,...বাকীটুকু ভাবতে মনটা কেমন পাক খেয়ে যায়। ভাবতে পারে না। হয় ত সেদিনের মত মাথা ঘুরে প'ড়ে গেছে রাস্তার পাথরে; কপাল কেটে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। অতসীর বুকের ভিতর ঢিপ ঢিপ ক'রে ওঠে। ভাতের ফেনটুকু ভালভাবে ঝরানোও হয় না। আনমনে গলিটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কখন ভুলে যায় ভাতের কথা।

অন্য দিন এইটুকু সময়ের ভিতরেই অতসী দশ বার এ-ঘর ও-ঘর করে, কিন্তু আজ একটী বারও উনুন ছেড়ে ওঠে নি।

ওর প্রাত্যহিক জীবনে এইটুকু ব্যতিক্রমও উপেনের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। চোখ নেই, তবুও অতসীর সম্পর্কে অনুভূতির প্রখরতা যেন অদ্ভুত। হাতড়ে হাতড়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়—'মাথাটা কি বড্ড বেশী ধরেছে মা?'

'না ত।'—অতসী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। বোধ হয় খিদে পেয়েছে বাবার।

'আজ আর না-ই বা রাঁধতিস মা! চালগুলো বদল দিয়ে দোকান থেকে মুড়িমুড়কি আন্‌লেও রাতটা কেটে যেত।'

'তা হোক্ বাবা, দিনান্তে একবার বই ত নয়। একমুঠো

ভাত ফোটাতে কোন কষ্টই হয় না আমার।'—হাঁড়িটা একপাশে সরিয়ে রেখে অতসী উপনের জন্যে জায়গা পরিষ্কার করতে লাগল।

দীনুর ঘর অন্ধকার দেখে গন্নাকাটি মাঝে মাঝে এসে দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারে। অতসী ইচ্ছা ক'রেই কোন কথা বলে না। পদ্মকে সে কোন রকমেই সইতে পারে না। দীনুর কথা নিয়ে রাতদিন যে খোঁচা সে দেয় ওকে, তাতে অতসীর আপাদমস্তক জ্বলে ওঠে। তবুও অতসী মুখ বুঁজে সয়ে যায় তার ছোটলোকপনা। আগে পদ্মকে দেখে ভয় হ'ত; এখন হয় ঘেন্না।

'দীনু কি এখনও ফেরেনি, অতসী?'—উপেন কান খাড়া ক'রে পাশের ঘরের শব্দ শুনবার চেষ্টা করে।—'রাত বুঝি বেশী হয় নি এখনো?'

'না।'—কি বলতে গিয়ে অতসী থেমে যায়। উপেনের মুখের ভাব লক্ষ্য করবার চেষ্টা করে, তারপর গলির দিকে আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে বলে—'ন'টা বেজেছে বোধ হয়।'

'তা হোক্। সারা দিন ঘুরে ঘুরে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে কোম্পানীর বাগানে। আসবে; ঘুম ভাঙলে আপনি আসবে, মা।'

উপেনের কথাগুলো শুনে অতসী যেন হঠাৎ কেমন বিব্রত হয়ে পড়ে। দীনুর সম্পর্কে যে দুর্বলতাটুকু এতদিন ওর নিজের কাছেই পরিষ্কার ছিল না, সেটা যে অন্ধ বাপের চোখেও এতখানি ধরা পড়েছে, সে কথা ও ভাবতে পারে নি।

কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবেই জবাব দিয়ে বসে—'আপনি সে আসবে না, বাবা; আসেও নি কোন দিন। মন যদি না থাকে, কারো মুখ তাকিয়ে কোন কাজ সে করবে না।'—এবার

অতসী ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিছুই ভাল লাগে না আর; কথা বলতেও যেন বিরক্তি আসে।

দীনুর দেরী দেখে সে ক্রমেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল। ছেঁড়া একখানা শালপাতায় দু'মুঠো ভাত উপেনের সামনে ধ'রে দিয়ে, তেমনি অন্যমনস্কভাবে উঠে ঘরে গেল।—আসবে না, আজ আর নিশ্চয়ই আসবে না ফিরে। আর, কেনই বা আসবে! ওরা ভিকিরী। ভিকিরীদের বস্তিতে ক'দিন যে ছিল দীনু, সেও হয় ত অতসীদের উপর দয়া ক'রে।

অতসী ভাবে: বস্তির ওই ভিকিরীগুলো, রাস্তার হা-ঘরে' ক্যাঙলাগুলো—ওদের কারো সঙ্গে দীনুর এতটুকু মিল নাই। দীনু যেন অন্য দেশের মানুষ! পেটে ভাত নাই; না খেয়ে দিনের পর দিন পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, তাও ভাল; তবুও এতটুকু ছোট হবে না কারো কাছে। অতসী কত দিন দেখেছে,—দীনু যা বলে, যা ভাবে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখপানে তাকিয়ে থেকেও সে তার বিন্দুবিসর্গ বোঝে না।

'অতসী!'

অতসী চম্‌কে উঠল—'তোমাকে আর একমুঠো ভাত দেবো বাবা?'

'না মা, ভাত আর লাগবে না আমার। গলার ভিতরটা দিন দিন যেন শুকিয়ে আসছে রে; খেতে আর ইচ্ছে করে না। তবু না খেলে নয়, তাই'—কথা বলা হয় না। কান্নায় কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে। বুক ঠেলে হিক্কা উঠতে চায়।—সেই ভাত! আজও মুখে তুলতে হয় প্রতিটি দিন! এই এক মুঠো ভাতের জন্যে

খোকা, তার মা তিল তিল ক'রে শুকিয়ে মরেছে।—ভাবতে গিয়ে হঠাৎ মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

'কি যেন বলছিলাম রে? ও হাঁ! তুই-ও না-হয় খেয়ে নে মা, দীনুর হয় ত আসতে দেরীই হবে আজ।'—বিলম্বিত দীর্ঘশ্বাসটা রোধ ক'রে উপেন উঠে পড়ল।

ওদিকের ঘরগুলো এর মধ্যেই নিশুতি হয়ে পড়েছে; শুধু প্রদীপ জ্বলে রাধা বোষ্টুমির ঘরে। পদ্মর গলার আওয়াজ আর শোনা যায় না; ওদের খাওয়া-দাওয়া মিটে গেছে অনেক আগে। মাণিক পেয়াদা আর গোলাম কি নিয়ে যেন তর্কাতর্কি করে। বিলিতি খরসান ও গাঁজার উগ্র গন্ধ মাঝে মাঝে বাতাসটা ঝাল ক'রে তোলে।

দশটা বেজে গেল, তবু দীনুর দেখা নাই। সারা বস্তিতে থমথম করে মৃত্যুর ছায়া। ভাতের হাঁড়ি তখনও তেমনি পড়ে আছে উনুনের ধারে। অতসী খায় নি, হয় ত খাবেও না আজ। মাথার যন্ত্রণা আরও বেড়ে উঠেছে। তলগড়ে আঁচলটা বিছিয়ে এতক্ষণ মাথা গুঁজে পড়ে ছিল। দীনু যে ফিরে আসবে না, সে কথা কিছুক্ষণ আগেও যেন ঠিক বিশ্বাস হয় নি; কিন্তু এখন আর অবিশ্বাস করতে সাহস হয় না।

মনটা অস্বস্তিতে তোলপাড় করে। দীনু পালাবে এক দিন, ঠিক এমনি ক'রেই পালাবে, তা ও জানত। কিন্তু একটিবার, শুধু একটিবার মাত্র ব'লে যেতে কি বাধা ছিল? অতসী ত আটকে রাখত না তাকে। কেনই বা আটকাতে যাবে সে? যা থাকবার নয়, তা থাকে না। তবুও বলত দুটো কথা! অন্তত একটি ভিক্ষে চেয়ে নিত দীনুর কাছে। যে কথা কোনদিন মুখফুটে বলবার সাহস হয় নি, যাবার বেলায় জানাত সেই ভিক্ষে।—অতসী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

উপেন তখনও ঘুমোয় নি। অতসী পা টিপে টিপে দীনুর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শিকলটা বাইরে থেকে তেমনি আটকান; দীনু আসে নি। আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে ঘরের ভিতর গিয়ে একবার দাঁড়ায়; চোখ দুটো বড় ক'রে দেখবার চেষ্টা করে—সেই অন্ধকারে কোথাও কেউ ঘুমিয়ে আছে কি-না। কান পেতে শোনে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

না,—নাই, কেউ নাই ঘরে। দীনু আসে নি; আসবে না আর। অতসীর রাগ হয় পদ্মর উপর। ওই গন্নাকাটীই পুড়িয়েছে ওর কপাল; সোনার ঘরে টিকের আগুন দিয়েছে।—সশব্দে দরজাটা বন্ধ ক'রে অতসী মেঝেয় শুয়ে পড়ল; ছেঁড়া আঁচলটুকু বিছিয়ে, হাতে মাথা দিয়ে প'ড়ে প'ড়ে আকাশ-পাতাল ভাবে। চোখে জল আসে। দীনুকে সে কোন দিনও চায় নি জীবনে। আপনা-আপনি এসে উঠেছিল ওর খেয়াঘাটে; আবার জোয়ারের মুখে আপনি কোথায় ভেসে চ'লে গেছে।

তা যাক। অতসী আর ভয় করে না। আবার হয় ত ভাগাড়ের মাংসের মত ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করবে খেঁকি কুকুরগুলো। মাথায়, মুখে, বুকে—সারা গায়ে রাত-দিন ঘেয়ো কুকুরের নিশ্বাস ফঁস্ ফঁস্ করে লাগবে।

—তিনটে মাস তবুও নিশ্চিন্তে ছিল এক জায়গায় আস্তানা গেড়ে। দীনুর শক্ত লম্বা চেহারা দেখে, হয় ত মাণিকপেয়াদার মনেও হ'ত ভয়। নইলে, অনেক আগেই ছেড়ে চ'লে যেতে হ'ত এই বস্তি। তেমনি ক'রেই ত কেটেছে ওদের পূরোপূরি চার বছর।

'অতসী!'—বাবা ডাকে।

অতসী একবার ভাবল সাড়া দেবে না। কথা বলতে, এমন কি সাড়া দিতেও কেমন শৈথিল্য আসে। আবার পরক্ষণেই মনে হয়, এখুনি হয় ত বুড়ো হাতড়ে হাতড়ে উঠে আসবে বিছানা ছেড়ে; অন্ধকারে হুমড়ি খেয়ে পড়বে কোথায় ঠোক্কর লেগে।

'দীনু কি এখনো আসে নি, মা?'

এবার আর অতসী উত্তর না দিয়ে পারে না—'আজ সে আসবে না, বাবা।'—ওইটুকু ব'লেই ওর কথা থামে না; আপনমনে বিড়বিড় করে—'আজ কেন! কোন দিনই আসবে না আর ফিরে।'—শরীরটা টান ক'রে ছড়িয়ে দেয় মাটির উপর।

বুড়ো বোধ হয় তখনও বলছিল ওকে শুনিয়ে—'গোটা গোটা উপোস ক'রে সারা শহর ভিক মেগে বেড়ানো কি সহজ রে! রাতের উপোসে পাহাড় ভেঙে পড়ে। কাল সকালে আবার ফিরতে হবে পাঁচ বাড়ী সেধে।'

অতসী নির্বাক্ হয়ে শোনে। চোখে ঘুম নাই; আস্তে আস্তে নেমে আসে খুব হাল্‌কা একটু তন্দ্রা। স্বপ্ন নয়, কল্পনা; ওর অবসন্ন চেতনা ছাপিয়ে ভেসে ওঠে অতীত বাস্তবের বিচ্ছিন্ন টুকরো: মাথাটা দু'হাতে চেপে ধ'রে দীনু কাঁদে; কপাল ব'য়ে গড়ায় রক্তের ধারা। কেটে গেছে! বাঁ-দিকের কপালটা—ভ্রূর উপরে প্রায় চার আঙুল লম্বা হয়ে কেটে গেছে পাথরে চোট লেগে।—উঃ!

অতসী আঁৎকে ওঠে, অবসাদগ্রস্ত স্নায়ুগুলো হঠাৎ চন্‌চন্ ক'রে ওঠে পর্যাপ্ত রক্তপ্রবাহে। দীনু! দীনু কাঁদে অন্ধকার পথের একপাশে ব'সে।

—না না, কে দীনু? কে ওর? ওরই মত একটা হা-ঘরে'

কাঙাল। শুধু পথের আলাপ বই ত নয়! সেই ছাতাওয়ালা, মুদির দোকানের খোট্টা ছোঁড়াটা—তাদেরই মত এসে জুটেছে ওর জীবনে। তা ছাড়া আর কি?

তবু পারল না। অতসী পারে না মনের লাগাম শক্ত ক'রে ধরতে। ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল।—কিন্তু রাত তখন অনেক হয়েছে। সারা বস্তি অচেতন হয়ে পড়েছে ঘুমে। একলা বাইরে বেরোতেও ভয় করে।

চৌকাঠ ধ'রে কিছুক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থেকে ত্রস্ত পদে এগিয়ে গেল পদ্মর ঘরের দিকে। যত রাগ, যত অভিমান নিমেষে উবে গেল।—হয় ত পদ্ম জানে! দীনুর কথা ও নিজে সব সময় বুঝতে পারে না, কিন্তু পদ্ম বোঝে। ওর চেয়ে সে অনেক বেশী চালাক।

পদ্ম ঘুমচ্ছে। মনে হ'ল, ডাকে; চীৎকার ক'রে ডাকে দরজায় ঘা দিয়ে। কিন্তু পারে না। স্থাণুর মত দরজার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার ধীরে ধীরে ফিরে এলো নিজের ঘরে। ওর বাবা তখন ঘুমিয়েছে।

অতসী অস্থির হয়ে উঠল। পাগলের মত চারিদিকে চায়; কিন্তু কোথাও খুঁজে পায় না, মনের এক-তৃণ অবলম্বন। সারাটা বস্তি যেন দুপুর রাতের ঘন অন্ধকারে শাঁ শাঁ করে। কপালের পটিটা ছিঁড়ে ফেলে, রুক্ষ চুলগুলো জড়িয়ে নিয়ে, এলোমেলো পায়ে এবার সে এগিয়ে চলল গলির দিকে। পায়ের শব্দে কুকুরটার ঘুম ভেঙে যায়, ঝিঁ ঝিঁ পোকাগুলো পাখার ঝাপটা দিয়ে উড়ে যায় এ-পাশ থেকে ও-পাশে।

মুমূর্ষু পৃথিবী

তিন দিন সমানে পথে পথে ঘুরে অতসী আবার ফিরিয়ে এনেছে দীনুকে। ফিরিয়ে এনেছে সত্যি, কিন্তু আগেকার সেই দীনু যেন তিনটী দিনেই নিঃশেষে হারিয়ে গেছে মহানগরীর প্রশস্ত রাজপথে। এখন আর সে ভিকিরী নয়। ভিকিরী যে কোন দিন ছিল, সে-কথা আজ স্পষ্ট করে ভাবতেও দীনুর ধাঁধা লাগে।

ভিক্ষে-করা চালের অগ্রভাগ থেকে অতসী যখন ফেনমাখা ভাতের দলাটা ওর সামনে ধ'রে দেয়, দীনু বিকৃতের মত হাসে ; অতসীর মুখ পানে চেয়ে হাসির ঝোঁকটা নিমেষে কাটিয়ে নিয়ে বলে—'দাও, পেটের দায়ে মানুষের কাছে ভিক মেগে আনা পিণ্ডির ভাগ দিয়ে জ্যান্তের সৎকার কর।'

অতসী থতমত খেয়ে যায় ; বিব্রত দৃষ্টিতে দীনুর মুখপানে চেয়ে ভাবে, কি উত্তর দেবে!—ভাতগুলো গ'লে পাঁক হয়ে গেছে। সেই কখন নামিয়েছে ফেনসুদ্ধ ভাত! পিণ্ডির মত দলা বেঁধে গেছে।

কি ব'লতে চায়! কিন্তু দীনু নিমেষে ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আবার ব'লে ওঠে—'আমরা কি, জানো? প্রেতাত্মা! মানুষের সংসারে বায়ুচারী নিরাশ্রয় অপদেবতা আমরা। হা-পিত্যেশ ক'রে চেয়ে থাকি মুখপানে, কতক্ষণে ঝরবে এক ফোঁটা করুণা ওদের দরকারের অঞ্জলি ছাপিয়ে। সেই দয়া, ওদের সেই এক ফোঁটা দয়া নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি ; আমাদের আত্মার সৎকার হয় অতসী, সৎকার হয়।'

অতসী বোঝে না। মনে হয়, দীনুর কষ্ট হচ্ছে। এই অখাদ্য

আর হয় ত সে সইতে পারছে না। পারবেই বা কেমন ক'রে? এমনি কাঙালের ঘরে ত জন্ম হয়নি ওর।—নিজের অসহায়তার কথা ভেবে অতসীর কান্না পায়। নিতান্ত কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে—'পাঁচ-মিশিলি চাল কি-না, তাই ভাতগুলো অমন দলা পাকিয়ে যায়।'

বেদনার্ত মুখখানার দিকে চেয়ে দীনু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। বুঝতে দেরী হয় না যে, অতসী ব্যথিত হয়েছে। কথাটা বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্যে বলে—'না রে পাগলি, আমি তা বলছি না। বলছি—পশু-পক্ষী, এমন কি তার চেয়েও নিকৃষ্ট, শেয়াল কুকুরগুলোরও বাঁচবার অধিকার মানুষের চেয়ে বেশী। ওরা ভিক্ষে করে না, পেটের দায়ে একজন আর এক জনের কাছে হাত পাতে না।'—দীনু হাসে, খুব জোরে হো হো শব্দে হেসে ওঠে। পরম তৃপ্তির সঙ্গে ভাতের গ্রাসটা গলাধঃকরণ ক'রে আবার বলে—'ভগবানের সঙ্গে একবার দেখা হ'লে, তার শাসনদণ্ডটা ছিনিয়ে নিতাম। নরকের বন্দীগুলোকে মুক্ত ক'রে এনে ছেড়ে দিতাম মানুষের সমাজে। আগুন জ্বলে' উঠত; দেখতে দেখতে আগুন জ্বলে উঠত ওই ঘরগুলোয়।'—দীনু হাসে, আবার তেমনি ক'রে হেসে ওঠে অতসীর মুখপানে চেয়ে।

অতসী বিমূঢ় দৃষ্টিতে চায়। বোঝে না; এ কথার বিন্দুবিসর্গও প্রবেশ করে না ওর মাথায়। একটু ইতস্তত ক'রে জবাব দেয়—'তুমি পুরুষ মানুষ, তুমি পার না তার উপায় ক'রতে? আমার বাবা অন্ধ, তাই আমরা ভিক্ষে করি।'

'পারি অতসী, পারি। এক নিমেষে পারি ওদের সুখে আগুন জ্বালিয়ে দিতে। ওই সব পালঙ্কের এক এক টুক্‌রো কাঠ সেই আগুনে চিরকাল ধ'রে ধিকি ধিকি পুড়বে। কিন্তু কেন করি না

জানো ? করি না এই ভেবে যে, ওদের কান্নায় তোমাদের পাঁজরার হাড় এক-একখানা ক'রে খুলে পড়বে পথের ধূলোয়। আকাশের বুক চিরে অসংখ্য বাজ ভেঙে প'ড়বে মানুষের মাথায়।'

'তা পড়ে পড়ুক। তাই কর তুমি, ওগো তাই কর। আর বাঁচতে চাই না। কি হ'বে এমনি ক'রে বেঁচে ? তার চেয়ে একসঙ্গে সবাই মিলে মরাই ভাল। তা বাজ প'ড়েই হোক, আর ব্যামোতে ভুগেই হোক। ভুগে ভুগে মরার চেয়ে, হঠকারি মরা ঢের ভাল।' অতসী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে ওঠে। ওর মনে হয়, এতক্ষণে দীনুর কথার একটা মানানসই উত্তর দিয়েছে। এত কষ্টের ভিতরেও অপরিসীম তৃপ্তিতে মন ভ'রে ওঠে। মুখখানা উজ্জ্বল হয়, চোখ দুটো আনন্দে জ্বল জ্বল করে।

দীনু খাওয়ার কথা ভুলে যায়; নিতান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত দু'হাত বাড়িয়ে চেপে ধ'রতে চায় অতসীর মুখখানা।

অতসী যেন চোখে-মুখে কথা বলে—'আমরা বাঁচতে চাই না। তুমি বাঁচ দীনু, ওদের মত জোর ক'রে—'

বাইরের জগৎটা যেন নিমেষে চোখের সম্মুখ থেকে মুছে যায়। অতসীর ক্লান্ত চোখ দুটো এবার অলসতায় জড়িয়ে আসে; রক্তহীন পাণ্ডুর ঠোঁট দুখানা কাঁপে।

হঠাৎ দীনু ছিটকে পিছিয়ে যায়, মুহূর্তে নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে—'ভূত দেখেছ অতসী ? প্রেত !—কংকাল ! দেখেছ কখনো ? চামড়া নেই, মাংস নেই; শুধু হাড়! হাড়ে হাড়ে গাঁট-বাঁধা বিকট মূর্তি নিয়ে হাত পাতে লোকের দরজায় দরজায়। সেই কংকালের পেটের ভিতর জ্বলছে আগুন; রাত্রিদিন দাউ দাউ

ক'রে জ্বলে। আগে পাকস্থলী, তারপর ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, সব দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হ'য়ে যায়; শেষে,—শেষে চোখের কোটর দিয়ে উঁকি মারে সেই আগুনের শিখা! দপ দপ করে! অন্ধকারে পেত্তার মত ঘুরে বেড়ায় সেই দৃষ্টি। যেন এক-একটা আলাদান প্রেত।—ভাত! নর্দমায় নর্দমায় খুঁজে মরে একমুঠো পচা ভাত!'

অতসী ভয়ে আড়ষ্ট হ'য়ে ওঠে। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক চেয়ে দীনুর গা ঘেঁসে বসবার চেষ্টা করে। তবুও যেন ওর ভয় কমতে চায় না। মনে হয়, দীনু বুঝি আশেপাশে দেখেছে কিছু।

অতসীর মনের অবস্থা বুঝবার মত প্রকৃতিস্থতা বোধ হয় দীনুর তখন ছিল না। ওর চোখের সামনে সত্যি ভেসে উঠেছিল আর-এক স্বতন্ত্র জগৎ। তেমনি হাত নেড়ে নেড়ে আপন মনে বলে—'দেখ! ওই দেখ, তোমার চারপাশে আর্তনাদ ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছে। ডানে, বাঁয়ে, সামনে, পিছনে—খটখট করে লম্বা লম্বা হাড়গুলো। গায়ে গায়ে ঠোকা লেগে চকমকির মত আগুনের ফুলকি ছুটছে।'

সর্বাঙ্গ বিকল হ'য়ে আসে। অতসী ভয়ে আর চোখ মেলে চাইতে পারে না। মনে হয়, সত্যি বুঝি ওকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে অমনি সব ছায়ামূর্তি।—আরও সরে' বসে; একেবারে দীনুর গায়ে গা দিয়ে।

দীনু খিলখিল ক'রে হাসে—'ওরাও মানুষ ছিল অতসী, একদিন ছিল সত্যিকারের মানুষ। আজ সবাই আশ্রয় নিয়েছে তোমাদের এই আস্তাকুঁড়ে এসে; রাস্তার ডাস্টবিনের ধারে, ফুটপাথে, গলিতে,—তোমাদের এই বস্তির ঘরে ঘরে।—প্রেতাত্মা,

প্রেতাত্মা সব!' কথা বলতে বলতে দীনুর দৃষ্টি কেমন অস্বাভাবিক হ'য়ে ওঠে।

অতসী শিউরে উঠল। প্রাণপণ শক্তিতে দীনুর হাতখানা চেপে ধ'রে হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠল ভয়ে।

উপেনের ঘুম তখনও গাঢ় হয় নি। অতসীর চীৎকার শুনে সে চমকে উঠে বলে—'ভয় পেয়েছিস মা? অতসী!'

দীনুর হাতখানা আরও একটু শক্ত ক'রে ধ'রে অতসী কম্পিত-কণ্ঠে উত্তর দেয়—'না বাবা।' কিন্তু ভয়ে ওর সবশরীর তখনও থরথর ক'রে কাঁপে।

অতসীর অবস্থাটা এতক্ষণে সম্পূর্ণ উপলব্ধি ক'রে দীনু অত্যন্ত অপ্রতিভ হয়ে পড়ে। হতভম্বের মত কিছুক্ষণ ওর মুখপানে চেয়ে থেকে, আস্তে আস্তে সানকিখানা আবার টেনে নেয় কোলের কাছে।

পদ্ম তখন এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক ওদের সামনে। কাটা ঠোঁটখানা যেন বিস্ফারিত হ'য়ে উঠেছে একটা অদ্ভুত হাসিতে।

আশপাশের ঘর থেকে ভিকিরী আর ভাড়াটেরা মুখ বের ক'রে উঁকি ঝুঁকি মারে। তারাও হাসে; দীনুকে উদ্দেশ ক'রে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ বাঁকিয়ে বলে—'মাথা বিগড়েছে।'

পদ্ম হাসতে হাসতে ফিরে যায়। ওদের শুনিয়ে জোরে জোরে বলে—'সামলাতে পারলি না অতসী! ওষুধ করতে গিয়ে মিন্‌সের মাথাটা বিগড়ে দিলি।'

দীনুর মাথা লজ্জায় হেঁট হ'য়ে আসে। বুকের ভিতর বিক্ষিপ্ত মানুষটা আবার ক্ষুব্ধ আক্রোশে গর্জ্জন ক'রে উঠতে চায়, কিন্তু পারে না।

নিস্তব্ধ রাত্রি। সারাদিন মনটা কেমন এলোমেলো, কেমন বিশ্রী বিশৃঙ্খলতায় বিকল হ'য়ে ছিল। ভোরের বিপ্লবটা দিনের আলোয় মাঝে মাঝে প্রখর হ'য়ে উঠছিল; সব অনুভূতি ছাপিয়ে মনের মধ্যে ভেসে উঠছিল রাত্রিশেষের অপ্রীতিকর ক্লেশটুকু। এতক্ষণে চোখের পাতায় ঘুম গাঢ় হয়ে এসেছে; স্নায়ুর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জমে উঠেছে চেতনাহীন অবসাদ। হঠাৎ সারা গা শির্‌শির্ ক'রে উঠল উষ্ণ স্পর্শে; বুকে-মুখে লাগে কার ঘন নিঃশ্বাস! দীনু চমকে ওঠে: কিন্তু সুপ্তি আর চেতনার মাঝখানে সংবিৎটা আবার নিক্রিয় হ'য়ে যায়—

অতসী! মাথার মধ্যে ঘুমের নেশায় চেতনাটুকু মূর্ছিত হ'য়ে আছে; আকস্মিক আলোড়নেও জেগে উঠতে চায় না। অন্ধকারেই দীনু হাত বাড়িয়ে আধ-ঘুমে অনুভব ক'রবার চেষ্টা করে। পাশে কে শুয়ে! একবার মনে হ'ল, হয় ত অতসী কখন উঠে এসেছে ও-ঘর থেকে। অতসী! যার দেহের প্রত্যেকটি অণুপরমাণুর জন্যে অতর্কিত মুহূর্তে ওর রক্তে—সারা দেহমনে জাগে অদম্য লালসা, সে যে হঠাৎ এমনি ক'রে উঠে আসবে ওর শয্যায়—একথা দীনু কোনদিন ভাবতেও পারে নি, স্বপ্নেও না। ভাববার শক্তি সত্যি ছিল না তখন; তবু মনে হ'ল—কেন এলো অতসী এমন অযাচিতভাবে ওর বিছানায়? মনটা বিষিয়ে উঠল। নিমেষে দীনুর অর্ধ-জাগ্রত অনুভূতিগুলো সংকুচিত হ'য়ে প'ড়ল ঘৃণায়; অতসীকে একটু দূরে ঠেলে দিয়ে আস্তে আস্তে পিছিয়ে গেল ছেঁড়া মাদুরখানার বাইরে, একেবারে মাটিতে।—কেন এলো, কেন এলো ও এমন ক'রে, না-চাইতে?

এর চেয়ে বরং দীনু থাকত অনন্তকাল ধ'রে ওর প্রতিটী লোমকূপের প্রতীক্ষায়। ক্ষতি তার ছিল না, লাভও সে চায় নি কোনদিন। কিন্তু আজকে হঠাৎ এই লাভ-ক্ষতির বাইরে, অপ্রত্যাশিত পাওনায় দীনুর সারা মন অস্বস্তিতে ভ'রে ওঠে।

চোখের পাতাদুটো আবার নিবিড় হয়ে আসে ঘুমে, হয়ত তেমনি ক'রেই কেটে যায় নিস্তব্ধ রাত্রির বিলম্বিত পলগুলি। হঠাৎ আবার বুকের উপর লাগে অতসীর হাতের স্পর্শ। এবার আর দীনু উৎক্ষিপ্ত হয় না। আশ্চর্য! মুহূর্ত আগে যে বিরক্তি ওকে অকস্মাৎ পেয়ে বসেছিল, সেই বিরক্তি যেন নিমেষে ধুয়ে গেল নতুনতর অনুভূতির প্রবাহে। দীনুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রাণপণে কাটিয়ে উঠতে চায় সেই গুরুভার ঘুমের জড়তা। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে; অতসীর গায়ে গা দিয়ে, ছেঁড়া মাদুরখানার উপর আগের মতই স্বচ্ছন্দে ছড়িয়ে দেয় সারা দেহ। তারপর আস্তে আস্তে বুকের কাছে টেনে নেয় অতসীর মাথাটা; রুক্ষ চুলগুলোয় বারবার হাত বুলিয়ে দেয় প্রগাঢ় মমতায়।

কপালে একটী রেখাও পড়ে নি এই কঠোর দারিদ্র্যের। মসৃণ ভ্রূর নীচে চোখের পাতাদুটো প্রদীপের শীষের মত দপ দপ ক'রে কাঁপে। চুলগুলো নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে দীনু দু'হাত দিয়ে সযত্নে চেপে ধরে অতসীর মুখখানা। ঠোঁটের উপর চঞ্চল গতিতে আঙুলগুলো চালিয়ে যায়, ঠিক অর্গ্যানের রীডে জলদ সুরে গৎ বাজানোর মত।—তারপর? তারপর আচম্বিতে সাপের গায়ে হাত লাগার মত চমকে ওঠে। উপরের ঠোঁটখানা লম্বালম্বি কাটা! মস্ত বড় একটা দাঁত মাঢ়িসুদ্ধ মাথা জাগিয়ে আছে সেই কাটা-ঠোঁটের

মাঝখানে। দীনুর অনুভূতিটুকু নিমেষে উবে যায় ; অতসী নয়, ওর পাশে এসে শুয়েছে পদ্ম ! সেই গন্নাকাটা ছিপছিপে মেয়েটা।

ঘৃণায়, অস্ফুট শব্দের সঙ্গে দীনু পিছিয়ে আসতেই, পদ্ম ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আঁচলের ঝাপটা লেগে কানিস্তারের কপাট ঝন্ ঝন্ ক'রে ওঠে। সে শব্দ দীনুর কাণে যায়, কিন্তু কোন কথা ব'লবার, এমন কি এক ইঞ্চি এ-পাশ ও-পাশ হ'য়ে শোবার শক্তিটুকুও তখন লুপ্ত হয়েছে। তড়িৎ-স্পৃষ্টের মত বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চেয়ে থাকে সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর।

সকাল থেকে যতবার কথাটা মনে হয়েছে, ততবারই যেন ওর চিন্তাশক্তি বিক্ষিপ্ততায় ঘোলা হ'য়ে উঠেছে। দীনু ভাবতে পারে না ; চেষ্টা ক'রেও ভেবে উঠতে পারে না, সেটা ওর স্বপ্ন না প্রত্যক্ষ বাস্তব ! সারাদিন মনটা শুধু তোলপাড় করে। সেই সূত্র ধ'রে ছোট-বড় নানা কথার স্তূপ বুকের ভিতর জমে' ওঠে। অতসীর মুখপানে ভাল ক'রে চাইতেও যেন আজ লজ্জা হয়। হয় ত জানে অতসী ! হয় ত কপাটের সেই ঝন্ ঝন্ শব্দে ওর ঘুম ভেঙেছে ; দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখেছে, পদ্মকে বেরিয়ে যেতে।

দিনের আলো নিবে যায়। আবার ধীরে ধীরে পৃথিবীর বুকে সন্ধ্যার কালো পর্দা নামে। দীনু ইচ্ছা ক'রেই ঘরের আলোটা আজ জ্বালতে দেয় নি। পৃথিবীর সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড সূর্যের তীব্র কটাক্ষে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই আগুনের জ্বালা এখনো ওর হৃৎপিণ্ডে হূ হূ করে।

মুমূর্ষু পৃথিবী

ভাড়াটেদের কলরবে বস্তিটা আবার জেগে উঠেছে। ওপাশের ঠিকে-ভিকিরীরা তখনো ফেরে নি। বাড়ীওয়ালার খোট্টা দরোয়ানটা ঘরে ঘরে ভাড়া আদায় ক'রে বেড়ায়! দীনু বিছানায় প'ড়ে কাণপেতে শোনে। কেউ পয়সা দেয়, কেউ কাতর মিনতি জানায়, কেউ বা ভয়ে লুকিয়ে বেড়ায় এ ঘর থেকে সে-ঘরে।

অতসীর রান্না তখনো শেষ হয় নি। চৌকাঠে ঠেস দিয়ে বসে' উপেন আপনমনে কি যেন ব'লে চলেছে অতসীকে। কথা-গুলো স্পষ্ট শোনা যায় না, তবুও তাৎপর্যটুকু গ্রহণ ক'রতে কষ্ট হয় না। ভাড়ার পয়সার কথা!—এখুনি আসবে দারোয়ান; চোখ রাঙিয়ে ব'লবে—'তিন রোজের ভাড়া বাকী প'ড়েছে। আবার বাকী?—নেহি হোগা।'

দীনু এখন আর ভিক্ষে করে না। অতসী বারণ করে লোকের দরজায় হাত পাততে। তার চেয়ে চাকরি, না-হয় যে কোন একটা কাজ খুঁজে নিতে পারলে সত্যি তার কোন ভাবনা থাকবে না; অতসীও নিশ্চিন্ত হবে। সে দীনুর রোজগার খেতে চায় না। ওরা যেমন ভিক্ষে করে, তেমনি ভিক্ষে ক'রে বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। উপেন গেরস্ত ঘরের ছেলে, কিন্তু অতসী ত তা নয়। ও জাত-ভিকিরী। 'অতসীর যখন আপন-পর জ্ঞান হয়েছে, তখন আর আপন বলতে কিছুই ছিল না ওদের।

এইবার বুঝি দারোয়ান এসে হাজির হয়েছে অতসীদের ঘরে। অতসী আঁচল থেকে কয়েকটা পয়সা খুলে তার হাতে দেয়; কিন্তু সে নিতে চায় না।

সত্যিই তাই! দারোয়ানটা চোখ রাঙিয়ে তর্জন করে!

অতসী কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলে—'এ কয়দিন ভিক্ষেয় বেরিয়ে যা পাই, তাতে একবেলার খোরাকিও জোটে না। শুধু চাল দু'মুঠো পাই ব'লেই রক্ষে। নইলে—'

দারোয়ান ওর অনুনয় শোনে না। পয়সাগুলো ছড়িয়ে ফেলে দেয়। ভাঙা বাংলায় সুর কেটে কেটে বলে—'খোরাকি জুটুক আউর নেহি জুটুক ; চাই ভাড়া।—তিন দিনের ভাড়া বাকী পড়েছে, আর বাকী রাখবে না, কিছুতেই না। মনিবের হুকুম নেহি।'—দু'খানা ঘরের ভাড়া বাবদ অতসী দিয়েছে মোটে সাতটা পয়সা! বাকী পয়সা কাল মিটিয়ে না দিলে, ঘর থেকে তাড়িয়ে দেবে ব'লে, দারোয়ানটা শাসায়।

দীনু উঠে এসে দরজার সামনে দাঁড়াল। মুখ বাড়িয়ে দেখে দারোয়ানটার চেহারা আর অতসীর অসহ দীনতা। হেঁটমুখে কেরো-সিনের ডিবে হাতে নিয়ে পয়সাগুলো একটা একটা ক'রে কুড়িয়ে সে দারোয়ানের হাতে তুলে দেয়। ক্ষীণ আলোকেও স্পষ্ট দেখা যায় তার চোখের জল। মুখপানে চাইলে হয় ত স্থবির ভগবানের চোখও জলে ঝাপসা হ'য়ে উঠত।

রাত্রি তখন প্রায় দুটো। সারা বস্তি ঘুমে অচেতন। দীনুর চোখে ঘুম নেই। একটানা ঘুম ওর একটা রাতের জন্যও হয় না আর। মগজে ঘুরে বেড়ায় কখনও দুঃস্বপ্ন, কখনও অতীত আর বর্ত্তমানের সংমিশ্রণে গ'ড়ে-ওঠা অদ্ভুত কতগুলো চিন্তার কবন্ধ। চোখের জল শুকিয়ে গেছে ব'লেই যেন কতকটা স্বস্তির সঙ্গে বাঁচে সে। নইলে, কতকাল আগে ধুয়ে মুছে যেত এই অকিঞ্চিৎকর বেঁচে-থাকা, জীবন্ত মানুষের কবরখানায়। দীনুর সন্দেহ হয়, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির

সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নিয়ে, বর্ত্তমান আর অতীতকে পাশাপাশি রেখে নিজের কথা ভাবতে সত্যি সন্দেহ হয় যে, আজও সে বেঁচে আছে কি-না! আশেপাশে যারা বেঁচে আছে; তারা কি মানুষ; না, মানুষের প্রেতাত্মা!—মানুষ হ'তেই পারে না। তবে ছিল কোন দিন; তারাও ছিল পৃথিবীর ওই চলমান জীবন-স্রোতের মাঝখানে মানুষের মত বেঁচে। সবার সঙ্গে চলতে চলতে হঠাৎ কখন অন্ধকারে পিছিয়ে পড়েছে। তারপর ধাক্কা খেয়ে খেয়ে দেহগুলো লুটোপুটি ক'রে গড়িয়ে এসেছে পিছনের পথে। সেই দুর্দম পতনের আবর্ত থেকে অসহায় ক্ষীণ জীবনগুলোকে আর টেনে তুলতে পারে নি।—একদিন ওরাও ছিল মানুষ, আজ এইটাই ওদের একমাত্র সান্ত্বনা।

চোখ দুটো কেবল জমে' এসেছে; হঠাৎ দীনুর ঘুম ভেঙে গেল ভয়ার্ত শিশুর আর্তনাদে। কে কাঁদে! করুণ কান্নায় নিশুতি রাতের নিস্তব্ধ বাতাস যেন শিউরে ওঠে। সেই সঙ্গে নারীকণ্ঠের কাতর মিনতি, আর নির্মম পুরুষের ক্রুদ্ধ আস্ফালন!

দীনু ধড়ফড়িয়ে উঠে ব'সল। সে কান্না যেন থামতে চায় না। ছেলেটা অসহ্য যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে কাঁদে। আলো জ্বালবে ব'লে দীনু হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই কুড়িয়ে নিল; কিন্তু আলো আর জ্বালা হ'ল না। হঠাৎ কি ভেবে ছুটে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।—ওদেরই বস্তির পূবদিকের ঘরগুলো থেকে আসে সেই কান্নার শব্দ।

উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শব্দটা লক্ষ্য ক'রে সেই দিকে

এগিয়ে যেতেই হঠাৎ পিছন থেকে কে শক্ত মুঠোয় চেপে ধ'রল ওর ডান হাতের কব্জিটা। দীনু চমকে উঠল—'কে ?'

অতসী তাড়াতাড়ি দীনুর মুখে হাতখানা চাপা দিয়ে নীচু গলায় বলে—'চুপ !'

দীনু থতমত খেয়ে যায়। ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।—'অতসী ?'

'হাঁ। যেও না ওদিকে।'—অতসী অনুনয় করে, প্রাণপণ শক্তিতে টানে ওর হাত ধ'রে।

দীনু হতভম্বের মত জিজ্ঞেস করে—'কেন ?'

'কেন ! এখুনি ছুরি মারবে তোমার বুকে। ফিরে চল; যেন টের না পায় ওরা।'—অতসী হাঁপিয়ে ওঠে। কথা ব'লতে ওর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে।

অতসীর হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে দীনু বলে—'শুনতে পাচ্ছ না, ছেলেটার কান্না ? যন্ত্রণায় চীৎকার করছে।'

অতসী তেমনি হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দেয়—'তা করবে না ? চোখ ! সব্বের সেরা ধন চোখ ওর জন্মের মত গেল।'

'তোমার কথা বুঝতে পারছি না অতসী। কি হয়েছে ওর চোখে ? অত কান্না !'—বিহ্বলভাবে অতসীর মুখপানে চায়।

অতসী দীনুর হাতখানা আরও শক্ত ক'রে ধ'রে বলে—'ঘরে চল; সব বলছি।'

ওর ভাব দেখে দীনু অস্থির হয়ে ওঠে; ভাবতে পারে না, এমন কি আতঙ্ক লুকিয়ে আছে ওই শিশুর করুণ আর্তনাদের

পিছনে। জোর ক'রে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ায়—'না। আগে বল, কি হয়েছে ওর ?'

অতসী জবাব দিতে পারে না। কথা বলতে কান্নায় কণ্ঠস্বর ভারী হয়ে আসে। দু হাত বাড়িয়ে দীনুকে আটকাবার চেষ্টা করে ; 'না, না। যেও না তুমি।'

এবার দীনু দৃঢ়তার সঙ্গে অতসীর হাত সরিয়ে দিয়ে বলে—'পাগলামি ক'র না অতসী। ফিরে যাও।'

'না। সব পারে ওরা। পরশু রাস্তা থেকে ছেলেটাকে ভুলিয়ে এনেছে ভিকিরী করবে ব'লে। চোখ দুটো গালিয়ে অন্ধ ক'রে দিচ্ছে।'—অতসীর নিশ্বাস ঘন হয়ে ওঠে ; কথার চেয়েও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।

'অন্ধ ! অন্ধ তৈরি করছে ?'—দীনু বজ্রাহতের মত অসাড় হয়ে গেল।

'হাঁ ; লোহার কাঁটা দিয়ে চোখদুটো উপড়ে দিয়েছে।'

বিশ্বাস হয় না। অন্তরের মরচে-ধরা তন্ত্রীগুলো কেঁপে কেঁপে থেমে যায়। একটুক্ষণ কি ভেবে দীনু উদ্‌ভ্রান্তের মত বলে উঠল—'তুমি ঘরে যাও অতসী, আমি দেখে আসি। মানুষ মানুষকে অন্ধ তৈরি করছে ! না না, মিথ্যে—মিথ্যে অতসী !'

অতসী শংকিত হয়ে একহাতে দীনুর হাতখানা জড়িয়ে ধরে, আর-এক হাত পায়ের দিকে বাড়িয়ে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলে—'ওগো পায়ে ধরি, যেও না। ওরা সব পারে। এখুনি খুন ক'রে ফেলবে।'

'তা হোক।'—দীনু মানে না ; অতসীর হাত ছাড়িয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়। অতসীও চলে তার পিছু পিছু।

মুমূর্ষু পৃথিবী

দরজা বন্ধ। ঘরের ভিতর একটা মেটে প্রদীপ মিট মিট করে। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ও-পাশের ভাঙা জানালাটার ধারে গিয়ে দীনু চুপটি ক'রে দাঁড়ায়।

রাধা বোষ্টুমি কাকুতি-মিনতি করে—'ওগো দিও না অমন রাজপুত্তুর ছেলেটাকে একেবার জখম ক'রে। আর কখনও ত বলিনি। দুখের ছেলে—'

মাণিক পেয়াদা যমদুতের মত কটমটিয়ে রাধার মুখপানে চায়। তার চোখের দিকে চাইলে সত্যি ভিতরটা ভয়ে শিউরে ওঠে। ছেলেটার বুকে হাঁটুর চাপ দিয়ে ব'সে, এক হাতে এমন ভাবে মুখ টিপে ধরেছে যে, নড়বার শক্তিও নেই তার। দুই গাল বয়ে গড়াচ্ছে তাজা রক্ত।

চোখে তুঁতের গুল ছড়িয়ে দিতেই ছেলেটা আবার চীৎকার ক'রে উঠল প্রাণপণে। রাধা তখন মাণিকের হাত দুটো জড়িয়ে ধরেছে। মাণিক বাঁ-পায়ে এমন জোরে ধাক্কা দিল তার বুকে যে, রাধি হুমড়ি খেয়ে উল্টে পড়ল মেঝেয়। শিশুর করুণ আর্তনাদে মাণিক কর্ণপাতও করে না।—তারপর ছেলেটাকে জোর ক'রে গিলিয়ে দিল খানিকটা কালো জল, হয় ত আফিং-ঘোঁটা।

দীনুর সংজ্ঞা বোধ হয় তখন লুপ্ত হয়ে আসছিল। আপাদমস্তক থর থর ক'রে কাঁপে। অতসী তার অবস্থা বুঝে জোরে টানতে টানতে নিয়ে এলো উঠানের এপারে। দীনু দাঁড়াতে পারে না ; পা দুটো অসাড় হয়ে গেছে। সারা গা ঘামে চব চব করে।

অতসীর ঘাড়ে ভর দিয়ে দীনু বিভ্রান্ত স্বরে বলে—'অতসী, পৃথিবীটা

বুঝি চৌচির হ'য়ে যাবে। শোন কান্না! মাটির ভিতর থেকে উঠছে কান্নার শব্দ। নিশুতি রাতে দুনিয়াসুদ্ধ মানুষ কাঁদছে।'

দীনুকে ধ'রে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে এনে অতসী আঁচলের বাতাস দিতে লাগল। ওর কপাল ব'য়ে তখন ঘাম ঝরছে। মাথাটা কোলের উপর নিয়ে ভয়ে ভয়ে অতসী জিজ্ঞেস করে,—'এখনও গা-ঘুরছে দীনু?'

'না।'

'তবে অমন করছ যে?'

'কই? করি নি ত কিছু; ভাবছি। ভাবছি, মানুষের খিদের আগুনে এখনও পৃথিবীটা পুড়ে ছাই হয় নি কেন!'—কথা বলতে বলতে দীনু হঠাৎ থেমে যায়। অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবে; তারপর গভীর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে আবার ব'লে ওঠে—'ভূমিকম্প!—বিহারের মত অমনি একটা ভূমিকম্প সারা দুনিয়া জুড়ে যদি হ'ত!'

'কি বলছ?'—অতসী অভিভূতের মত জিজ্ঞেস করে। দীনুর অবস্থা দেখে ওর ভয় হয়; বোধ হয় মাথার গোলমাল হয়েছে।

'বলিনি কিছু। ওই বাড়ীগুলো,—জোঁকের বাচ্চার মত কিলবিল ক'রে বেড়াচ্ছে পথের দু'পাশে ওই যে অসংখ্য লোক,—সব যদি ভেঙে চুরমার হ'ত, জ্যান্ত ম'রত ইট-কাঠ চাপা প'ড়ে, তা হ'লে পৃথিবীটা দু'দণ্ড নিশ্বাস ফেলে বাঁচত। সে আর পারে না, পারে না ওদের ভার সইতে। দুর্বল ক্লীব মানুষের দল ভগবানের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে রেহাই পেতে চায়;—হায় রে!'—দীনু হেসে ওঠে। হাসির বেগে বুকের জীর্ণ পাঁজরাগুলো ঝির ঝির ক'রে কাঁপে।

অতসী এমনিতেই বোঝে না দীনুর সব কথা ; তার উপর আবোল-তাবোল। এ সবের একবর্ণও প্রবেশ করে না ওর মাথায়। দীনুর কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে চিন্তিত ভাবে বলে—'উপোসে উপোসে মাথা তোমার খারাপ হয়ে গেছে। খিদেয় পেট পুড়ে যায় ; ঘর-বাড়ী পোড়ে কখনও ?'

'সব পোড়ে অতসী, সব হয়। আস্ত আস্ত মানুষ পুড়ে যায় ; পাকস্থলী, ফুস্‌ফুস্‌, কলজে, পাঁজরার হাড়—তাজা মগজটা পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অন্ধ অসহায় শিশু পথে পথে কেঁদে, যোগাবে সেই ক্ষুধার অন্ন!'—দীনু আবার চঞ্চল হয়ে ওঠে ; সিধে হয়ে উঠে বসতে চায়।

এক হাতে দীনুর গলাটা জড়িয়ে ধ'রে, আর-এক হাত মাথায় বুলাতে বুলাতে অতসী বলে—'একটু থির হও। আচম্‌কা মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে।'

দীনু হেসে ওঠে, সেই বিকৃত হাসি। অতসীর কোল থেকে মাথাটা টেনে নিয়ে উঠে বসে। ওর পেশিগুলো তখন শক্ত হয়ে উঠেছে। দাঁতে দাঁতে লেগে এমন কিট্‌কিট্‌ শব্দ হয় যে, অতসী ভয় পেয়ে যায়। মনে হয়, হয় ত দাঁতি লাগবে এখুনি।—'বেঁচে গেছ অতসী, তোমার চোখ নেই। আমার চোখের সামনে কলরব করছে লাখ লাখ ভিকিরী ; অন্ধ পঙ্গু প্রেতাত্মা সব! পথের দু'পাশে ভিড় ক'রে চলেছে। মাথা ঠুকে মরে ; হুম্‌ড়ি খেয়ে কে কার গায়ে উল্টে পড়ে ঠিক নেই। রাস্তার পাথরে ঠোকা লেগে লেগে মাথাগুলো থেঁতো হয়ে গেছে। এমন এক ফোঁটা রক্ত নেই যে, ঝরে' পড়ে।'

এবার অতসী বিরক্ত হয়ে ওঠে। শাসনের সুরে বলে—'চুপ ক'রে শোও দেখি চারদণ্ড। অত বকো না।'

'না। আর বক্‌ব না। তুমি শোওগে যাও।'—দীনু অবসন্নভাবে মাদুরের উপর হাত-পা ছড়িয়ে দেয়।

অতসী নিশ্চল ব'সে থাকে বিছানার পাশে। কখনো আঁচল দুলিয়ে বাতাস দেয়, কখনও বা হাতখানা শিথিল হ'য়ে আসে অন্যমনস্কতায়।—বেশ থাকে দীনু। থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন কেমন বিগড়ে যায়। ওদের ঘর-বাড়ী, টাকা-পয়সার কথা হয় ত এখনও ভুলতে পারে নি ও।—এমনি করতে করতেই আবার যাবে পালিয়ে। কখন পালাবে, অতসী টেরও পাবে না।

'অতসী!'

'ঘুমোও নি এখনও?'

'না। ঘুম আমার চোখে আসে না অতসী। তুমি শোও গে যাও। একা চুপটি ক'রে শুয়ে থাকলে, যদি একটু ঘুম আসে।'—দীনু পাশ ফিরে শুলো।

অতসী কি ভেবে আস্তে আস্তে উঠে গেল। দীনুর কথায় আর কোন প্রতিবাদ্ করল না সে। হঠাৎ ওই অবস্থা দেখে মনটা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। এবার একটু স্বস্তির সঙ্গে দরজাটা টেনে দিয়ে আপনমনে বিড় বিড় ক'রে বলে—'যারা কাঙাল, তাদের আবার শাস্তি!'

দীনু হাসে। অতসীর কথাগুলো খুব স্পষ্ট না হ'লেও, ওর কাণে যায়।—ছেলেটা আর কাঁদে না। আফিমের নেশায় ঘোর হয়ে ঘুমিয়েছে। এই ঘুমের সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনে নেমে এলো

অনন্ত রাত্রি। কে জানে, কতকাল পরে প্রভাত হবে ওর এই চিরন্তন অমানিশার!—জীবনজোরা অসহ অন্ধকার!

ভুল। ভগবানের সৃষ্টিতে ভাঙা কাঁচের স্তূপ: ভুল ক'রে গড়া অসংখ্য দেহপিণ্ড এসে জমেছে দুনিয়ার এই কবরখানায়। তার চেয়েও বড় ভুল করেছে ওরা, ওদের সেই অক্ষম বিধাতাকে বাঁচিয়ে রেখে।

দীনু বিছানায় পড়ে ছটফট করে; চোখে ঘুম আসে না, স্পর্শও করে না ওর ব্যথিত অস্তিত্বকে। চোখের সামনে চলচ্চিত্রের ছবির মত ভাসে জগতের অগণিত অন্ধ শিশু; ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়ায়—একমুঠো চাল, না-হয় একটা আধলার আশায়।

বুকের ভিতর কেমন একটা অস্বস্তি: মনে হয় বস্তির এই বদ্ধ বাতাসে শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যাবে। আবার উঠে বসে; বিমূঢ়ের মত বসে' ভাবে কত কি এলোমেলো। আকাশ-পাতাল সে চিন্তার যেন কূল-কিনারা নেই। মাথার মধ্যে পিল পিল ক'রে ওঠে অশান্তির বৃশ্চিকগুলো। ঘরের ভিতর অন্ধকারটা আরও বেশী জমাট বেঁধেছে।

এবার দীনু পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। দরজাটা বাইরে থেকে অতি সন্তর্পণে টেনে দিল, যেন অতসী শব্দ না পায়।

নির্জন পথ। গাড়ী ঘোড়ার ভিড় নেই। দিনের জীবন্ত রাজপথ রাতের অন্ধকারে শ্মশান হয়ে উঠেছে। কোলাহল থেমে গেছে। ভিকিরীদের করুণ ক্রন্দন শোনা যায় না। অলকাপুরীর উৎসব ঘুমের কোলে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ক্বচিৎ দু-একজন

পথবাসী পথের একদিক থেকে ওদিকে উঠে যায়। ফুটপাথের বুকে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে গৃহহীন ভিকিরীদের শয্যাহীন সুখশয্যা।

রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দীনু একবার উদাস দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে ফুটপাথ ধ'রে চলতে লাগল। বড় রাস্তার মোড়ে দু-একজন পুলিস টহল দিচ্ছে: তন্দ্রালু অবসন্ন পদে পায়চারি করে। গাড়ীবারান্দাগুলোর নীচে পথচারীদের ভিড; যুদ্ধশ্রান্ত নগ্ন সৈনিকদের মত গায়ে গায়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে' আছে।

চলতে চলতে দীনু থমকে দাঁড়ায়। ওদিকের ফুটপাথে কতগুলো ভিকিরী কলরব সুরু করেছে। সবাই মিলে ঘিরে ধরেছে একটা ছোঁড়াকে। একবার মনে হ'ল, কর্ণপাত করবে না; আবার কি ভেবে এগিয়ে গেল ওদের দিকে!—ছোঁড়াটা দীনুর চেনা! অনেকবার দেখেছে তাকে গলায় খাদি বেঁধে পিতৃদায়ের ভিক্ষে করতে। কখন কখন দাঁতে খড় নিয়ে গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত সেধে বেড়ায়। বয়েস চোদ্দ-পনর বেশী নয়।

ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিতে দীনুর দেরী হয় না। এই বয়েসেই জেগেছে প্রচণ্ড যৌনক্ষুধা! ওর অত্যাচারে কানা মেয়েটা অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। মেয়েটা বোধ হয় বয়েসে ওর চেয়ে দশ বছরের বড়। ইচ্ছা হ'ল, ছোঁড়ার মাথাটা খুব জোরে ঠুকে দেয় দেয়ালের গায়ে; খুলিটাকে ভেঙে দু-টুকরো ক'রে ফেলে। কিন্তু পরক্ষণেই কি ভেবে আবার এগিয়ে চলে ফুটপাথ ধ'রে।—মোড়টা ছাড়িয়ে যেতে না-যেতেই সে-কোলাহল আপনি থেমে যায়।

দীনু ভাবে তার জীবনপথের এই সব মৃত্যুহীন মুমূর্ষু সঙ্গীদের কথা। ক্ষুধার্ত, উলঙ্গ, নিঃস্ব মানুষের দল! এরা যেন মৃত্যুঞ্জয় হ'য়ে ব'সে

আছে জগতের পথ রুদ্ধ ক'রে। এরা মরে না, মরবেও না কোন দিন।

হাঁটতে হাঁটতে পা দুটো অবসন্ন হ'য়ে আসে। শরীরের রক্তস্রোত যেন এবার খুব কমে' এসেছে। চেষ্টা ক'রেও পা দুটো আর সামনের দিকে টেনে নেওয়া যায় না। গীর্জার পাশে এসে দীনু একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ায়। স্তিমিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে আকাশের পানে। পাণ্ডুর বিবর্ণ চাঁদ হেলে পড়েছে চূড়ার ওপারে। অবসাদগ্রস্ত তারাগুলো যেন রাত্রিশেষের ম্রিয়মান আলোকে ক্ষীণ হ'য়ে আসে।

ক্ষণেক কি ভেবে দীনু এগিয়ে গেল গীর্জাটার দিকে। একেবারে কাছে গিয়ে দু'হাত দিয়ে অনুভব করে সেই ধবধবে শাদা দেয়ালের শীতল স্পর্শ।—ওপারের ফুটপাথে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছে অনেক ভিকিরী। সারাদিনের ক্লান্তির পর ঘুমিয়ে পড়েছে; ওদের বেদনাতুর নিঃশ্বাস মিলিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারে।—দীনু বসে প'ড়ল পৈঠার একটা পাশে।

ভিকিরীদের শিয়রে শিয়রে ঘুরে বেড়ায় একটা মেয়ে; ওদেরই কেউ। দেহ তার যৌবনের প্রান্তে এসে দাঁড়ালেও, এখনো সীমারেখা ছাড়িয়ে যায় নি। জীর্ণ কাপড়ে লজ্জা ঢাকা পড়ে না। রুক্ষ চুলে জটা বেঁধেছে। গ্যাসের আলোতে এপার থেকেও স্পষ্ট দেখা যায় তার মুখ-চোখ। ওর ওই দেহে হয় ত কিছুদিন আগেও ছিল জীবনের প্রচুর সম্ভাবনা। কিন্তু এবার ভাঙন ধরেছে।

ওদের মাথার কাছে গিয়ে মেয়েটা যেন কাণে কাণে কি বলে! তার গতিভঙ্গী দেখে দীনু উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে

থাকে; অবস্থা দেখে সন্দেহ হয়।—একে একে অনেকের মাথার কাছে ফিরে, মেয়েটা শেষে এলো এদিকের ঘেয়ো ভিকিরীটার কাছে। সে তখনও ঘুমোয় নি। দেহের যন্ত্রণায় ঘুম আসে নি তার চোখে।

কাণের কাছে মুখ নিয়ে মেয়েটা কি বলতেই সে তাড়াতাড়ি উঠে ব'সল কলের পুতুলের মত। শিথানের ছেঁড়া ঝোলা-ঝাঁপির ভিতর থেকে খুঁজে খুঁজে বের ক'রল দু'টুক্রো চাপাটি রুটি!—বোধ হয় ওরই ভুক্তাবশেষ। মেয়েটার চোখে মুখে অতৃপ্ত ক্ষুধার কি লেলিহান দৃষ্টি! ওই উচ্ছিষ্ট রুটির টুকরো-দুটোর দিকে চেয়ে সে মন্ত্রমুগ্ধের মত হাসে; চোখ দুটো যেন ঠিক্‌রে পড়তে চায়।

মেয়েটা ইসারায় আবার কি বলে।

রুটির টুক্‌রো-দুটো কোলের উপর নামিয়ে রেখে, লোকটা এবার ভাল হ'য়ে ব'সল। সর্বাঙ্গে সিফিলিসের ঘা দগ্‌দগ্ করে; নাকটা ব'সে গেছে; চোখের কোণে শাদা শাদা ঘায়ের চটা। তার চেহারা দেখে দীনুর সর্বশরীর শিউরে ওঠে।—এবার ট্যাঁক থেকে দুটো পয়সা বের ক'রে সে মেয়েটাকে দেখায়। মেয়েটার মুখ আরও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। পুরুষটা হাসে, প্রসন্ন হাসির সঙ্গে রুটিটুকু তার হাতে তুলে দিয়ে সযত্নে পয়সা দুটো আবার গুঁজে রাখে ট্যাঁকে!

কি বীভৎস উল্লাস! মেয়েটা সবুর সইতে পারে না। দু'হাতে রুটির টুক্‌রো-দুটো নিয়ে এক মুহূর্তে গুঁজে দেয় মুখের ভিতর। পেটে যেন বিসুভিয়সের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠেছে।

খানিকক্ষণ পরস্পরের মুখপানে নীরবে চেয়ে থাকে; তারপর দুজনেই সরে যায় হাসপাতালের ওপাশে অন্ধকার জায়গাটায়।

দীনু ভাবতে পারে না; আপাদমস্তক ঝিম্‌ঝিম্ করে: 'পেটের জ্বালায় জীবন্ত মানুষের ভিড় জমেছে পথের শ্মশানে।'

কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চেয়ে থেকে উঠে প'ড়ল; রাস্তাটা পার হ'য়ে ফিরে চ'লল ফুটপাথ ধ'রে।

মোড়ের কাছে এসে লাইট-পোস্টটার পাশে দাঁড়াতেই ওর দৃষ্টি প'ড়ল একটী শীর্ণকায় লোকের দিকে। সে যেন ওর দিকেই এগিয়ে আসে। পরনে একখানা জীর্ণ কাপড়, গায়ে ছেঁড়া হাফ্‌-শার্ট, পায়ে জুতো নেই।—হয় ত সবে, এই সবে সুরু হয়েছে! এখনও বোধ হয় আছে ওর ফিরে যাবার পথ। মুখখানা খুব চেনা, তবুও দীনু ঠিক চিনে উঠতে পারে না।

একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চায় ওর মুখপানে। দীনু হঠাৎ অনুমানের উপর জিজ্ঞেস ক'রে ব'সল—'বিমল বোস্?'

লোকটা থতমত খেয়ে গেল। একটুক্ষণ কি ভেবে নিয়ে বলে—'হাঁ। আ—প—আপনি!'

'হাঁ, আমি। আমার কথা যাক্। তোমার সে চাকরিটা গেছে বুঝি? য়ুনিভার্সিটির চাকরিটা!'

'ছেড়ে দিয়েছি। দাদা ষড়যন্ত্র ক'রে চাকরিটা খেয়েছে।'—ব'লে বিমলবাবু হো হো শব্দে হেসে উঠল।

'বেশ। দাদা ষড়যন্ত্র ক'রে চাকরিটা খেয়েছেন: শৈলবালা খেয়েছে ভিটেমাটি; আর পাকস্থলীটা ষড়যন্ত্র ক'রে খেয়েছে বাকী সব;—মান, ইজ্জৎ, মস্তিষ্ক!'—উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দীনু হন্‌-হনিয়ে চলে গেল।

লোকটা বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল ওর দিকে চেয়ে। ইচ্ছা থাকলেও, ডাকবার সাহস বোধ হয় তার হ'ল না।

আবার জমে' ওঠে অবসাদ। ভোরের বাতাসে কন্‌কন্ করে শীত। চলার বেগে দীনু শীতটা কাটিয়ে উঠতে চায়, কিন্তু পারে না; পায়ে পায়ে জড়িয়ে যায়।

পথ-ভিকিরীগুলো নড়ে' চড়ে' হাত-পা গুটিয়ে শোয়। কেউ বা দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে গুব্‌রে পোকার মত তাল পাকিয়েছে শীর্ণ দেহটাকে নিয়ে, কেউ পরনের শতচ্ছিন্ন আবরণটুকু দিয়ে আপাদ মস্তক ঢেকেছে।

দীনু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে। চোখের পাতা ক্লান্তিতে; ভারি হ'য়ে আসে পায়ের শিরাগুলো কেমন আড়ষ্ট হ'য়ে পড়ে। হাত-পায়ের আঙুল টিস্‌টিস্ করে ব্যথায়।

—একটা গেঞ্জি, না-হয় যেমন-তেমন একখানা ছেঁড়া কাপড়ও যদি জড়াতে পারত গায়ে, তা হ'লে ওর মুহ্যমান অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বোধ হয় আবার সচল হ'য়ে উঠত।—আর পারে না; ও পারে না আর এই বিলীয়মান সত্তাকে জোর ক'রে ব'য়ে নিয়ে যেতে।

লাল বাড়ীটার ভিতর থেকে ত্রস্তপদে বেরিয়ে আসে একটী প্রৌঢ়া! হাতে কাপড়ের একটা গাঁটরি। মেয়েটা চকিত দৃষ্টিতে এ-দিক ও-দিক চায়। হয় ত ওদেরই বাড়ীর ঝি। কেউ জাগবার আগে ওর খুঁটিনাটি দরকারের জিনিষগুলো চুরি ক'রে সরিয়ে ফেলছে।

দীনুর ইচ্ছা করে, গাঁটরিটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে,

একখানা ভাল আস্ত কাপড় কেড়ে নেয়। শীত-ভোর গায়ে দিয়ে বাঁচবে। নিজের পরনের কাপড়খানা একবার নেড়েচেড়ে দেখে।—জরাজীর্ণ হ'য়ে গেছে, সুতোগুলো ঢাকা পড়েছে ময়লায়।

মেয়েটা সেই দিকেই আসে; ভীত সন্ত্রস্তপদে এগিয়ে আসে ওরই পথে। মনটা চঞ্চল হয়, হাতদুটো অস্থির হ'য়ে ওঠে।

এলো না, এলো না ওর কাছ পর্যন্ত। কোণের ডাস্টবিনটার ভিতর গাঁটরিটা ফেলে দিয়ে, ভীতিচঞ্চল ক্ষিপ্রগতিতে ফিরে গেল। পায়ে যেন তার অমানুষের শক্তি! নিমেষের মধ্যে চলে গেল দীনুর দৃষ্টিপথ ছাড়িয়ে।

দীনু ভাবে, কিন্তু ভাবনার কোন সূত্র নেই। নিতান্ত অজ্ঞাতসারে স্বপ্নাবিষ্টের মত এগিয়ে যায় ডাস্টবিনটার কাছে। তিলমাত্র ইতস্তত না ক'রে, টেনে তোলে সেই কাপড়ের গাঁটরিটা। ওর শরীরে তখন ফিরে এসেছে অনেকখানি সজীবতা। কাপড়গুলোর স্পর্শ-আকাঙ্ক্ষায় শীতার্ত ত্বক উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছে।

—কতগুলো ছেঁড়া নেকড়া, একখানা কাপড়; রক্তাক্ত! তারই ভিতর তোয়ালে জড়ানো একটি সদ্যোজাত শিশু! দীনু দু' হাত দিয়ে তুলে ধরে চোখের সামনে। ছেলেটা নড়ে! কচি কচি শাদা হাত-পাগুলো তখনও একটু একটু নড়ছে। দীনুর বিশ্বাস হয় না। তুলে ধরে আরও কাছে, একবারে মুখের কাছে নিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে দেখে সেই মোমের পুতুলটা।—বেঁচে আছে, এখনও বেঁচে আছে!

চোখের সম্মুখ থেকে পলকে পৃথিবীটা মুছে যায়। হাত-পা যেন অসাড় হ'য়ে আসে। প্রাণপণ চেষ্টাতেও দীনু নিজেকে সামলে নিতে পারে না। চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। আপাদমস্তক ঠক্‌ঠক্

ক'রে কাঁপে। ওর পেশিতে, স্নায়ুতে, এমন কি হাড়ের মধ্যেও সুরু হয়েছে প্রলয়। সে কম্পনের বেগ দীনু কোনমতেই সহ্য ক'রতে পারল না। সংজ্ঞা লুপ্ত হ'য়ে এলো।—ছেলেটা হাত থেকে খ'সে পড়ে গেল পেভ্‌মেণ্টের পাথরে। দীনু সর্পাহতের মত ঢ'লে পড়ল সেই ডাস্টবিনের ধারে।

তখন ভোর হয়ে এসেছে। ব্যবসাদার বস্তিওয়ালারা অন্ধ-খুলো ভিকিরীগুলোর হাত ধ'রে এনে বসিয়ে দিয়ে যায় রাস্তার মোড়ে। কোনটাকে টবের গাড়ীতে বসিয়ে টানতে টানতে এনে গড়িয়ে দেয় ফুটপাথে। তাদের বেদনার্ত করুণ কাৎরানি ভোরের অলস বাতাসে মিলিয়ে যায়।

৩

ব্রততীদের মহলে তেমনি উৎসবের ভিড; কিন্তু ব্রততীর লাল পেয়ালায় জমে মাকালের তলানি। ওর ভাল লাগে না; এক তিলও ভাল লাগে না আর, এই দুর্বিসহ আনন্দে দোল-খাওয়া রাংতার পুতুলগুলোকে। ওদের সরু সুতো আলোর রঙে মিশে আত্মগোপন করে মানুষের দৃষ্টি থেকে, তাই মনে হয় ওরা জীবন্ত। মনে হয়, ওদের যাওয়া-আসার সবুজ পথে ছড়িয়ে আছে কৃষ্ণচূড়ার ঝরা পাঁপড়ি। হাসিকান্নার মহলা-দুরন্ত রূপ লোলুপ ক'রে তোলে দূর পথের যাত্রীকে। কিন্তু ব্রততীর চোখে কখন আপনা-আপনি ধরা দিয়েছে ওদের সেই কৃত্রিম জগৎ।—সে ক্লান্ত হয়ে ওঠে; সইতে পারে না ওই প্রাণহীন জড়পিণ্ডদের চেতনাহীন উল্লাস। মনটা দ্রুতপদে পিছিয়ে আসে; তর্‌তর্ ক'রে নেমে পড়ে ওদের বসন্ত উৎসবের আসর থেকে একেবারে দীনুদের কদর্য বস্তির একটা অন্ধকার ঘরে। চোখের সামনে নিমেষে ভেসে ওঠে সেই অন্ধ ছেলেটা: হয় ত কাঁদছে, চোখের যন্ত্রণায় এখনও ফিঁপিয়ে ফিঁপিয়ে কাঁদে একলাটি প'ড়ে। দীনু সেদিন ছেলেটার কথা বলতে বলতে কান্নায় দিশেহারা হয়ে উঠেছিল।

পেটের জ্বালায়, মানুষ মানুষকে অন্ধ তৈরি করে! ভাবতে ব্রততী শিউরে ওঠে। আতঙ্কে ওর সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে

আসে। মানুষকে বিশ্বাস করতেও যেন এখন ভয় হয়; ঠিক ভয় না হ'লেও, সন্দেহ হয় আগেকার চেয়ে অনেক বেশী।

ও ছিল ভোরের পাখীর মত মুখর। ওর প্রভাতী গানে ক্ষণে ক্ষণে সজীব হয়ে উঠেছে স্যার সি. কে'র জীবনের পরিস্থিতি। ঐশ্বর্যের পরিবেশে সমুজ্জ্বল ওদের স্বতন্ত্র জগৎ—যেখানে চেনা-অচেনার সমারোহে ওর জীবন সূর্যমুখীর মত এক একটি ক'রে বিকশিত করেছে সোনালি শতদল, সেখানে আজ ব্রততী নিপীড়িত বন্দীর মত হাঁপিয়ে ওঠে। স্যার সি. কে. এখন আর চেষ্টা ক'রেও ফিরিয়ে আনতে পারেন না ব্রততীর সেই দিগন্তপ্রসারী সজীবতা।

কথা বলতে বলতেও যেন ব্রততী কেমন উন্মনা হয়ে পড়ে। ওর অভ্যস্ত সুরটুকু এমনভাবে হারিয়ে যায় কথার মাঝখানে যে, নতুন বান্ধবী শিপ্রাও বিস্মিত দৃষ্টিতে মুখপানে চেয়ে বলে—'তোমার কি ইনার্সিয়া এসেছে তাতু?'

ব্রততী সজাগ হয়ে ওঠে; একটু না হেসে পারে না—'ইনার্সিয়া ঠিক নয়, রিভ্যুলেট্! বরং বলতে পারো—ফিলিয়া।'

শিপ্রা হেসে ওঠে।—'ফিলিয়া?'

'হাঁ।'—ব্রততী আবার তেমনি একটু হাসে! হাসিটা যেন কেমন নিষ্প্রাণ; বিকাশ আছে, অথচ রূপ নেই।

'অটো-ফিলিয়া বুঝি? নইলে, তোমার ভালবাসা লাভ করবার মত ভাগ্যবান কেউ আছে ব'লে ত মনে হয় না। শুধু নেই কেন, অনাগত ভবিষ্যতেও হয় ত থাকবে না কেউ।—অবশ্য এটা আমার অনুমান।'

ব্রততী একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শিপ্রার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ

ক'রে এক নিশ্বাসে বলে—'হোক না অনুমান ; তবুও সত্যি। শিপ্রা, যে সত্যিকারের সাপুড়ে, সে ঢোড়া সাপ নিয়ে খেলা ক'রে আনন্দ পায় না কখনও। আনন্দ কেন, প্রবৃত্তিই হয়ত আসে না তার। একটা জাতসাপের খোলস দেখলে যে কৌতূহল মনে জেগে ওঠে, একশোটা ছেলে সাপের বাচ্চা দেখেও সে কৌতূহল তার জাগে না কোন দিন।'

'খোলসের সন্ধান কি পেয়েছ তাতু? আনাচে-কানাচে খুঁজে দেখবার অন্তত কোন ইঙ্গিত?'

'পাই নি। তবে খুঁজবার নেশাটা যেন রাতারাতি কেমন পেয়ে বসেছে। ফিলিয়া যদি কিছু এসে থাকে, সেটাকে 'লাম্বার' বলা চলে। খুঁজতেই আমি চাই, তোমাদের এই গণ্ডীর বাইরে আমি খুজে নিতে চাই পৃথিবীর ওই অপরিচ্ছন্ন জনস্রোতের ভিতর থেকে সত্যিকারের একটি মানুষ, য়্যান আন্‌কাট্‌ ডায়মণ্ড।'

'কি লাভ, নতুন ক'রে পালিস-দুরস্ত করবার ঝঞ্ঝাট স'য়ে? শেষ পর্যন্ত ইম্‌ন্যাচিওর্‌ হীরেও তো বেরুতে পারে। তার চেয়ে বরং যাচাই-করা জুয়েল্‌ ঢের ভাল।'—শিপ্রার দৃষ্টি কুটিল হয়ে ওঠে।

ব্রততী তেমনি হেসে জবাব দেয়—'ব্যানার্জীকে তো দিয়েছি ট্রায়াল।'

'ট্রায়াল!'

'তা ছাড়া আর কি? আমি জানি, তিনি টিক্‌বেন না শেষ অবধি। তবুও মান রক্ষে ক'রব বাবার। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর বন্ধুপুত্রের হাতে অগাধ ঐশ্বর্য তুলে দেবার মিডিয়াম্‌ করবেন

আমায়। মিডিয়াম্ দিয়ে প্রেতাত্মাকে প্ল্যান্‌চেট করা চলে, কিন্তু মানুষ বা দেবতাকে করা চলে না, এটা ত ঠিক।'

'কিন্তু, তুমিই ত নিজে য়্যাক্‌সেপ্ট করেছ তাঁর প্রোপোজাল্।'

'করলুমই বা। প্রোপোজাল্ য়্যাক্‌সেপ্ট করা মানেই ত নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করা নয়। হাতের কাছ থেকে যখন মানুষ স'রে যায় দূরে, তখন তার ফসিল্-টাই হয়ে ওঠে পূজোর আধার। সেই ফসিল্ নিয়ে যে জীবন গ'ড়ে তোলা চলে না, সে কথা তুমিও জান, আমিও জানি।'

শিপ্রা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে—'ওঁদের তুমি ফসিল্ বল?'

'তা ছাড়া, আর কি বলা চলে? আছে ত শুধু অবয়বটা। ভিতরের মানুষ যে কতকাল আগে মিলিয়ে গেছে, ওই ফসিলেরা নিজেও রাখেন না তার খবর। যাক, ওকথা রেখে দাও। একটা মেয়েলি-পুরুষের লাগাম ধ'রে যে আনন্দ, তার চেয়ে পুরনো একখানা ভাঙা বেবি অস্টিন ড্রাইভ করার আনন্দ ঢের বেশী। অন্তত ম্যাল্-য়্যাডজাস্টমেণ্ট-এর ভয় থাকে না'—ব্রততী হেসে ওঠে।

'সাবাস্ ভাতু! এবার সত্যি হাসালে তুমি। মেয়েলি-পুরুষের চেয়ে ভাঙা বেবি অস্টিনও ভাল, একথা অন্য দেশের মেয়েরা বলতে পারে, কিন্তু—'

'কিন্তু নয়, দরকার হ'লে এ দেশের মেয়েরাও পারে। তবে, পুরুষের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া যাঁরা জীবনে দ্বিতীয় কোন পরিণতি ভাবতে পারেন না, তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। ক্লিন শেভ্‌ড্ ছোটখাট একটী মোলায়েম পুরুষ যখন ঠাণ্ডা গলায় দুটো গজল গেয়ে বা হাতের চেটো উল্টে মেয়েলি ঢঙে ভাবের আমেজ

দেবার চেষ্টা করে, তখন তাকে দেখে আত্মসমর্পণ করবার প্রবৃত্তি কোন মেয়ের জাগে কি-না জানি না। যেটুকু অনুভূতি মনে জাগে, সেটা অন্তত আমার মতে—মমতা। তাতে ক'রে, বড় জোর নিজের হাতে তৈরি দুখানা মাছের কচুরি, না হয়, থিন্-এরোরুট বিস্কিটে মাখানো একটু জ্যাম বা পেয়ারার জেলি সযত্নে হাতে তুলে দেবার বৃত্তি জেগে ওঠাই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক।'—ব্রততী আবার হাসে।

'ব্যানার্জীকে তুমি নিশ্চয়ই পার না সেই ক্যাটিগোরিতে ফেলতে।'

'পারি না ব'লেই ত কন্‌ডিসেণ্ড করেছি।'

'কন্‌ডিসেণ্ড ?'

'হাঁ। বাইরের চাহিদা আমার কম শিপ্রা, তাই বাইরেটা দেখে আমি পারি না ষোল আনা অনুমোদন করতে। আমি খুঁজি মানুষ। মানুষকে আমার বড্ড ভাল লাগে শিপারিন্। মানুষ, অন্তত পুরুষ হবে বজ্রের মত তীব্র অথচ স্নিগ্ধ। কালো মেঘের অন্তরালে বাষ্পসজল পরিবেশ তার পুরুষত্বকে ভিজিয়ে দিতে পারবে না। যে পুরুষ, সে জীর্ণ অনশনক্লিষ্ট হ'লেও তার পুরুষত্ব বেঁচে থাকে ইলেক্‌ট্রিক চাবুকের মত। তেলচিট-ধরা লয়েন্ ক্লথ-এ পার্সোনালিটি তার চাপা পড়ে না কোন দিন।'—কথা বলতে বলতে ব্রততী আবার কেমন উন্মনা হয়ে যায়।

শিপ্রা আপনমনেই বলে—'ওটা তোমার পার্‌ভার্সন তাতু, তুমি বোধ হয় নিজেই জান না, কি চাও!'

'তা হবে।'

'হবে নয়, তা-ই।' শিপ্রা উৎসুক দৃষ্টিতে ব্রততীর মুখপানে চায়।

ব্রততী কি ভেবে নিয়ে বলে—'নিজের কথা অতখানি ভাববার অবসর আমি পাই না শিপ্রা। আমার ভাল লাগে না; নিজেকেও যেন ভাল লাগে না আর। হয় ত ভাববে, ইনার্‌সিয়া কিংবা কম্‌প্লেক্স; কিন্তু মোটেই তা নয়। ঐশ্বর্য আমার সত্যি ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, পৃথিবীর অসংখ্য লোককে বঞ্চিত ক'রে কেড়ে নিয়েছি তাদের মুখের গ্রাস। সেই কেড়ে-নেওয়া অন্নের এককণা ফিরিয়ে নেবার জন্যে তারা হাত পেতে কাঁদে আমাদের দরজায় দরজায়। সেই কান্নার সুর যোগাতে, মানুষ মানুষকে তৈরি করে অন্ধ। দুগ্ধপোষ্য শিশুর চোখ উপড়ে দেয় লোহার কাঁটা দিয়ে—'

শিপ্রার চোখদুটো আরও প্রখর হয়ে ওঠে। সে বোঝে না; ব্রততীর কথার একবিন্দুও প্রবেশ করে না তার মগজে। কিন্তু এটুকু অক্লেশে অনুমান করে, তাতুর জীবনে কোথাও যেন সুরু হয়েছে বিপ্লব। তার প্রচণ্ড আঘাতে ওর সতেজ অনুভূতিগুলো থেকে থেকে জ্বলে উঠছে। ওর বসন্তের শেষে শাখায় শাখায় লেগেছে দৈবাৎ শীতের ছোঁয়া।—ওদের কথা শেষ না হতেই বেয়ারা এসে খবর দিল যে, বাইরের ঘরে দীনু এসেছে।

'দীনু?'—শিপ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

ব্রততী একটু থেমে বলে—'ভিকিরী বললে অপমান করা হয়, একটি বাউল।'

'বাউল! ভাল গাইতে পারে বুঝি?'—শিপ্রা যেন কিছু করবার চেষ্টা করে।

'বাউল আখ্যার সঙ্গে, ভাল গাইতে পারার কি কোন অচ্ছেদ্য অভিধান আছে, শিপার ?'

'না, ওটাও আমার ইন্‌ফারেন্স। ওই ধরণের কিছু একটা বিশেষ গুণ না থাকলে, মিস্ রায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার কোন সম্ভাবনা ছিল না ; কাজেই ইন্‌ফারেন্স-এর ডেটা-ও আছে।'—শিপ্রা হাসে। শুধু কথাটুকু বলার আত্মপ্রসাদ ছাড়া হয় ত কিছুই ছিল না সে হাসিতে।

তবু ব্রততী বলে—'হাসলে যে ? ওরা কাঙাল ; পথ-ভিকিরী না হ'লেও—ভিকিরী। কিন্তু ওই দীনুকে দেখলে আজও স্পষ্ট মনে হয়, ভিকিরী হওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না ব'লেই, বোধ হয় ও হয়েছে ভিকিরী। নইলে—'

'নইলে হ'ত বংলা দেশের একজন লিডার, কিংবা ওই রকম বড় একটা কিছু ?'—শিপ্রার কথায় কেমন একটু শ্লেষ ; ঠিক প্রচ্ছন্ন না হ'লেও প্রকট নয়।

ব্রততী ঈষৎ তপ্ত সুরে বলে—'লিডার না হ'লেও ভিকিরী হ'ত না সে। নিজের দারিদ্র্যকে নিয়ে ও এতটুকুও বিব্রত নয় ; বরং অদ্ভুত তার অহংকার। ওর দারিদ্র্যের অহংকার তোমার আমার যৌবনের অহংকারকেও ছাপিয়ে যায় শিপারিন্। সেই অহংকারের প্রচণ্ড আঘাতে আমাদের ঐশ্বর্যের দেমাক্ হাজার বাতির ঝ্যাণ্ডে-লিয়ারের মত ঝন্‌ঝন্ ক'রে ভেঙে পড়ে।'

'আশ্চর্য !'

'মোটেই নয়। নিতান্ত অদৃষ্টের বিপাকে কাঙালের ঘরে তার জন্ম, তাই ব'লে সে নিজে নয় একটি পয়সারও কাঙাল। কোথাও

ওকে দেখে অবধি শুধু এই কথাই আমার মনে হয়েছে যে, কাঙাল হওয়া হয় ত ওর জীবনে একটা অপরিহার্য অভিশাপ। নয় ত, ঐশ্বর্যের বিরুদ্ধে জীবন্ত রিবেল্ হয়ে দেখা দিয়েছে ও।'

'ঐশ্বর্যের বিরুদ্ধে সে রিবেলিয়ন করুক তাতু, তার ভয় আমি করি না। কিন্তু তোমার জীবনেও যেন বিদ্রোহের সূচনা করেছে ব'লে মনে হয়।'—উত্তরের আশায় শিপ্রা সকৌতুক দৃষ্টিতে ব্রততীর মুখপানে চায়।

ব্রততী বেশ শান্তভাবেই বলে—'বিদ্রোহের সূচনা করুক, আর না করুক, অনন্ত একটা নতুন জগতের সঙ্গে যে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছে ওই দীনু, সেটা আমি অস্বীকার করব না কোন দিনই।'

শিপ্রা হেসে জবাব দেয়—'আমরাও ব'লব না কোন দিন অস্বীকার করতে। বরং মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখব; তুমি হবে তোমার সেই নতুন জগতের ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল, আর দীনু—'

কথা বলতে বলতে ওরা দুজনেই নীচে নেমে এলো। দীনু তখনও দাঁড়িয়ে বাইরের ঘরের সামনে।

এবার দীনু অনেক দিন পর এসেছে। চেহারাটা ওর বদ্‌লে গেছে। লম্বা লম্বা রুক্ষ চুল আর একমুখ দাড়ির আওতায় মুখখানা যেন হয়ে গেছে অত্যন্ত গম্ভীর। চোখ দুটো আগুনের শিখার মত প্রখর হয়ে উঠেছে। হেঁট মুখে মাটির দিকে চেয়ে থাকলেও, দৃষ্টি চাপা থাকে না; ভ্রূর ফাঁক দিয়ে ছাপিয়ে ওঠে তার ঝলক।

'দীনু! ব্রততী থম্‌কে দাঁড়ায়।

অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। এরা সত্যি যেন আর এক

জগতের মানুষ। ওদের সর্বাঙ্গে অতীত মানুষের ছাপ; তারই ভাঁজে ভাঁজে পড়েছে বর্তমানের ভাঙাগড়ার দাগ।

শিপ্রা ব্রততীর চেয়েও আধুনিক। ও শাড়ি পড়ে না; দামী পাড়-বসান পেটি-কোটের উপর জড়িয়ে নেয় পাঁচ-হাত একখানা ভিনিসিয়ান ওড়না; ক্লিপ-গাঁথা রেশমি চুলের গোছা দুলিয়ে দেয় চিবুকের পাশ দিয়ে। ওর ফিরোজা রঙের ব্লাউজ ভেদ ক'রে দেখা দেয় স্কিন্-কলারের কর্সেট। হাতে ছোট্ট একটি জাপানী ছাতা, অন্য হাতে লিজার্ড-চামড়ায় ওরিয়েন্টাল ছবি এমবস্-করা একটি নতুন ডিজাইনের ভ্যানিটি ব্যাগ। হাসির সঙ্গে ওর হিল-তোলা জুতোর এমন একটা সঙ্গৎ বাঁধা যে, হাস্য-কৌতুকের প্রত্যেক ভঙ্গীমায় হিলের শব্দটা ঠিক সমানে তাল দিয়ে যায়।

সযত্নরচিত পরিচ্ছদ সম্পর্কে যেন ও ইচ্ছা ক'রেই উদাসীন হয়ে থাকে। হয় ত নিজেই জানে না শিপ্রা, এ বেলা ওর ওড়নার কি রঙ।—কিন্তু দীনুর দিকে চেয়ে, আজ সে আপনা-আপনি সজাগ হয়ে উঠল। শিপ্রা সংকুচিত হয়ে পড়ে; ওর পরিচ্ছদ নিতান্ত অকারণ ওকে বিব্রত ক'রে তোলে দীনুর সামনে। এমন অস্বস্তি ও আর কোন দিনও অনুভব করেনি। মনে মনে শিপ্রা বার বার আবৃত্তি করে—পথ-ভিকিরী না হ'লেও দীনু ভিকিরী; হ'লই বা ব্রততীর মতে একটা ডাইনামিক্ পার্সোনালিটি। ভিকিরীর আবার পার্সোনালিটি! একটা পয়সার জন্যে যারা রাস্তার লোকের পায়ে ধরে?

ব্রততী দীনুর সঙ্গে কথা বলবার আগেই শিপ্রা বিদায় নিয়ে চলে' গেল।—দীনু তেমনি নির্বাক দাঁড়িয়ে; ব্রততী কই।

বলবার চেষ্টা করে, কিন্তু ভেবে উঠতে পারে না প্রথম আলাপের জিজ্ঞাস্যটা। দ্রুতপদে ফটকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শিপ্রা শঙ্কিত দৃষ্টিতে ফিরে চায়; মনে হয়, দীনুর ওই ক্ষুধিত দৃষ্টিতে বুঝি হঠাৎ দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠবে ওর স্কার্ট—ওর ভিনিসিয়ান ওড়নার হাল্‌কা আঁচল!

ওদের সম্পর্কে নতুন ক'রে কোন কথা জানবার না থাকলেও, ব্রততীর ইচ্ছা হয়—জিজ্ঞেস করে একবার সেই অন্ধ ছেলেটির কথা। কিন্তু সাহস হয় না, পাছে দীনু সেদিনের মত আবার বিগড়ে যায়। ছেলেটার কথা বলতে বলতে সেদিন যেন দীনুর চোয়ালের হাড় দু'খানা লোহার এঙ্গেলের মত শক্ত হয়ে উঠেছিল; মনে হচ্ছিল, ওর দাঁতে দাঁতে আঘাত লেগে চকমকির মত আগুনের ফিন্‌কি ছুটবে।

ব্রততী জোর ক'রে একটি টাকা গছিয়ে দিল। দীনু টাকা চায় না; এমন কি, একটা পয়সারও আর দরকার হয় না ওর। ব্রততীর অনুরোধ না-মেনে পারে না, তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও টাকাটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরে।

ব্রততী হেসে, বলে—'আর ত গান গাও না তুমি। এদিকে আসাও কমিয়ে দিয়েছ। তাই দিলুম; যে ক'দিন বাদ গেছে, মনে কর সেই ক'দিনের পয়সা একসঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ আজ।'

'আমি না এলেও আর পাঁচজন ত এসেছে। পাওনা হিসাবে ওদের আর আমার পাওনায় তফাৎ নেই কিছু। ভিকিরীকে দেবার ... জনকে দিলেই আর-এক জনের পাওনা শোধ হয়।

কথা বলতে গিয়ে দীনু হঠাৎ কি ভেবে থেমে যায়।

ওর মুখপানে চেয়ে ব্রততী বুঝতে পারে। একটুক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করে—'থামলে যে?'

'বলছিলাম কি'—দীনু ইতস্তত করে।

'বল।'

'আপনি ইচ্ছে করলে অনায়াসেই হয়। সবারই পাওনা রোজ রোজ খয়রাৎ না ক'রে যদি একসঙ্গে একদিন শোধ করেন ওদের ঋণ, অমনি ভিকিরী অনেকে আশ্রয় পায় সারাটা জীবন।'—দীনু যেন অতি কষ্টে কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেলল।

ব্রততী ওর কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে নি। ঈষৎ বিস্ময়াবিষ্টের মত চুপ ক'রে থেকে, পুনরায় জিজ্ঞেস করবার উপক্রম করতেই হঠাৎ শিপ্রা ফিরে এলো।

এবার আর দীনু নির্বাক্ দাঁড়িয়ে রইল না। শিপ্রা ওদের কাছে এগিয়ে আসবার আগেই, সে ব'লে উঠল—'যারা অক্ষম, তারা ভিক মেগে মেগে রাস্তায় গড়িয়ে বেড়ায়, আশ্রয় নেই ব'লে। আর আমার মত যে সব ভিকিরী লোকের দরজায় হাত পাতে, তারা বেকার। খাটতে চাইলেও, কেউ খাটায় না। তা হোক্, তবুও তাদের আশ্রয় আছে। কিন্তু এত বড় দেশে ওই অসহায় কানা-খোঁড়াগুলোর মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই নেই!'

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে দীনু দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল ব্রততী স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পথপানে।

শিপ্রা ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে তাতুর পাশে।—'আ- ফিরে আসতে হ'ল ব্রতী!'

'এসো।'—দীনুর কথাগুলো রিমঝিম করে ব্রত[illegible]

ভিতর; এত বড় দেশে ওদের মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই একটু! একটা অনভ্যস্ত অনুভূতিতে মনটা বারবার সজল হয়ে ওঠে।

'এক্‌জাক্টলি হোয়াট ইউ সেইড্ তাতু!'—একটু থেমে শিপ্রা আবার বলে—'লোকটা অদ্ভুত।'

'হুঁ।'—ব্রততী আর কোন উত্তর দেয় না।

ওরা দুজনেই যাচ্ছিল ব্রততীর পড়ার ঘরের দিকে; হঠাৎ গেটের ভিতর মোটরের হর্ন শুনে থম্‌কে দাঁড়াল।

একটু পিছিয়ে ফিরে দাঁড়াতে না-দাঁড়াতেই চঞ্চল পদে সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন ডাক্তার অধিকারী।—'গুড ডে মিসেস্!'

ব্রততী অভ্যর্থনা জানাবার আগেই ডাঃ অধিকারী ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে ব'লে উঠলেন—'কে বেরিয়ে গেল বলুন ত, এক্ষুণি—এই মাত্র? ছেঁড়া ময়লা কাপড়-পরা, লাইক্ এ বেগার্?'

অধিকারীর মুখচোখের দিকে চেয়ে ব্রততী হঠাৎ থতমত খেয়ে বলে—'ভিকিরী,—একজন বাউল। আগে গান গাইত; এখন এম্‌নি ঘুরে বেড়ায়।'

'আই ডোণ্ট বিলীভ্। হি ইজ্ সেন—নিশ্চয় মিঃ সেন।'—ডাক্তার অধিকারী চঞ্চল হয়ে ওঠেন। কথা বলতে ওঁর কণ্ঠস্বর যেন কেঁপে ওঠে।—'মোটরটা থামবার আগেই ও তাড়াতাড়ি সরে' পড়েছে। আই রিকগ্‌নাইজ্‌ড্ হিম্ রাইট্। হতে পারে [illegible]।—কিছুতেই হতে পারে না আমার ভুল। গাড়ীটা থামিয়ে [illegible]ন [illegible]দিকে চাইলাম, তখন পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়েছে কোন [illegible]তে কিংবা আর কোথাও।'

[illegible]কারীর কথা শুনে ওরা দুজনেই হতভম্ব হয়ে যায়। ঠিক

বুঝে উঠতে পারে না ওঁর বক্তব্যের আগাগোড়া। ব্রততী বিস্ময়টা কাটিয়ে উঠবার পূর্বেই শিপ্রা সকৌতূহলে জিজ্ঞেস করে—'হুম্ ইউ মীন্ ডক্টর্ ক্যারী ?'

'আই মীন্ সেন—সত্যেন সেন, যিনি ছিলেন আপনাদের চেরি ক্লাবের সেক্রেটারী, সবুজ সঙ্ঘের ফাউণ্ডার-প্রেসিডেণ্ট।'

ব্রততী চম্‌কে ওঠে—'সত্যেন সেন !'

'একজাক্টলি। এই মাত্র বেরিয়ে গেল এ বাড়ী থেকে। মাথায় একরাশ রুক্ষ চুল, পরনে ছেঁড়া নেকড়া, মুখে দাড়ি !—একটা অভিশপ্ত জীবন, য়্যান্ অ্যান্‌ফর্‌চ্যুনেট্ এঞ্জেল্ !'

'এঞ্জেল্ !'—শিপ্রা কপালটা কুঁচকে বলে—'চোখে না দেখলেও, শুনেছি সব ডক্টর ক্যারী, তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল। হি ডিফাল্‌কেটেড্ ব্যাঙ্ক মানি: য়্যাণ্ড ইজ্ নাউ রীপিং দি কন্‌সিক্যুয়েন্স। সেই ফলই তা হ'লে এখনও ভোগ করছেন। সেদিনও স্বরেখাদি বলছিল—'

'স্বরেখাদি ?' ডাক্তার অধিকারী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন শিপ্রার মুখপানে।

'হাঁ, স্বরেখা খাণ্ডেলওয়াল।'

'খাণ্ডেলওয়াল ! দ্যাট্ মিস্ মজুমদার ?—এ স্যাক্রিলেজিয়স্ ভাল্‌চার্। তার কথা মনে হ'লে দিন অপবিত্র হয়।'

ডাক্তার অধিকারী আবার এগিয়ে চললেন গেটের দিকে। ব্রততী ও শিপ্রা কতকটা মন্ত্রমুগ্ধের মত চলল তাঁর পি... ...ায়... ব্রততী যেন কেমন নন্‌প্লাস্‌ড্ হয়ে গেছে।

চলতে চলতে ডাক্তার অধিকারী আপন মনেই

হ্যাজ্ বীন্ ডিউপড্ অল-থ্রু। রিয়েলী এ গ্রেট্ সোল্। বাঙালীর ছেলের অতবড় হৃদয় আমি দেখিনি আর। আমার সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা তার কোন দিনই ছিল না। তবু, বিলেত যাবার সময় এক কথায় সে আমায় সাহায্য করেছে তিন হাজার টাকা। তখন সে ব্যাঙ্কের চাকরি নেয় নি।'—চাপা দীর্ঘশ্বাসে অধিকারীর ঠোঁট দুখানা কেঁপে ওঠে।

ব্রততী একটু থেমে জিজ্ঞেস করে—'অবস্থা ওঁর ভাল ছিল বুঝি?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি যখন ফিরলাম ইংল্যাণ্ড থেকে, তখন ও রিক্ত; শুনলাম, জেল থেকে বেরিয়ে অন্তর্ধান করেছে কোথায়। কেউ কেউ বলেছিল—হয় ত বেঁচে নেই; সুইসাইড করেছে। সেই সম্ভাবনাই ছিল বেশী। অতবড় ট্রাজেডি মানুষ সইতে পারে না।'

গেট ছাড়িয়ে ওরা এলো রাস্তায়। কিন্তু কোথায় দীনু! মহানগরীর জনস্রোতে ও তখন কোথায় মিলিয়ে গেছে। ডাক্তার অধিকারী হঠাৎ ব্রততীর দিকে মুখ ফেরাতেই দেখলেন, তার মুখখানা কেমন শক্ত হয়ে গেছে; চোখে একফোঁটা রক্তও যেন নেই।

দুপুরটা কাটতে চায় না। নিতান্ত অন্যমনস্কভাবে দীনু ধীরে ধীরে এসে বসল পার্কের একখানা বেঞ্চে। ওর অতীতের রুদ্ধ দ্বারে আজ অকস্মাৎ যে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে, তার জেরটা কোন রকমেই [illegible]উঠতে পারে না। মণি অধিকারীর মোটরখানা যখন [illegible] এসে পড়ল চোখের সামনে, তখন নিমেষে ওর পা থেকে [illegible] হয়ে গেল বিমূঢ়তায়।—মণি ফিরেছে বিলেত থেকে

ডাক্তার হয়ে!—নতুন একখানা হিলম্যান কিনেছে; নিজেই ড্রাইভ করে!

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে দূরে ঠেলে নিয়ে, ও করেছে মণির দৃষ্টিপথ থেকে আত্মগোপন। কিন্তু সেই আকস্মিক উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া এখনও অবসাদের মত জমে আছে দীনুর প্রত্যেকটি ভঙ্গীতে। মণি অধিকারী থেকে আরম্ভ ক'রে, ওর অতীত-পথের প্রত্যেকটি মাইলস্টোন, এমন কি, দৈনন্দিন খুঁটিনাটির অগভীর রেখাগুলি পর্যন্ত যেন পলকে পিল পিল ক'রে উঠল মগজের ভিতর।—মণি, তড়িৎ, তপন, সুরেখা, মঞ্জরী, টেম্পল্ হোটেল, চাংওয়াহ্, ডমিনিয়ন, এম্পায়ার, গার্স্টিন প্লেস্,—গ্রে-ক্রহাম্, ক্যামেরন!—কপালের শিরা দুটো টিপে ধ'রে দীনু একবার মস্তিষ্কের রক্তপ্রবাহটা দেখে নেয়।

পার্কে লোক নেই বললেই চলে। ক্বচিৎ দু-একজন যায়-আসে। কেউ বা এদিকের ফটক দিয়ে ঢুকে বেরিয়ে যায় ও-পাশের চরখি গেটের পাশ দিয়ে, হয় ত চলার পথে বাইরের রাস্তাটা সংক্ষেপ করে। কোণে গাছতলার বেঞ্চখানা দখল ক'রে ঘুমচ্ছে একজন হিন্দুস্থানী: কোন আপিসের দারোয়ান কিংবা বেয়ারা, চিঠি জারি করতে বেরিয়ে পথের পরিশ্রমটা একটু লাঘব ক'রে নিচ্ছে।

দীনু পা-দুটো গুটিয়ে একটু আরাম ক'রে বসবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। এতখানি পথ উর্ধ্বশ্বাসে হেঁটে এসে পায়ের গ্রন্থিগুলো যেন কেমন জড় হয়ে গেছে। বাসায় ফিরতে পারলে একটু শুয়ে পড়ত সেই ছেঁড়া মাদুরখানায়। কিন্তু তাও আর ইচ্ছা [illegible] ক। দিনরাত সেই বস্তির অন্ধকার ঘরে ব'সে থেকে, এ[illegible] দায় [illegible] আলো দেখে চোখ দুটো ওর টাটিয়ে ওঠে। পারে [illegible]

জীবনের নির্মম একঘেয়েমি সইতে। অতসী ফেরেনি এখনও; বাসায় আছে হয় ত দু-একটা হুলো ভিকিরী, আর গলাকাটি পদ্ম!

অবসাদে মাথাটা আস্তে আস্তে হেলে পড়ে বেঞ্চের হাতলে। দীনু আনমনে ভাবে ওর বর্তমানের প্রতিটি দিন; গত কাল, আজ আর আগামী কাল। জীবনের ক্যালেণ্ডারে দিনগুলো যেন ঠাসাঠাসি বোনা; কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। সামনের পথে অগণিত দিন পাশাপাশি রেল লাইনের মত একসঙ্গে মিশে অদৃশ্য হয়েছে কোন দূর দিকচক্রে; পিছনের পথে জ্বলছে কতকগুলো লাল আলো, আর থম্‌থম্ করে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। সেই অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ দুটো কেমন ভারি হয়ে আসে।—ট্যাঁক থেকে টাকাটা বের ক'রে দীনু একবার হাতের মুঠোয় চেপে ধরে; নিবিড়ভাবে অনুভব করে সেই প্রাণহীন ধাতুখণ্ডের স্পর্শ। টাকাটা পেয়ে অবধি কেমন একটা অস্বস্তি ওকে মাঝে মাঝে পীড়িত ক'রে তোলে। এক বার, দু বার, তিন বার,—এমনি কত বার টাকাটা ট্যাঁক থেকে বের করে আর নাড়াচাড়া ক'রে আবার গুঁজে রাখে ট্যাঁকে।

তেমনি ক'রে ব'সে থাকতে থাকতে কখন একটু ঘুম আসে চোখের পাতায়। ওর স্বস্তি আর অস্বস্তির নির্বিকল্প সমাধি হয় সুপ্তির ছোঁয়ায়। চোখের উপর থেকে আলোর পর্দা ধীরে ধীরে সরে যায়। ছড়িয়ে পড়ে স্বপ্নের জাল।

[illegible] ভাল লাগে না, তবুও তড়িৎ জোর ক'রে টান্‌তে টান্‌তে [illegible] তপনের গাড়ীখানা সে বাগিয়েছে আজ মস্ত একটা [illegible] ওর নাম শুনে তপন একটুও আপত্তি করে নি।

তড়িতের পিছনে সুরেখা আর রেবা ঘোষ। তড়িৎকে জবাব দেবার আগেই সুরেখা তার অভ্যস্ত হাসির ফিন্‌কি ছড়িয়ে বলে—'আজ ইম্‌প্রিণ্টের শিরোর টিপ। যাবে না তুমি?'

'ডেকিউট, কিউপিড, ক্লেয়ার! সঙ্গে যাবেন মিস্ মজুমদার আর রেবা। এমন শনিবারটা স্পয়েল্ করবে তুমি?'—তড়িৎ টানে ওর হাত ধ'রে।

মোটরে উঠে বসে। তড়িৎ ড্রাইভ করে! তড়িৎ-এর পাশে বসে রেবা, আর পিছনে ওরা দু'জনে পাশাপাশি। ওর হাতখানা কোলে টেনে নিয়ে, সুরেখা আঙুলগুলো নাড়াচাড়া করে। সুরেখার কোলের ভিতরটা কি উষ্ণ! সে উত্তাপের স্পর্শ ওর প্রতিটি লোমকূপ দিয়ে পৌঁছয় হৃৎপিণ্ডে।

শহরের জনপ্রবাহ ছাড়িয়ে গাড়ী এসে পৌঁছল ব্যারাকপুরের প্রশস্ত পথে। এখন আর প্রতি-চক্রক্ষেপে গতি ব্যাহত হয় না! শহরের চেয়ে গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় কম; পরিচ্ছন্ন সমতল পথ; এশফল্টামের ঝকঝকে বুকে ওদের প্রতিবিম্ব যেন চলমান ছায়ার মত কাঁপে!

'সেন!'—সুরেখা বড় বড় চোখ দুটো তুলে চায় ওর মুখপানে। এমনি পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে সে যেন পৃথিবীতে এই প্রথম চাইল! সদ্য ফোটা কুমুদ ফুলের মত চোখের পাতায় পাতায় জড়ানো সজল জড়িমা। ওর ইচ্ছা করে, আস্তে ঠোঁট দিয়ে চেপে ধরে সুরেখার সদ্যস্ফূর্ত চোখের পাতাগুলো।

হাতখানা টেনে নেবার চেষ্টাও করে না; তন্দ্রালু [illegible] মাথাটা হেলিয়ে দেয় কুশানের উপর। চোখে নামে হ[illegible] লঘু ঘুম।

'মল্লিকা আর সেন-রয় ফিরেছে বুধবার বিকেলে। ওদের এন্‌গেজ্‌মেণ্ট ভেস্তে গেছে মন-ভাঙাভাঙিতে।'

'মন-ভাঙাভাঙি ?'

'হাঁ।'

'মল্লিকাকে বাদ দিয়ে শুধু ওর গানটুকু নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকতে পারে অনন্তকাল।'—চোখ দুটো মেলে একবার সত্যেন দেখে নেয় সামনের পথ আর আশ-পাশের নির্জন বাগানগুলো।

সুরেখা ওর হাতখানা বুকের কাছে তুলে নিয়ে বলে—'কাল সাঁ-সুচি স্টেজে হবে মল্লিকার পীরিক্ ডান্স। নতুন স্টেজের উদ্বোধন করবেন কবিগুরু! পরশু হবে অভিনয়,—'তাসের দেশ'। যাবে না? —নিশ্চয়ই যাবে। মল্লিকা জানিয়েছে সাদর নিমন্ত্রণ!'

যাবে; নিশ্চয়ই যাবে ও।—ইমপ্রিণ্টকে টিপ দেবে উইন, আর বাকী তিনটের প্লেস্! জেকিউট, কিউপিড আর ফ্রেয়ার!—অলসতায় চোখ দুটো আবার বন্ধ হয়ে আসে। তড়িৎ-এর মুখ থেকে সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মাঝে মাঝে ভেসে আসে শ্যাম্পেনের মৃদু গন্ধ!

সত্যেন অনুভব করে, দু হাত দিয়ে অনুভব করে এক গোছা নোট, সেই সঙ্গে অনেকগুলো টাকা। ওর দুই পকেটে মুঠো মুঠো সিকি, দু-আনি, আধুলি। বিরক্তিকর কতকগুলো রেজকির বোঝা।

[illegible]লে ভিতরে যাওয়া যায় না। তবুও যায় ওরা দু'জনে: [illegible]রবা বাইরে গাড়ীতে ব'সে থাকে।

স্টার্ট দিয়েছে! ঘোড়াগুলো তীর বেগে এগিয়ে আসে ওদিকের কার্ভ ছাড়িয়ে। সকলের আগে বেরিয়ে আসে জেকিউট! তার পিছনে ফ্লেয়ার আর কিউপিড পাশাপাশি; আরও পিছনে ইম্‌প্রিণ্ট। ইম্‌প্রিণ্টের জকিটা যেন ইচ্ছা ক'রেই রাশ আল্‌গা দিচ্ছে না। কিউপিডকে ছাড়িয়ে ফ্লেয়ার জেকিউটের সঙ্গ ধরেছে। জকিটা নাইস কন্‌ট্রোল্ করে!—কিন্তু ইম্‌প্রিণ্টের জকিটার উপর রাগে ওর আপাদ-মস্তক জ্বলে ওঠে। ইচ্ছা হয়, ছুঁড়ে মারে ওর ঘাড়ে একটা হাণ্টার।

ব্রেভো! বাক-আপ ইম্‌প্রিণ্ট! এবার ছেড়েছে রাশ। ইম্‌প্রিণ্ট মেক আপ করে—চোখের নিমেষে মেক আপ করে। দেখতে দেখতে ছাড়িয়ে গেল সবগুলোকে। ব্রিলিয়াণ্ট গেইট! থ্রিলিং!

গেল! গেল! দর্শকেরা আশঙ্কায় চীৎকার ক'রে ওঠে।—সেভ্‌ড্। গোল্ডকুইনের জকিটা খুব সেভ্‌ড্ হয়ে গেল আজ। —ইম্‌প্রিণ্ট! ইম্‌প্রিণ্ট! ইম্‌প্রিণ্ট উইন করে। ছাট্'স্ ইট্!— উল্লাসে সত্যেনের সর্বাঙ্গ উতরোল হয়ে ওঠে। তড়িৎ ওর পিঠে হাত-থাবড়া দিয়ে বলে' ওঠে—'বাক-আপ বন্ধু, বাক-আপ!'

কোথা থেকে যেন সুরেখা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে ওর গলাটা! কখন্ ঢুকে পড়েছে সে পিছু পিছু।

ওর সর্বাঙ্গে লাগে সুরেখার স্পর্শ! এত নিবিড়, এমন একান্ত স্পর্শ ওর জীবনে এই প্রথম! দেহ মন লালায়িত হয়ে ওঠে।

ঘুম ভেঙে যায়।

দীনু চম্‌কে ওঠে। পার্কে লোক চলাচল বেড়ে [illegible]

হেলে পড়েছে পশ্চিমের আকাশে। মুখে এসে পড়ে অপরাহ্নের রুক্ষ রৌদ্র।

মনটা কেমন গ্লানি আর অস্বস্তিতে ভ'রে যায়। হাতের তেলোটা ঘেমে উঠেছে। ওর হাতের মুঠোয় তখনও রয়েছে সেই টাকাটা।

না, না; ও পারে না সইতে। কোন দিনও পারবে না আর। দীনু গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। গায়ের চামড়ায় কেমন একটা জ্বালা! মনে হয়, সর্বাঙ্গে যেন কেউ জলবিছুটি মাখিয়ে দিয়েছে।

সামনের পুকুরে গাছের ছায়াগুলো কাঁপে। ছোট ছোট ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে বাঁধানো রাণায় চোট খেয়ে।

দীনু টাকাটা একবার চোখের সাম্‌নে তুলে ধরল। বেশ ক'রে চেয়ে দেখে। ধারের দাগগুলোয় নখ দিয়ে শব্দ ক'রে একবার নিয়ে এলো কানের কাছে; তার পর কি ভেবে সেটা জোরে ছুঁড়ে ফেলল পুকুরের মাঝখানে।—ওর স্নায়ুগুলো পারে না, আর সইতে পারে না আস্ত একটা টাকা।

'টুব্' ক'রে ক্ষীণ একটু শব্দ হয়! ঢেউগুলো তেমনি নির্বিকার; জলের ভিতর গাছের ছায়াগুলো যেন ঈষৎ দুলে উঠল একবার। দীনু অবসন্নভাবে আবার ব'সে পড়ে বেঞ্চখানার একটি পাশে। অবচেতন মনে দুঃস্বপ্নের ঝড় ওঠে।

মাণিক পেয়াদার আখড়ায় পুলিস হানা দিয়েছে। ওরা ধরা [illegible] মাণিক, রাধা, পদ্ম, গোলাম, আরও অনেকে।

[illegible] উঠে এসেছে নতুন বস্তিতে। কিন্তু ঠাঁই বদলালেই ত পয় য়ে [illegible] পাল এসেছে ওদের সঙ্গে। পথ তবুও ছিল ভাল। গো[illegible]

এখানে এসে জুটল আবার এক নতুন বিপদ। এরাও অনেকে ভিক্ষে করে; কিন্তু সেটা শুধু দিনের বেলায়। রাতের অন্ধকারে এদের রূপ বদ্‌লে যায়। সকাল থেকে সারাটা দিন এত বড় বস্তিতে পুরুষের সাড়া-শব্দও থাকে না; মনে হয়, মেয়ে-রাজ্য। কালো, মোটা, রোগা, ঘেয়ো—রকমারি ঝি আর বোষ্টুমির দল ভাড়া নিয়েছে এক-একখানা পায়রার খোপের মত ছোট ঘর। মাণিক পেয়াদার মত ঠিকে-ভিকিরীর সর্দ্দার কেউ নেই বটে, কিন্তু আখড়াওয়ালা আছে। তাকে এরা বাবাজী বলে। সে-ই ভাড়া নিয়েছে এদিকের সবগুলো ঘর; তাই থেকে এক-একখানি বিলি করেছে খুচরো ভাড়াটেদের কাছে।

লোকটার নাম শিবু মহান্ত। গোল-গাল মোটা কালো চেহারা; মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের মস্ত একটা টিকি, গলায় কাঠের মালা। তিলক আঁকে না, কিন্তু নেশা করে। বড় তামাকের ছোট কল্‌কে আর সাঁপিখানা ট্যাঁকেই থাকে।

অতসী যেদিন অন্ধ বাপের হাত ধ'রে এসে ভাড়া চাইলে একখানা ঘর, একমুখ হেসে শিবু দেখিয়ে দিল ঠিক ওরই পাশের ঘরখানা। মাসিক ভাড়া সাড়ে তিন টাকা। ভাড়াটা মাসের শেষে একসঙ্গে দিতে হবে শুনে অতসী প্রথমটা সাহস পায় নি। কিন্তু শিবু যখন আগাগোড়া শুনে ওর কথাতেই রাজী হ'ল, তখন অতসীর আপত্তি করবার আর বিশেষ কিছু রইল না। তবে শিবুর চোখ দুটো দেখে গোড়া থেকেই কেমন একটা খট্‌কা লাগল।

অতসী ইতস্তত করে; কোন কথা বলবার আগেই দাঁত বের করে হাসির সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে—'কোন নাকাল হবে না [illegible]

দু'দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে। শিবু মহান্ত থাকতে—ইয়ে কিনা'—আবার হাসে। চোখদুটো ভাঁটার মত ঘোরে।

বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে। সারাটা দিন তেতে-পুড়ে অতসী অতি কষ্টে খুঁজে বের করেছে এই ঘরখানা। রাতের মুখে, এটা ছেড়ে নতুন ক'রে আর-একটা বাসা খুঁজে দেখবার ধৈর্য ওর সত্যি আর ছিল না তখন।

ঘরখানা আগেকার চেয়ে অনেক বড়। তাই কোন রকমে কুলিয়ে যায়। এবার আর অতসী দীনুর জন্যে আলাদা ঘর ভাড়া করে নি। এক পাশে অতসী আর ওর বাবা থাকে; অন্য দিকে দীনুর সেই বিছানা।

দীনু যেন হঠাৎ কেমন বদ্‌লে গেছে। অতসী প্রাণপণ শক্তিতেও তাকে সব দিন আটকে রাখতে পারে না। নিজের খেয়াল-খুশী মত কখনো তিন দিন পড়ে' থাকে সেই ছেঁড়া মাদুরখানায়, কখন বা তিন দিন পরে অতসী সারা শহর খুঁজে ধরে' আনে জোর ক'রে। অতসীর জোরে সে বাধা দেয় না কোন দিন; কিন্তু নিজেকে মাঝে মাঝে এমন ক'রে সরিয়ে নেয় তার নাগালের বাইরে যে, অতসী প্রাণান্ত চেষ্টাতেও ফিরিয়ে আনতে পারে না সেই পোষ-না-মানা দুরন্ত মানুষটাকে।

অতসী কাঁদে। কখন কখন দিনের পর দিন নিঃশব্দে গড়িয়ে [illegible]র্ চোখের জল। উপেন হয় ত বুঝতে পারে সেই আর্দ্রতা; [illegible]ন এড়িয়ে চলে, পাছে ওর বালির ঘর আচম্‌কা ভেঙে [illegible]য়ে [illegible]াকে এতদিন শুধু ফাঁকি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে সে। [illegible]গে[illegible] লক্ষ্য করেছে, অতসী রাস্তার ভিকিরী-ছেলেগুলোকে

কোলের কাছে টেনে নিয়ে আদর করে, তাদের হাতে তুলে দেয় ওর ভিক-মেগে-আনা টুকিটাকি খাবারগুলো।

দীনু যখন থাকে না, অতসীর উপর শিবু মহান্তর নজরটা অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যায়। অতসী বিব্রত হয়ে পড়ে। শিবুর চোখ দুটো দেখলে ওর ভয় হয়। শাদা, লাল আর কালো, তিনটি রঙের অদ্ভুত সংমিশ্রণে চোখ দুটোর চেহারা যেন কেমন বীভৎস হয়ে উঠেছে।

অতসী ভাবে: দুটো সেবাদাসীতে মিনুসের মন ওঠে না। ও যেন কি! মনে হয়, ঘরখানা ছেড়ে দিয়ে অন্য বস্তিতে পালিয়ে বাঁচে; কিন্তু ভরসা হয় না, পাছে দীনু এসে ফিরে যায় সন্ধ্যার মুখে। সারাদিনের উপোস ঘাড়ে ক'রে একবার যদি এসে ফিরে যায় ওর দরজা থেকে, তা হ'লে হয় ত সারা শহর খুঁজেও আর অতসী পাবে না তার দেখা।

দীনুর মাথার কাছে ব'সে এক-একদিন অতসী কথায় কথায় ব'লে ফেলে—'চল আর কোথাও উঠে যাই। ভাল লাগে না এখানে।'

দীনু হাসে। হয় ত বা একটুক্ষণ কি ভেবে অতসীর পিঠের উপর হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলে—'বেশ ত! কিন্তু ভাল কি সেখানেই লাগবে অতসী? ভাল লাগা ত সবারই জন্যে নয়।'

অতসীর দুঃখ হয়। মনে হয়, দীনু বোঝে না [illegible] অভিমানের সুরে বলে—'তোমার কি বল? যখন [illegible] বেড়াও; পথে পথে ঘুরে তোমার ভালই কাটে। [illegible] কাটাই ওই অন্ধ বাপের আড়ালে ব'সে। ভয়ে [illegible]

চোখে যেন ঘুম নেই; সারারাত পায়চারি করে ঘরে আর বাইরে। আমাদের দরজার সাম্‌নে খস্‌খস্‌ করে ওর পায়ের শব্দ।'

'মানুষের পায়ের শব্দে ভয় পাও অতসী? শুনে আমার হাসি পায়।—তোমার দোষ নেই। সারাটা দুনিয়া জুড়ে ওই ভয়! একদল মানুষ শুধু চোখ রাঙাতেই এসেছে পৃথিবীতে, আর একদল তাদের সেই চোখ-রাঙানির ভয়ে হাত পা পেটের ভিতর গুটিয়ে সরে' দাঁড়িয়েছে পথের পাশে। এরা শুধু শিখেছে কাঁদতে; নিজের অন্নমুষ্টি পরের হাতে তুলে দিয়ে, এরা আঁচল পেতে কাঁদে।'—দীনু হেসে ওঠে।

ওর এই বেয়াড়া হাসির অর্থ অতসী কোন দিনই বোঝে না, হয় ত বুঝবেও না আর। ও শুধু হতভম্বের মত চেয়ে থাকে দীনুর মুখপানে।

দীনু আবার হেসে বলে—'কোকেন-খোর দেখেছ অতসী, যারা কোকেনের নেশা করে?'

'না।—ও ঘরের ওই খোট্টা বুড়িটা কি বলে জানো?' কণ্ঠস্বর একটু খাটো ক'রে অতসী ঝুঁকে পড়ে দীনুর কানের কাছে।—'বুড়ি বলে, লোকটা নাকি আগে চালানি কারবার ক'রত।'

'কোকেন?'

'না গো, না। মেয়েমানুষ চালান দিত চা-বাগান আর মরিচ-বনে।' অতসীর মুখখানা শুকিয়ে এতটুকু হয়।

[illegible] দিত, তখন দিত। এখন ত আর দেয় না চালান? দিতে [illegible] পাবে কোথায়?'—একদৃষ্টে অতসীর মুখপানে চেয়ে থেকে [illegible]য়ে [illegible]ঙ্গটা উল্টে দিয়ে বলে—'আচ্ছা অতসী, তুমি পার না [illegible] দিতে?'

দীনুর কথায় অতসী বোধ হয় প্রথমটা আঁৎকে ওঠে ; তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—'আমি ত তোমাকে ধরে' রাখি নি দীনু ! বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাইবই বা কেন ? তুমি পথে পথে ঘুরে বেড়াও, এই নোংরা বস্তিতে তোমার মন তনুছট করে, তা কি আমি বুঝি না ! ভিকিরী হ'লেও আমরা মানুষ, দীনু। তুমি কি মনে কর, এটুকু বুঝবার বুদ্ধিও আমার নেই ?'

দীনু উঠে বসে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে অতসীর মুখপানে। সে দৃষ্টি যেন অতসীর সমস্ত জীবনটাকে নিমেষে ভেদ করতে চায়।—'অতসী !'

অতসী নির্বাক ব'সে থাকে ; মাথাটা ধীরে ধীরে নুইয়ে পড়ে মাটির বুকে। দীনুর সেই ধারাল দৃষ্টি ও সইতে পারে না।

'চুপ ক'রে রইলে যে ?'

'কি বলব ?'

'বলবার কি কিছুই নেই তোমার ?'

'না।'—অতসী মুখ তুলে চায়।

দীনু উঠে দাঁড়াবার উপক্রম করতেই ওর হাতখানা ধরে' অতসী অনুনয়ের সঙ্গে বলে—'রাগ ক'রো না দীনু। আমি ভিকিরীর মেয়ে ; ভিকিরীর মেয়ে হয়ে তোমাকে ধ'রে রাখবার সাহস আমার সত্যি হয় না। কোন দিনও ভাবতে পারি নি যে—'

বলা হয় না। অতসীর চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

উপেন হঠাৎ আড়ামোড়া দিয়ে ঠাকুরদের নাম [illegible] উঠে বসে। দীনু মন্ত্রমুগ্ধের মত আবার ব'সে পড়ে অতসী [illegible]

মুমূর্ষু পৃথিবী

শিবু মহান্ত যেন দীনুকে একতিলও সইতে পারে না। ওকে দেখলেই তার মুখখানা কেমন বিষিয়ে ওঠে। বিদ্বেষে চোখ দুটো মিটমিট করে।—দীনু বোঝে; কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে না।

বস্তির লোকগুলো শিবুকে বাঘের মত ভয় করে। শিবু সারাদিন ঘরে ব'সে থাকে; রাস্তায় বড় একটা বেরোয় না। দুপুরে যখন ব'স্তটা ফাঁকা হয়ে আসে, শুধু কয়েকজন ঝি আর বাঁধা-বোষ্টুমি ছাড়া কেউ থাকে না, তখন যেন শিবুর মূর্তি ফুটে ওঠে সতেজ রূপ নিয়ে। মাঝে মাঝে টহল দেয় বস্তির চারি পাশে, আর মাঝে মাঝে দু'জন সেবাদাসীকে নিয়ে ব্যস্ত হয় কি একটা গোপনীয় কাজে। ওর ঘরের পিছন দিকে রান্নার যে ছোট্ট জায়গাটুকু আছে, সেইখানে ওরা কী যেন করে! দীনু আগেও লক্ষ্য করেছে, কিন্তু তার বেশী অন্ত কিছু তলিয়ে দেখবার অবকাশ হয় নি, হয় ত বা দরকারও ছিল না।

সেদিন সকাল থেকে দীনু চুপটি ক'রে বিছানাতেই পড়ে ছিল। জীবনে এবার সত্যি জমে উঠেছে গ্লানি; বেঁচে থাকার অবসাদ ঘনিয়ে উঠেছে মজ্জায় মজ্জায়। পথও আর ভাল লাগে না; ভাল কেন, কেমন একটা বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়েছে এই বৈচিত্র্যময় পথ, আর প্রবহমান জনস্রোত। তার চেয়ে এই বস্তির অপরিসর ঘরে, ছেঁড়া [illegible]ার বুকেও যেন আছে একটু মমতা; ওকে উৎক্ষিপ্ত করে না; [illegible]টো অসাড় হয়ে আসে না ব্যথায়। বেশ নিশ্চিন্তে সকাল [illegible]ধি নিশ্চল পড়ে থাকে।

[illegible] হয়ে আসে! ওপাশের ঘরে যে ঝি-গুলো থাকে

তারা বোধ হয় দুপুরে ঘুমিয়ে পড়ে, না-হয় বেরিয়ে যায় কাজে। রাতে ওদের চোখে ঘুম থাকে না। সারা রাত কোলাহল করে। মিস্ত্রি, ফেরিওয়ালা, ড্রাইভার—নানা শ্রেণীর লোকের ভিড় জমে ওদের ঘরে। দেশী মদের গন্ধ আর কুৎসিত রসিকতার কলরবে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে আশপাশের লোক। শিবু মহান্ত সরবরাহ করে মদ। দীনু কত দিন চোলাই-এর গন্ধ পেয়েছে এইখানে শুয়ে শুয়ে।

হঠাৎ শিবুর চীৎকার শুনে দীনু উঠে বসে। লোকটা অকথ্য ভাষায় কার উদ্দেশে গালাগালি করে। অথচ কেউ প্রতিবাদ করে না তার সেই কদর্য উদ্‌গীরণের। নিশুতি দুপুরে শিবুর ওই বেয়াড়া গালাগালির কোন অর্থ দীনু ভেবে উঠতে পারে না। একবার মনে হ'ল ওকে লক্ষ্য ক'রেই বুঝি শিবু বিদ্বেষের ঝাল মিটাচ্ছে। কিন্তু কেন?...দীনু আস্তে আস্তে দরজার পাশে এসে মুখ বাড়িয়ে দেখে।

আশ্চর্য! শিবুর সেই যমদূতের মত চেহারাটা নিমেষে কেমন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। চোখের দৃষ্টিতে সে প্রখরতা নেই। বক্‌বক্‌ ক'রে আপনমনে অজস্র গালাগালি দিয়ে চলেছে, আর ন্যাতা দিয়ে মুছে বেড়াচ্ছে চালাঞ্চির পানের পিক্। বস্তিরই কেউ, কিংবা কারো দুপুরের খদ্দের বোধ হয় পান খেয়ে পিক্ ফেলেছে শিবুর ঘরের সামনে। কিন্তু তাই নিয়ে শিবু অমন করে কেন? ফেললেই বা ওখানে পানের পিক্; উঠানের একপাশে চালাঞ্চির ওই নর্দমায় কি দরকা[illegible] আছে শিবুর! [illegible]

দীনু অবাক্ হয়ে চেয়ে থাকে। শিবু যেন ভী[illegible] উঠেছে। সন্দিগ্ধ চকিত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক চায়, [illegible] ন্যাতাটা জলে ভিজিয়ে এনে মুছে দেয় সেই পানের দ[illegible]

গালাগালি শুনে পুঁটি আর বিন্দুবাসিনী—দুজনেই বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। বিস্ময়টুকু কাটিয়ে উঠতে দীনুর দেরী হ'ল না। ও সহজেই অনুমান ক'রে নেয় যে, লোকটা ক্রিমিন্যাল…খুনে। রক্তের দাগ বা ওই রকম কিছু দেখলেই ওর মাথাটা বিগ্‌ড়ে যায়। ও সইতে পারে না। ওর ওই প্রচণ্ড পৌরুষ নিমেষে মূর্ছিত হয়ে পড়ে। পানের পিক্ দেখেও বলিষ্ঠ দেহটা ভয়ে পঙ্গু হয়ে আসে।

সেই সন্ধ্যাতেই শিবুর ঘরভাড়া মিটিয়ে ওরা আবার উঠে গেল অন্য বস্তির সন্ধানে। দীনু এক রকম জোর ক'রেই নিয়ে গেল অতসীকে। ওর কাণ্ড দেখে কোন কথা জিজ্ঞেস করবারও অবসর পেল না সে। তা ছাড়া, দীনু যে অতসীর উপর এমনি ক'রে জোর করবে কোন দিন, একথা অতসীর স্বপ্নের অগোচর ছিল। ওর সারা মন ভ'রে উঠল অকারণ আনন্দের প্রাচুর্যে।

*   *   *   *

ব্রততীর জীবনে যে পরিবর্তন দ্রুত প্লাবনের মত এসে পড়েছে, স্যার সি. কে. প্রাণপণ চেষ্টাতেও তার গতি রোধ করতে পারেন নি। ওঁর গণ্ডী ছাড়িয়ে তাতু যেন দেখতে দেখতে অনেক দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। সে মানে না আভিজাত্যের শাসন, চায় না ঐশ্বর্যের উর্বর মাটিতে স্বচ্ছন্দে জীবনের শিকড়গুলো ছড়িয়ে দিতে। প্রথম প্রথম স্যার সি. [illegible] মনে হয়েছিল, হয় ত ওই মণি অধিকারীই তাতুর জীবনে এই [illegible] দিয়েছে। কিন্তু সে ভুল তাঁর তাতুই ভেঙে দিল।

[illegible] ক্লাবের চাঁদার খাতায় স্যার সি. কে. যেদিন দশ হাজার [illegible] জমা দিয়ে, তাতুর হাতে এনে দিলেন মেম্বারশিপের

কার্ডখানা। বাপের মুখপানে চেয়ে তাতুর চোখদুটো যেন ধ্বক্ ক'রে জ্বলে উঠল।—'বাবা!'

ব্রততীর কণ্ঠস্বরে স্যার সি. কে. ভয় পেয়ে গেলেন! অপরাধীর মত কার্ডখানা ওর সামনে থেকে তুলে নিয়ে বললেন—'ওরা যে বলছিল, তু-ই ওদের প্রধান নেত্রী।'

'আমি?' ব্রততীর শরীরটা উত্তেজনায় ঝাঁকিয়ে ওঠে।

'হাঁ। তোর কল্পনাকেই ওরা নাকি আজ বাস্তবে রূপ দিয়েছে। ওই স্যান্‌চিট্রি ক্লাব, সাঁ-সুচি স্টেজ; তারই সঙ্গে লাইব্রেরী, মিউজিয়ম আর নাচের এম্‌ফি-থিয়েটার!'—স্যার সি. কে. হঠাৎ ব্রততীর সামনেও কেমন বিব্রত হয়ে উঠলেন।

'ওরা! ওরা মানে ত তোমার ওই বন্ধুপুত্র আর আমার বান্ধবীর দল? কিন্তু বাবা, যে দেশে পেটের দায়ে মানুষ ভাত কুড়িয়ে খায় ডাস্ট্‌বিন থেকে—শিশুকে অন্ধ করে চোখে লোহার কাঁটা ফুটিয়ে, সেখানে—না, থাক। ওদের কথা ব'লো না তুমি। আমি চাই ওই বন্ধুদের হাত থেকে মুক্তি।' ব্রততী কান্নায় ভেঙে পড়ে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ় দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে স্যার সি. কে. ওর মাথায় হাত দিয়ে ডাকেন—'তাতু!'

ব্রততী মুখ না তুলেই উত্তর দেয়—'কি বাবা?'

'আমি ত ওদের জন্যে চাঁদা দিই নি মা। দিয়েছিলাম তোরই কথা ভেবে। কিন্তু তুই ত আমায় কোন দিনের জন্যেও বলিস্ নি ত'ত'
বলিস্ নি, তোর মনের কথা!'

কষ্ট দিতে চাই নি বাবা.

‘পাগলি! তোর মুখের হাসি মিলিয়ে গেলে যে কষ্ট পাই, তার চেয়ে বেশী কষ্ট কি তুই দিতে পারিস্?’ স্যার সি. কে’র চোখে জল আসে।

ব্রততী একটু ইতস্তত ক’রে বলে—‘আমার চোখের সামনে থেকে পুরনো পৃথিবীটা যেন মুছে গেছে বাবা। দীনু, না—। আমি ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না মানুষের দুঃখ।’

‘দীনু!—কে, মা?’

‘মিস্টার সেন। নিঃস্ব হয়েছেন, তবুও মনে এতটুকু দৈন্য নেই। অদ্ভুত!—’

ব্রততী আবার স্থির হয়ে বসল।

স্যার সি. কে. পাশের চেয়ারখানা আরও কাছে টেনে নিয়ে বসলেন ব্রততীর পিঠে সস্নেহে হাতখানা রেখে।

ব্রততী আপনমনে বলে—‘এত বড় দেশে ওদের মাথা গুঁজবার একটু ঠাঁই নেই।’

‘তাতু!’—পর্যাপ্ত মমতার সুরে স্যার সি. কে. ডাকেন।

‘য়্যাঁ!’—ব্রততী করুণ দৃষ্টিতে চায়।

‘তোর মায়ের কথা আর একটুও মনে পড়ে না?’—দীর্ঘশ্বাসে বুকখানা কেঁপে ওঠে।

‘একটু একটু পড়ে। ছবিখানা দেখে এখন বেশ ভেবে নিতে

[illegible] কে. তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন ব্রততীর মুখপানে। [illegible] এমন নিষ্পলক শাণিত দৃষ্টি ব্রততী আর কোন দিনও

দেখে নি। মনে হয়, চোখের ভিতর দিয়ে সমস্ত অন্তরটা যেন বেরিয়ে আসতে চায়।

—আশ্চর্য! সেই আগুন এখনও নেবে নি। তার না-বলা কথা, গোপন অনুভূতির চাপা কান্না বিক্ষোভের মত জ্বলে উঠেছে তাতুর বুকে। অমনি আজে-বাজে নানা ভাবনায় বিনিদ্র হয়ে উঠত তার শীতের রাত—

কিছুক্ষণ নীরব থেকে, স্যার সি. কে. আকস্মিক চঞ্চলতায় অস্থির হয়ে উঠলেন। তিনি দেবেন না, কোন মতেই দেবেন না এসবের প্রশ্রয়। —স্যানুচিট্টু সোসাইটির কার্ডখানা টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে চীৎকার ক'রে উঠলেন—'এ তোমার বাড়াবাড়ি তাতু! দেশে কার মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই, তাই নিয়ে নিজের মাথা খারাপ করার কোন মানে হয় না। ওরা এসেছে ওদের ভাগ্য নিয়ে; শত চেষ্টাতেও তুমি পারবে না তার একতিল লাঘব করতে।'

উত্তরের অপেক্ষা না রেখে তিনি ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ব্রততী হাসে। সেই কান্নার ভিতরেও চেপে রাখতে পারে না তার হাসি: 'ভাগ্য! শক্তিমানের হাতে-গড়া ওদের সেই ভাগ্য মাটির বুকে কেঁদে মরে। ওরাও মানুষ, সেকথা মানুষেরাই দিয়েছে ওদের জন্মের মত ভুলিয়ে।'

হঠাৎ ব্রততী চম্‌কে উঠল—লীলা হালদার, শিপ্রা আর মুকু[illegible] নন্দীকে দেখে। তারা আগেই এসে দাঁড়িয়ে ছিল ওর মু[illegible]কে চেয়ে।—পিছনে ব্যানার্জী।

মুমূর্ষু পৃথিবী

দীমু চেয়েছিল মুক্তি। কিন্তু অনিবার্য বিপর্যয়ের মাঝখানে পড়ে' ওর জীবনের আগাগোড়া আবার উল্টে গেল। ওর কল্পনা, সেই বিশৃঙ্খল জীবনের অবাধ গতি সহসা কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল অতসীর দুর্ভাগ্যকে ঘিরে। একটা ভিকিরী মেয়ে, যার প্রতিদিনের অন্নমুষ্টি আসে চোখের জলে ধুয়ে, তার মুখপানে চেয়ে দীমুর সর্বাঙ্গ আজ আড়ষ্ট হয়ে আসে আর্তভায়।

ওদের পল্লীতে লেগেছে মড়ক। আশ-পাশে, বস্তির ঘরে ঘরে মানুষগুলো মরছে; কেউ বাইরে, কেউ উঠানে, কেউ বা তলগড়ের চৌকাঠে মাথা রেখে। দীমু করুণ চোখে চেয়ে থাকে তাদের পানে; কখন বা এগিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে অতসীর পীড়াপীড়িতে।—ওরা মরে; যেন বেঁচে থাকাটাই ছিল ওদের অনধিকার। জন্মের সাথে সাথে বাঁচবার অধিকার নিয়ে আসে নি ওই হতভাগ্যের দল; এনেছিল অপ্রতিবাদে মরবার জন্মগত অধিকার, আগুনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়া ঝাঁক ঝাঁক পঙ্গপালের মত। তবুও কাঁদে, হাহাকার ক'রে কাঁদে কেউ। বদ্ধ কান্নার গুমট-বাঁধা শ্বাসগুলো ঘুরে মরে বস্তির ঘরে ঘরে। ওদের নিশ্বাসের বিষাক্ত বাষ্প বাতাসে মিলিয়ে যায় না। ওরা যেমন অযাচিত অতিথির মত এসে আশ্রয় নিয়েছিল মানুষের পান্থশালায়, তেমনি অবারিত যাত্রীর মত একে একে চলে [illegible] জীবনের বোঝা মাটির বুকে নামিয়ে রেখে। জীবন্ত পৃথিবীর [illegible] ফুরালে অজ্ঞাতে মুছে যায় অবজ্ঞার গ্লানি।

[illegible] রাত পথে পথে ঘুরে দীমু যখন ক্লান্তপদে এসে দাঁড়াল [illegible] সামনে, অতসী মেঝেয় পড়ে লুটোপুটি ক'রে কাঁদে;

মুমূর্ষু পৃথিবী

ঘরের এককোণে প্রাণান্ত চীৎকারে কচি ছেলেটার গলা শুকিয়ে উঠেছে।

দীনু একতিলও বিচলিত হ'ল না। অনশন-শুষ্ক ঠোঁট দুখানা একবার মাত্র বিকৃত হ'ল কান্নার আবেগে।—উপেনের মৃতদেহটা ডোমেরা বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে। উপেন! অতসীর বাবা, এতদিন পরে মুক্তি পেয়েছে। ওর জীবন-জোড়া অন্ধকারের হয়েছে অবসান; প্রভাত হয়েছে সীমাহীন অমানিশা। অসহায় পঙ্গু জীবনটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে রাত্রিদিন পৃথিবীর পথে কেঁদে বেড়ানোর লাঞ্ছনা থেকে উপেন আজ নিষ্কৃতি পেয়েছে।

'অতসী!'

অতসীর কান্নার বেগ উথলে উঠে। ঘরের মেঝেয় মাথা ঠুকে আরও ছট্‌ফট্ করে হাহাকারে। ডোমগুলোর পা জড়িয়ে ধরে দুহাত দিয়ে; কেড়ে নিতে চায়, ছিনিয়ে নিতে চায় তার বাপের মৃতদেহটা।

—দিনের পর দিন না খেয়ে মরেছে খোকা; তার পর ওর মা। এবার বাবা নিজে নিল ছুটি!

ওরা চ'লে গেল। দীনু ধীরে ধীরে গিয়ে ব'সল অতসীর পাশে। মাথাটা কোলের উপর তুলে নিয়ে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল পাণ্ডুর মুখখানার দিকে; অতসীর তখন দাঁতি লেগেছে।

যেমন ক'রে দিন যাচ্ছিল, আবার তেমনি ক'রেই চা[illegible]
পর আলো-ছায়ার জাল বুনে। কাল যে দিনটাকে মনে [illegible]
চেয়েও ভয়ংকর, আজ সেটা সহজ হয়ে আসে আগ[illegible]
শঙ্কাজড়িত ক'রে। ওদের জীবনের গতিতেও অমনি[illegible]

নেমে আসে এক একটা সন্ধ্যা; কোলের অন্ধকার কাটবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘনিয়ে ওঠে সামনের পথে সাজোয়া আঁধার।—এখন আর ওরা কাঁদে না; ওদের অশ্রু স্তরে স্তরে জমাট বেঁধে যায় অবসন্ন পিঙ্গলার গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে।

উপেন পেয়েছে মুক্তি, কিন্তু অতসী ছাড়া পায় নি। পিছু-টানের বোঝা ছিঁড়ে পড়বার আগেই, খোকা দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে অতসীর শাখা-প্রশাখা—কচি আলোক-লতার মত নিবিড় আবেষ্টনে।

কেন এলো খোকা! ওর দুর্ভাগ্যের মাঝখানে এমনি অযাচিত আসা, ও ত চায় নি কোন দিন। ও চায় নি মা হ'তে, তবুও খোকা এলো ওর গোপন মনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে উদ্বেলিত ক'রে।

অতসী একদৃষ্টে চেয়ে থাকে খোকার মুখপানে। কখন সারা গা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে আনন্দের শিহরণে, কখন-বা চোখ ছাপিয়ে জল আসে—ওর সেই ছোট ভাই-এর কথা, মায়ের কথা ভেবে। হঠাৎ মনটা শিউরে ওঠে আতঙ্কে। মরেছে, ওরা মরেছে, দিনের পর দিন একটু একটু ক'রে ক্ষয় হয়ে।—খোকা যদি মরে! তেমনি না খেয়ে যদি তিল তিল ক'রে শুকিয়ে যায়!—ও পারবে না, পারবে না সইতে। সজল দৃষ্টি ধীরে ধীরে নিশ্চল হয় খোকার মুখের উপর। অমনি ক'রে চেয়ে থাকতে থাকতেই ওর বুকের আঁচল ভিজে যায় দুধে। পর্য্যাপ্ত অমৃত-প্রবাহে দুটি স্তন ব'য়ে টপ টপ ক'রে ঝ'রে [illegible]ধ।

[illegible] পাশে ব'সে ভাবে। তাবে ওর অতীত জীবনের কথা, [illegible]র সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকে প্রতিটি মুহূর্তের [illegible] ভিতরটা আর্তনাদ ক'রে ওঠে হাহাকারে।—ভুল,

ভুল; জীবনের প্রতিপদক্ষেপে জমে উঠেছে শুধু ভুলের বোঝা। অতীত মুছে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে; বর্তমান ঘোলাটে হয়ে উঠেছে অন্ধকারে; কুয়াসাচ্ছন্ন অন্ধকারে ওর চোখ কেমন ধাঁধিয়ে যায়। অতসী কাঁটা-তারের বেড়ার মত ঘিরে ধরেছে ওর দুর্দান্ত গতিকে। তাই ফলেছে আচম্বিতে ওই ভুলের ফসল; ওর ক্ষণিক দুর্বলতার সিঞ্চনে গ'ড়ে-ওঠা আগামী সহস্র ভিক্ষুক-বংশের আর এক আদি-পুরুষ। খোকাকে আশ্রয় ক'রেই আবার পৃথিবীতে আসবে অগণিত ভিকিরী; ওরই শাখায় শাখায় ফলবে অসংখ্য অসহায় অন্ধ শিশু! —উঃ।

অতসীর দৃষ্টিটা হঠাৎ ছল্‌কে পড়ে দীনুর মুখের উপর।—'কি ভাবছ তুমি অমন করে?'

'আমি? ভাবছি—ভিক্ষে আর ক'রব না অতসী।'

'বেশ ত! আমিই ক'রব ভিক্ষে। তোমাকে ত আর বলিনি কোনদিন।'

দীনু একটুক্ষণ ভেবে আপনমনেই বলে—'তুমি বল নি সত্যি, কিন্তু পুরুষ হয়ে আমি পারি না এমনি নিশ্চিন্তে তোমার ঘাড়ে নিজেকে চাপিয়ে দিতে।'

কথা বলতে বলতে দীনু কেমন আনমনা হয়ে যায়। বিড়বিড় ক'রে বলে—'মোট খাটব; না হয়, না-হয় রাস্তার লোকের হাত থেকে জোর ক'রে নেব কেড়ে।' তারপর [illegible] অস্বাভাবিক জোরের সঙ্গে ব'লে ওঠে—'অতসী, চল পালি[illegible]— [illegible] পালিয়ে যাই মানুষের এই কোলাহল, এই শহর—লো[illegible] দূর পাড়াগাঁয়ের মাঠে, না-হয় অন্ধকার একটা বনে. [illegible]

কোনদিন আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নেবে না। তুমি বাঁধবে ঘর; আমি কাটব মাটি।'

অতসী সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ওর বুঝতে মোটেই সময় লাগে না যে, মাঝে মাঝে দীনুর মাথাটা হঠাৎ যেমন বিগড়ে যায়, তেমনি বিগড়ে গেছে আবার। আবার কোন দিকে পালিয়ে যাবে, কিংবা হঠাৎ একটা কিছু করে ব'সবে।

সরে' এসে ওর গায়ে গা দিয়ে ব'সে অতসী হাত বুলিয়ে দেয় দুটি পায়ে।

অদম্য বেগে দীনুর বুক ছাপিয়ে উঠতে চায় কান্না। দু'চোখে টলমল করে জল—'আমার চোখেও জল আসছে অতসী, পাথরের দেওয়ালেও এবার বুঝি ফাট ধরল! মরীচিকা নয়, জল—জল! মরুভূমিতেও দেখা দিয়েছে জল!' উৎকট হাসির ঝাপটায় তার চোখের জল চোখের কোলেই শুকিয়ে যায়।

* * *

ভিক্ষে নয়, কাজের চেষ্টায় দীনু আবার উঠে-পড়ে লেগেছে। যেমন ক'রে হোক্, একটা কিছু জোগাড় করতেই হবে! নইলে, নইলে খোকা আর অতসীকে করতে হবে ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত।—দীনু ঘুরে বেড়ায়, আবার ঘোরে লোকের দরজায় দরজায়। রাস্তার মোড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে [illegible]টা মোট পাবার আশায়। কিন্তু জোটে না। অদৃষ্টের কি [illegible]ধান! এত লোক মোট-খেটে পেটের সংস্থান করে, কিন্তু [illegible]না দিনান্তে একটা মজুরি।

[illegible]য়ে[illegible]ত চলতে নিজেই কখন ভুলে যায় উদ্দেশ্যের কথা। [illegible] [illegible]

আনমনে অতিবাহন ক'রে চলে মহানগরীর পথ। মাঝে মাঝে ফিরে চায় পিছনের কোলাহল শুনে, কিন্তু পা-দুটো থামে না।

দীনু যখন চৌরাস্তার মোড় ছাড়িয়ে প্রায় এসে পড়েছে বীমা কোম্পানীর পাথর কুঠির কাছে, হঠাৎ নজর পড়ল বাদামি রঙের বড় মোটরখানার উপর। গাড়ীখানা বেগে চলতে চলতে আচম্‌কা ব্রেক্ দিয়েছে ওপারের ফুটপাথের পাশে!—সামনে ব'সে মণি অধিকারী, আর ভিতরে ব্রততীর পাশে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটী বোধ হয় ওর বাবা—স্যার সি. কে. রায়।

ওরা নামবার উপক্রম করে! দীনু মুহূর্তে কেমন হকচকিয়ে গেল। তারপর পলক ফেলতে না ফেলতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল বীমা অফিসের পিছন দিয়ে ফিরিঙ্গী-পাড়ার ছোট গলিটার ভিতর। —পিছনে পায়ের শব্দ শুনে হৃৎস্পন্দন যেন অস্বাভাবিক গতিতে চঞ্চল হয়ে উঠল। মনে হ'ল, মণি এসে পড়েছে পিছু পিছু। নিরুপায় হয়ে দীনু গলিটায় বাঁকে ব'সে পড়ল!

সত্যি এসেছে ওরা!—মণি অধিকারী আর ব্রততী; স্টেট্‌স্‌ম্যান অফিসের এদিকে, পেভমেণ্টের উপর দাঁড়িয়ে আশে-পাশে চেয়ে দেখে। ব্রততী উদ্‌গ্রীব দৃষ্টিতে চায়, হয় ত ওকেই খুঁজছে দুটি চঞ্চল চোখে সেই অফুরন্ত করুণা নিয়ে! কিন্তু কেন? কেন খুঁজবে সে দীনুর মত একটা অপগত মানুষকে?—ভাবতে গিয়ে শরীরে রক্ত হিম হয়ে আসে। একদিন ওর জীবনে যা [illegible] রোমাঞ্চকর কল্পনা, আজ যেন তার আভাস মাত্রও হয়েছে [illegible] বিভীষিকা।

ব্রততীর পরনে নিতান্ত সাধারণ একখানা শা[illegible]

ভ্যানিটি কেসটা নেই আর। সর্বাঙ্গের সেই চলমান দ্রুতভঙ্গী যেন আপনা-আপনি কেমন শ্লথ হয়ে এসেছে।

বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ডটা স্তব্ধ হয়ে আসে।—যদি এসে পড়ে! আর একটু এগিয়ে যদি এসে দাঁড়ায় গলিটার মোড়ে!

কিন্তু আসে না। যেমন আগে-পিছে দু'জনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি আবার ফিরে যায়।—ব্রততী কি বলে; হয় ত ওর কথাই, কিংবা অন্য কারো।

দীনু হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এমনি ক'রে আরও তিন-চার দিন সে আত্মরক্ষা করেছে ব্রততীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে।

ফিরিঙ্গী-পাড়ার ভিতর দিয়ে ডানে-বাঁয়ে বেঁকে দীনু এসে উঠল একেবারে মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের সামনে। তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। রাস্তার দু'পাশে কলগুঞ্জন তুলে আলোকময় পথ-রেখাকে মুখর ক'রে চলেছে রকমারি পুরুষ আর নারী।

মোড়টা ফিরে দীনু ময়দানের পথ ধরল। বিস্তৃত পথ, তবুও অবাধে চলা যায় না। দুপাশের ফুটপাথেই জীবন্ত মানুষের ভিড়! বেঁচে থাকার মাদকতায় ওদের দেহ আর মন উথলে ওঠে পথের পরিসর ছাপিয়ে। ওরা যেন বাঁচতেই এসেছে পৃথিবীতে। পরিপূর্ণ মন ফেনিল হয়ে উঠেছে দিনান্তের প্রমোদবিলাসে। ওদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছুটে চলে শ্যাম্পেনের উদ্দাম সজীবতা।

[illegible]লী মেয়েদের ভিড় জমেছে;—তরুণ-তরুণী, ক্বচিৎ দু-একজন [illegible]র দাঁড়িয়েছে সামনের গেরুয়া রঙের নতুন বাড়ীটার [illegible] থম্‌কে দাঁড়ায়।—'সাঁ-সুচি!'—'দি স্যান্‌চিটু ক্লাব!'

'প্রগতি-ভবন!' ওর মাথার মধ্যে পিল পিল ক'রে ওঠে মগ্ন চেতনার কীটগুলো। মনে হয়—স্বপ্ন; কোন্ সুদূর অতীতের বিস্মৃত-প্রায় স্বপ্নে আঁকা হয়েছিল ওর মনে এই 'সাঁ-সুচি'; আর তারই সঙ্গে ক্লাব, লাইব্রেরী, এম্ফি-থিয়েটার। ওদের সবুজ সঙ্ঘের রেজল্যুশান্!—চোখের কোণ থেকে মগজের ভিতর পর্যন্ত ঝিম্‌ঝিম্ করে। সামনে ছবিগুলো অস্পষ্ট হয়ে আসে। ইলেকট্রিক নিউজের আলো ছড়িয়ে পড়ে ময়দানের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত অবধি; রূপালি জোয়ারের ঢেউ খেলে যায় সবুজ ঘাসের বুকে।

সাঁ-সুচির উদ্বোধন উৎসব শেষ ক'রে ওরা বাড়ী ফিরে যায়। ওদের কল্প-প্রাসাদ ধীরে ধীরে নীরব হয়ে আসে ঘুমের ছোঁয়ায়।—সাহেবদের হোটেলে তখনও জীবনের উৎসব ধ্বনিত হচ্ছে: পিয়ানোর মৃদু শব্দে ঘুমের গান—

* * * *

আবার জমে' ওঠে তাতুর মজলিস।

ব্রততী বলে 'ওদের জন্মের জন্য কি ওরা দায়ী শিপারিন?'

"জন্মের জন্য হয় ত দায়ী নয়, কিন্তু পরিণতির জন্য ওদের দায়িত্ব যে নিতান্ত কম, তা স্বীকার করতে আমি মোটেই রাজী নই তাতু!'—শিপ্রা ইংরেজী কাগজখানার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিশ্বাসে চোখ বুলিয়ে যায়। তারপর একটু থেমে বলে: ... নুইসান্স বন্ধ করতে হ'লে কর্পোরেশনের হেল্‌প্ নিলেই ... প্রোপাগাণ্ডায় হয় না।'

ব্রততী একটু চাপা তীব্রতার সঙ্গে বলে—'তা জানি। কিন্তু পরিণতির কথা ব'লতে হ'লে এই কথাই ব'লতে হয় যে, ওদের ওই পরিণতির জন্য ওরা যতখানি দায়ী, তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশী দায়ী আমাদের দেশ, আমাদের সমাজ। তুমি কি অস্বীকার ক'রতে চাও সে কথা? এর ফল আসবেই একদিন না একদিন!'

'নিশ্চয়ই। আসতেই হবে।—যাদের করেছ অপমান, অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।'

অন্য সময় হ'লে লীলা ও মুরলা হয় ত খিলখিল ক'রে হেসে উঠত শিপ্রার কথা শুনে। কিন্তু এখন আর ঠিক সাহস পায় না ব্রততীকে পুরোপুরি অসন্তুষ্ট ক'রতে। ও পেট্রোনাইজ্ না ক'রলেও ওকে উপলক্ষ্য ক'রেই স্যার সি. কে. দিয়েছিলেন ওদের ক্লাবে দশ হাজার টাকা চাঁদা। আরও হাজার দশেক স্বচ্ছন্দে যাবে আদায় করা, এটুকু শিপ্রা না বুঝলেও ওরা বেশ বোঝে।

ডক্টর ক্যারী তখন ব্যানার্জীর সঙ্গে কি একটা পরামর্শ নিয়ে ব্যস্ত। শিপ্রার উক্তির দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ব্রততী বলে—'মণিবাবু, সব চেয়ে দুঃখের কথা এই যে, আমারা চাই আমাদের দাবীকে ষোল-আনা স্বীকার ক'রে অন্যের বেঁচে থাকবার অধিকার-টকু পর্যন্ত অস্বীকার ক'রতে। ভেবে দেখা ত দূরের কথা, আমরা [illegible]য়ে দেখতেও রাজী নই—হোয়াট ম্যান্ হ্যাজ্ মেড্ অফ্ ম্যান্—"

[illegible]ম্যান্ হ্যাজ্ মেড্?'—শিপ্রা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়।

[illegible]তীত কোন কথা ব'লবার আগেই মণি অধিকারী ব'লে [illegible]ড়া আর কি বলা যেতে পারে বলুন? মাটির বুকে

জ'ন্মেও যাদের মাটির ফসলে তিলমাত্র অধিকার নেই, তাদের বঞ্চিত ক'রেছি আমরাই। দেশের মাটি নয়।'

আলোচনাটা উঠেছিল ওদের প্রগতি-ভবনের প্রতিষ্ঠা নিয়ে, কথায় কথায় এসে দাঁড়িয়েছে ব্রততী আর ডক্টর ক্যারীর সদ্য-প্রতিষ্ঠিত 'ওয়েল-ফেয়ার' সমিতির প্রসঙ্গে।

মিস্ হালদার আর মুরলার মোটেই ভাল লাগে না ও-সব কথা। শিপ্রা ভালবাসে যে-কোন কথার সূত্র নিয়ে নিজের পেডাণ্টি দেখাতে। তাই অন্তত তর্ক ক'রবার লোভেও সে চায় না প্রসঙ্গ উল্টে দিতে।

ওদের আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দেবার মতলবে লীলা হালদার বলে—'কেতকীর উপন্যাসটা হ'য়েছে আশ্চর্য রকম রিয়ালিস্টিক। তোমাদের ওই প্রব্লেমটাই যেন জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে তার লেখায়।'

'কেতকী?'—শিপ্রা সকৌতুকে জিজ্ঞেস করে।

'বোধ হয় পেন্-নেম্। কেউ কেউ বলে—ওটা নাকি সাগর ঘোষের লেখা।'

'কেউ বলুক আর না-বলুক, অন্তত তিনি স্বয়ং বলেন যে, 'মহানগরীর পথ' তাঁর ওই বইটার অবিকল নকল। এমন কি, তিনি নাকি লাইনগুলো পর্যন্ত লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখেছেন।' মুরলা[illegible] গাম্ভীর্যটা যেন বেশ জমাট বেঁধে আসে।

ডাক্তার অধিকারী বোধ হয় এতক্ষণ কথাটা মন দি[illegible] নি। মুরলার শেষ কথাটুকু কাণে যেতেই ব'লে উ[illegible]

ন্যাচারাল্!' গ্রেট মেন থিঙ্ক য়্যালাইক্। হয় ত আগাগোড়াই মিলে গেছে দু'জনের চিন্তাধারা!'

মুরলা ঈষৎ সলজ্জ হাসির সঙ্গে উত্তর দেয়—'আগাগোড়া ঠিক নয়, তবে মিস্টার চ্যাটার্জীর একটা ইম্পরট্যাণ্ট সিন্-এর সঙ্গে ওঁর একটা ইন্সিডেণ্ট-এর অনেকখানি মিল আছে।'

—'আই সী। নো ফারদার্?—সে কথা আগে বলতে হয়। ও রকম সাদৃশ্য ত ঘাসের সঙ্গে অশথ গাছেরও আছে। অন্তত একটা ইম্পরট্যাণ্ট য়্যাস্‌পেক্ট: পাতার রঙ। তাই ব'লে, অশথ গাছকে শাঁওয়া ঘাসের নকল বলা চলে না।'—ডাক্তার অধিকারী স্বভাবসিদ্ধ প্রচণ্ড হাসিতে ঘরখানা মুখর ক'রে তুললেন।

ব্যানার্জী এতক্ষণ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন নি যে, হালদার আর মুরলার চেষ্টিত ইঙ্গিতটা ওঁকে লক্ষ্য ক'রেই নিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাঁরই কথার য়্যানালজি! কাল মুরলাকে সামনে রেখে মিস হালদারকে উনি বলেছিলেন, শিপ্রার চালচলনের হাওয়া লেগেছে ওদের দুজনের গায়ে। অবিকল নকল! ব্লাউসের রঙ পর্যন্ত ধীরে ধীরে মিলে যাচ্ছে শিপ্রার পছন্দর সঙ্গে।

মুরলার বক্র হাসিতে মুহূর্তে ব্যানার্জীর মুখখানা লাল হয়ে উঠল।

ব্রততী অনেকক্ষণ থেকে ইতস্তত করছিল, ব্যানার্জীকে কিছু বলবে ব'লে। কিন্তু সকলের সামনে সে প্রশ্ন উত্থাপন করতে তার কেমন [illegible]। নানা কথার ভিড়েও মাঝে মাঝে ব্যানার্জী আর মুরলার [illegible]য়ে দীপশিখা ঝলক দিয়ে উঠছিল, সেটা অন্যের দৃষ্টি [illegible] গেলেও তার দৃষ্টি থেকে আত্মগোপন করতে পারে নি।

কিন্তু আশ্চর্য! ব্রততীর মনে তাতে এতটুকুও ক্ষোভ হয় না; বরং স্বস্তিতে হাল্‌কা হয়ে আসে তার ভারাক্রান্ত মনের পর্দাগুলো।

ব্রততীকে নীরব দেখে শিপ্রা হেসে বলে—'সাঁঝের খেয়ায় কি শেষে ঝড় উঠবে তাতু?'

'ঝড় উঠবে না শিপার, বরং কেটে যাবে চৈতালি মেঘের নিরর্থক সমারোহ। আর, ঝড় উঠলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না আমার। আমি সে ভয় করি না। বাঁচবার পথে ঝড়কে আমি যতটুকু ভয় করি, তার চেয়ে ঝড়ের পথে বাঁচতে এখন আমার বেশী ভাল লাগে।'—ব্রততী হাসে।

ব্যানার্জী একটু বিস্মিত হয়ে চায় ওদের মুখপানে। মুরলার হাসিতে কেমন একটা লঘু উল্লাসের রঙ!

'ওটা—'

লীলা কটাক্ষ ক'রে কি বলতে চায়। কিন্তু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব্রততী এক নিশ্বাসে বলে—'আমার ইডিওসিন্‌ক্রেসী দেখে আপনারা হয় ত আক্রমণ করবার লোভ সংবরণ করতে পারেন না, কেমন মিস্ হালদার? কিন্তু আমি কি চাই, জানেন?—আমি চাই পৃথিবীর এই নিষ্ক্রিয় অস্তিত্বের মাঝখানে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখ খুলে দিতে। এতকাল যারা নিশ্চিন্তে বেঁচেছে, এবার তারা করুক প্রায়শ্চিত্ত!'

'ব্রেভো! তুমি কি সিভিল ওয়ার ডিক্লেয়ার করবে তাতু? কিন্তু এ যে স্রেফ অটো-এগ্রেশন্! ডক্টর জাঙ্গ, আই মীন্—বাপু বলেন—'

শিপ্রার কথা শেষ না হতেই মিস্টার ব্যানার্জী ব'লে উঠলেন—'পারভার্সন্!'

ব্যানার্জীর শ্লেষটা যেন তাতুর গায়ে টিকের আগুনের মত ছিটকে পড়ল। তবুও ব্রততী জোর ক'রে নিজেকে সামলে নিয়ে শান্ত অথচ প্রখর সুরে বলে—'মিঃ ব্যানার্জী, মেয়েদের সঙ্গে ব্যবহারে আপনাদের তরফ থেকে যে শিষ্টতাবোধ আপনা থেকেউ থাকা উচিত, আমার মনে হয়, সেটা সম্বন্ধে রিমাইণ্ড করবার সুযোগ অন্তত মেয়েদের যত না দেওয়া যায় ততই ভাল।'

শিপ্রা ও লীলা দু'জনেই চম্‌কে ওঠে। ডাক্তার অধিকারী স্পষ্ট শুনেও ব্রততীর সঙ্গে তার কথাগুলো মিলিয়ে নিয়ে যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না—নির্বাক্ চেয়ে রইলেন।

মুরলার মুখখানা কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রত্যন্তর আবহাওয়ার সূচনাটা অনুমান ক'রে ওরা সকলেই তখন উঠবার চেষ্টা করছিলেন। মিস্টার ব্যানার্জীর মুখে-চোখে কেমন একটা আড়ষ্টতা!

শিপ্রা কি বলতে যাচ্ছিল; কিন্তু কথাটা মাঝপথে আটকে দিয়ে ব্রততী আবার ব'লে উঠল—'এক্সকিউজ্ মি, মিস্টার ব্যানার্জী। সেদিন যে মত আমার ছিল, আজ তা আমি বদ্‌লে ফেলেছি; সেই সঙ্গে কোর্স টাও।'

মুহূর্তে ওর সর্বাঙ্গে যেন আলোড়িত হয়ে উঠল কালবৈশাখীর ঝড়; বর্ষণোন্মুখ, অথচ আসন্ন প্রলয়ের মত্ততায় চঞ্চল!

ওরা কোন কথা বলবার আগে ব্রততী দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে [illegible]। শিপ্রা আর মিস্ হালদার স্তম্ভিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল ব্যানার্জীর [illegible]পানে।

অতসী শোনে নি তার নিষেধ। ওই দুর্বল শরীর নিয়েই ছেলেটাকে বুকে ক'রে ভিক্ষেয় বেরিয়েছিল।— দীনু যা পারে না, যা কখনও সয় না তার ধাতে, অতসী প্রাণ থাকতে সে কাজে হাত দিতে দেবে না তাকে। হ'লই বা কাঙাল, পুরুষ ত! পুরুষ হয়ে লোকের দরজায় হাত পাতা, অতসী নিজেও পছন্দ করে না; সত্যি মাথা হেঁট হয়। পেটের দায়ে প্রতিদিন কত আর মাথা হেঁট ক'রে বেড়াবে দীনু!

দীনু যতবারই অতসীকে বলেছে—ভিক্ষেয় বেরিও ন', ওই শরীর আর কচি ছেলেটাকে নিয়ে, অতসী শোনে নি। সে বাধা দিয়েছে। নিষ্প্রভ বড় বড় চোখদুটো তুলে কাকুতির সঙ্গে বলেছে—'আমার কোন কষ্ট হয় না। যা পারি, দুমুঠো আন্‌বই কোনরকমে জোগাড় ক'রে। তুমি বরং সেই ফাঁকে একটা কাজ খুঁজে দেখ। কত দিন ত হয়ে গেল! ঠাকুর কি এখনও চাইবে না মুখ তুলে?'

চোখে আগেকার সে স্বচ্ছতা নেই, তবুও জল ভ'রে উঠলে টলটল করে সজীবতায়। সজীবতাও হয় ত আর নেই একবিন্দু; ওটা মরীচিকা, অতীত নিশ্চিন্ততার সাময়িক সঞ্চয় যে-টুকু লুকিয়ে আছে রেটিনার আনাচে-কানাচে, তা-ই হঠাৎ ঝলক দিয়ে ওঠে কান্নার আবেগে।

সারাদিন পথে পথে টহল দিয়ে দীনু যখন বাড়ী ফিরল, তখন রাত্রি প্রায় আটটা। এর মধ্যেই বস্তি গুলজার হয়ে উঠেছে। ওপাশের ঘরে যে লোকটা কাল সকালে এসে উঠেছিল, ঘর-পালানো মেয়েটিকে সঙ্গে ক'রে, তাকে ঘিরে একপাল লোক দাঁড়িয়ে কি কানাকানি করে;

মেয়েটাকে হয় ত সে এনেছিল ফুস্‌লিয়ে; দুপুরে আবার পালিয়েছে অন্য কার সঙ্গ পেয়ে।

অতসী আজ আলোটাও জ্বালে নি। ঘাড়ি-মুড়ি দিয়ে ঘুমচ্ছে; ছেলেটা কোলের কাছে নির্জীব হয়ে পড়ে আছে। হয় ঘুমিয়েছে, না হয় হাত-পা গুটিয়ে অন্ধকারে একলা জেগে জেগে ভাবছে ওর জন্মান্তরের কথা।

একবার মনে হ'ল, জাগাবে না; ঘুমোক। এমন ক'রে বোধ হয় কতকাল ঘুম নামে নি ওর চোখে। আবার মনে হয়, সারাদিনের উপোসে শরীরটা হয়ত ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। দু'মুঠো চাল এনেছে সেধে, কিন্তু ফুটিয়ে নেবার ধৈর্য আর ছিল না ওই অবসন্ন দেহে।

কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মত ব'সে থেকে দীনু কেরোসিনের ডিবেটা জ্বাল্‌ল। অতসী ঘুমোয় নি; ঘোর হয়ে পড়ে আছে। ডাকতে গিয়ে দেখে, গায়ে খই-ফুটান জ্বর! ছেলেটা কুকুর-মাছির মত লেগে আছে বুকে।

মাথার কাছে ব'সে দীনু কপালে হাত দিয়ে ডাকে—অতসী!

অতসী অতিকষ্টে চোখ মেলে চায়। চোখদুটো জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠেছে। কথা বলতে কষ্ট হয়; বুকে পিঠে অসহ্য ব্যথা।

আঁচলে বাঁধা চালগুলো দেখিয়ে বলে—'রাঁধ্‌তে পারি নি আজ। ভুজাওয়ালার দোকানে বদল দিয়ে, মুড়ি আর ছোলা ভাজা এনে খাও।'—অতসী হাঁপায়! দম বন্ধ হয়ে আসে এই কয়েকটি কথা [illegible]তে।

'খাবো অতসী, খাবো। আজ না হয়, কাল নিশ্চয়ই খাবো

আবার। খাবার জন্যেই ত এঁটো পাতা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি।'—দীনু কেরোসিনের ডিবেটা তুলে ধ'রে অতসীর মুখখানা ভাল ক'রে দেখে।

কশ ব'য়ে লালা গড়াচ্ছে। লালা!—না, শুধু লালা নয়; তারই সঙ্গে রক্ত!—তাজা রক্ত!

দীনুর মাথার মধ্যে রক্তকণিকাগুলো সিম্‌সিম্ ক'রে উঠল। ডিবেটা নামিয়ে রেখে দু'হাতে অতসীর চোয়াল ফিরিয়ে ধ'রে ডাকল—'অতসী!'

অতসী কাঁদে। হু হু ক'রে গড়িয়ে পড়ে উষ্ণ অশ্রু। চোখের জলে দীনুর হাত ভিজে যায়।

'রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। আচম্‌কা গাড়ীখানা'—বলতে পারে না। নিশ্বাস ঘন হয়ে আসে। শ্বাসকষ্টে চোখমুখ কেমন চম্‌কে চম্‌কে ওঠে।

'গাড়ী! ধাক্কা লেগেছে মোটরের?'—দীনুর কণ্ঠস্বর কাঁপে।

'হাঁ। কি ভাগ্যে লাগে নি ছেলেটার গায়ে।'—অতসী পাশ ফিরবার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না।

দীনুর বুকের ভিতর বিকৃত একটা অট্টহাসি গুম্‌রে ওঠে। 'ছেলেটাকে লাগলেও ক্ষতি ছিল না। একটা, একটা কেন, একশোটা ভিক্ষুকবংশের মূল উপ্‌ড়ে যেত।'

কিছুক্ষণ থেমে অতসী আবার বলে—'এই বেলা আন গে মুড়ি। দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।'

'তা যাক।'—দীনু গুম্ হয়ে ব'সে কি ভাবে। তারপর আপ মনে বিড়বিড় ক'রে বলে—'রাত্রিদিন যে লোহার চাকা ব

পাঁজরাগুলোকে চুরমার ক'রে দিচ্ছে, তার কাছে মোটরের চাকা কতটুকুই বা!'—

'কাল যদি উঠতে না-পারি! একমুঠো চাল রেখে দিও, সকালে ভিজিয়ে খাবে। কাল, না হয় পরশু—' আরও কি বলতে গিয়ে অতসী থেমে যায়। একটুখানি জিরিয়ে নিয়ে আবার বলে—'ভিক্ষে করতে দেব না তোমাকে; কিছুতেই দেব না আমি। যে ক'টা দিন বাঁচব—'

'জানি। যে ক'টা দিন বাঁচবে, এমনি তিল তিল ক'রে নিজের জীবন দিয়ে বাঁচাবে আমাকে, আর বুকের রক্ত দিয়ে বাঁচাবে ওই ছেলেটাকে। কিন্তু কেন? কেন বাঁচাবে অতসী? চিরকাল ধ'রে মৃত্যুযন্ত্রণা সইবার জন্যে মানুষকে রেখ না বাঁচিয়ে। মেরে ফেল; অজান্তে তাজা বিষ মুখের ভিতর গুঁজে দিয়ে মেরে ফেল—'

অস্থির হয়ে দীনু উঠে পড়ে। হঠাৎ অপদেবতা-ভর-করা মানুষের মত চঞ্চলভাবে পায়চারি করে; ঘুরপাক খায় ওই একফালি ঘরের ভিতর।

অবসন্নতার গাঢ় প্রলেপ ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে রাত্রি। বস্তির ঘরে ঘরে লোকগুলো ঘুমিয়ে পড়ে; সারা পল্লী নিঝুম হয়ে আসে ঘুমে। ছেলেটা কেঁদে কেঁদে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে অতসীর কোলের ভিতর। এতক্ষণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ ক'রে অতসীও হয় ত ঘুমিয়েছে এবার, কিংবা অচেতন হয়ে আছে জ্বরের ঘোরে।—ডিবেটা জ্বলতে জ্বলতে আপনি নিবে গেছে কখন! তেল নেই।

মুমূর্ষু পৃথিবী

নিঃশব্দে পা ফেলে এগিয়ে চলে রাত্রি, নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ে মহানগরীর কোলাহল, কিন্তু দীনুর চোখে একটীবারও লাগে না ঘুমের ছোঁয়া।—উপেন মরেছে, এবার মরবে অতসী,—তার 'পর? তার পর মরবে ওই কচি ছেলেটা: পৃথিবীর বুকে পথভুলে-আসা ওই উলঙ্গ পথিক। জন্মের পর জন্ম অমনি ক'রেই পথ ভুলে এসেছে পৃথিবীতে, আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে গুরুভার স্টীম রোলারের নির্মম নিষ্পেষণে। মানুষের হাতে-গড়া লৌহচক্রের চাপে দিনের পর দিন লুপ্ত হয়েছে মানুষের অস্তিত্ব। তবুও ক্ষান্ত হয় নি তাদের সেই অবারিত আসা।—ওরা আসে; দলের পর দল রক্তবীজের মত আসে জীবন্ত মানুষের পথে মৃত্যুর বিভীষিকা মাথায় নিয়ে।—ওদেরই সঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে এসেছিল অতসী: আবার ওদের সঙ্গেই ফিরে যাবে। ওর জীর্ণ পাঁজরাগুলোয় ধ্বনিত হয়ে উঠেছে মরণের ডাক। চলন্ত মোটরের ঝাপ্টায়, অচল যাত্রী ওরা, ছিট্‌কে পড়ে আবর্জনার মত।

রক্ত!—ওর লালার সঙ্গে একটু একটু ক'রে চুঁইয়ে পড়ে তাজা রক্ত!—ওই রক্তে অতসীর ছিল না কোন অধিকার। করুণার দান কুড়িয়ে কুড়িয়ে যে-রক্তের প্রতিটি বিন্দু সচল হয়েছে ওর ধমনীতে, তার উপর নেই ওর এতটুকু দাবী। যাদের দরজায় কেঁদে কেঁদে হাত পেতে ও চেয়ে নিয়েছে ওর দেহের প্রতিটি রক্তকণিকা, তাদেরই পায়ের কাছে পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে ওর বেঁচে থাকবার দাবী।—দীনুর বুকের ভিতরটা টন্ টন্ করে; ফুস্‌ফুসের মধ্যে সুরু হয়েছে আগ্নেয়গিরির দাহন।

ঘুমের ঘোরে অতসী কি যেন বলে! বলে,—'এই একমুঠো চাল

ভিজিয়ে খেয়ে সারাটা দিন তুমি থাকতে পারবে না। একটা দিন! একটা দিন বইত নয়! কাল আবার বেরুব নতুন কোন পাড়ায়।'

দীনু কান পেতে শুনবার চেষ্টা করে। আবার কি বলছে অতসী! হয় ত প্রলাপ বকছে—'পুরুষ মানুষ, তুমি চেয়ো না কারো কাছে ভিক্ষে। লোকের দরজায় মাথা হেঁট ক'রে—ছি ছি। না না, আমি দেব না, কিছুতেই দেব না তোমায় ভিক্ষে করতে। আজ না-হয় কাল ঠাকুর মুখ তুলে চাইবেই।'

'অতসী!'—দীনু এগিয়ে যায়; ঝুঁকে পড়ে অতসীর মাথার কাছে। না; জেগে নেই। ঘুমিয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ ধ'রে অতসীর নাকের কাছে হাত দিয়ে দীনু অনুভব করে তার শ্বাসপ্রশ্বাস। মুখখানা স্পষ্ট দেখা যায় না; তবুও মনে হয়, যেন নিশ্বাসের প্রতিটি স্পন্দনে সারা গা চমকে ওঠে।

দীনু নিস্পন্দ বসে' ভাবে! চোখের সামনে কুণ্ডলী পাকিয়ে ভেসে ওঠে বিস্তীর্ণ জগৎ; স্তরে স্তরে সাজানো মৃতকল্প অসংখ্য মানুষের কংকাল! দলে দলে অসহায় অন্ধ শিশু কেঁদে বেড়ায় ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে—ওদের বস্তির বাইরে, রাস্তার চলমান জনস্রোতের মাঝখানে, ফুটপাথে, বাগানে, ফিরিঙ্গীপাড়ার হোটেলের সামনে, সাঁ-সুচির ফটকটার দু'পাশে!

গলির মোড়ে ডাস্টবিনটা ঘিরে ভিড় জমিয়েছে কতগুলো উলঙ্গ ভিকিরী! ছাই, মরা ইঁদুর, ব্যাণ্ডেজের নেকড়া ঠেলে ঠেলে খুঁজছে পচা ভাত!—দীনু সইতে পারে না। হঠাৎ ওর সারা অন্তর আর্তনাদ ক'রে ওঠে হাহাকারে। মনে হয়, মগজটা বুঝি চৌচির হয়ে ফেটে পড়বে এবার।

অতসী কি বলে—আবার কি বলে আপন মনে বিড়বিড় ক'রে : 'সারাটা দিন না খেয়ে আছ। এর পর দোকান বন্ধ হয়ে যাবে। ভুজাওয়ালার কাছে দু'মুঠো চাল বদল দিয়ে মুড়ি আর ছোলাভাজা এনে খাও।'

দীনু আর সইতে পারে না। ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে চঞ্চল পদে পায়চারি করে। আজ ওর কান্না পায়। ইচ্ছা করে, চীৎকার ক'রে কাঁদে। কিন্তু বুকের ভিতর দম আটকে আসে। তালুটা কেমন শুকিয়ে উঠেছে।

—ওদের সাঁ-সুচি স্টেজের উৎসব শেষ হয়ে গেছে। কবিগুরু উদ্বোধন ক'রে গেছেন। সুরেখা গেয়েছে উদ্বোধন সঙ্গীত। মল্লিকা, টুটুল, ডলি, রেবা, অমিয়, দীপা—ওরা সবাই দেখিয়েছে নাচ। কবিগুরুর নির্মাল্য মাথায় নিয়ে ওরা ভগীরথের মত মাটির মরুভূমিতে আহ্বান ক'রে এনেছে উর্বশীর নৃত্যধারা! ওরিয়েন্টাল ডান্স! সেই সঙ্গে ঝরণা বাজিয়েছে সেতার, রাবেয়ার এস্‌রাজে দুলে দুলে উঠেছে সুরের মূর্চ্ছনা!

এম্‌ফিথিয়েটারের খিলানে খিলানে সাজানো দেবদারুর ঝালর; স্টেজে ছড়িয়ে আছে ছিন্ন-গোলাপের অর্ধ-দলিত পাপড়ি; লাইব্রেরীর টেবিলে, মেঝেয়, রাশি রাশি বই-এর মাথায়, অগ্রগামী মানুষের প্রস্তর মূর্তিগুলোর চারিপাশে ছড়িয়ে আছে মুঠো মুঠো শ্বেত টগর। অগুরু ধূপের গন্ধে ঘরের বাতাস তন্দ্রালু হয়ে উঠেছে।

ওদের ওই অমৃত ধারায় স্নান ক'রে বেঁচে উঠবে মুমূর্ষু পৃথিবী; মুক্ত হবে প্রেতায়িত মানুষের নগ্ন কংকালগুলো!—দীনু হো হো শব্দে

হেসে ওঠে। নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে নিজের হাসি শুনে ও নিজেই চমকে ওঠে ভয়ে।

হঠাৎ শিরায় শিরায় চঞ্চল হয় রক্তপ্রবাহ। শ্বাসনালীর ভিতরেও যেন উথ্‌লে উঠেছে রক্তধারা; টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফোটে রুদ্ধমুখ কাৎলির জলের মত।—দীনু পাগলের মত ঘরে গিয়ে দেশলাইটা খোঁজে। কেরোসীনের ডিবেটায় আর একবিন্দুও তেল নেই। দেশলাই-এর কাঠি জ্বেলে একবার ভাল ক'রে দেখে নেয় অতসীর মুখখানা।—ঘুমিয়েছে, এবার সত্যি ঘুমিয়েছে অতসী। গালের উপর জমাট বেঁধে গেছে শুক্‌নো রক্তের কালো দাগ।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দীনু একবার চেয়ে দেখে অতসীর মুখপানে, আর একবার চায় ঘুমন্ত শিশুটার দিকে। ওর ইচ্ছা করে, অতসীর গলাটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধ'রে শ্বাসরোধ ক'রে দেয়, শেষে চেপে ধরে ছেলেটার মুখ। দীনু অস্থির হয়ে ওঠে। ও পারে না নিজেকে সংবরণ করতে;—মুছে দেবে, ওদের অস্তিত্ব চিরদিনের মত মুছে দেবে মাটির বুক থেকে। বাঁচবার জন্যে এমনি তিল তিল ক'রে ওদের ম'রতে দেবে না। কব্জির পেশিগুলো শক্ত হয়ে ওঠে; বুভুক্ষায় আঙুলগুলো বাঘের থাবার মত বক্র হয়।

অদম্য ইচ্ছার আবেগে হাত দুটো কেমন অবশ হয়ে আসে; সর্বাঙ্গ শির্‌শির্‌ করে কাঁপুনিতে। বিছানার পাশ থেকে অতসীর ছেঁড়া কাপড়খানা নিয়ে দীনু গায়ে জড়ায়; তারপর দেশলাইটা ট্যাঁকে গুঁজে মাতালের মত টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

*　　　*　　　*　　　*

সাঁ-সুচির পাশেই মস্ত বড় গ্যারেজ। গ্যারেজের উঠানে দৈত্যের মত বড় বড় বাস্‌গুলো ঝিমোচ্ছে। লোকজনের সাড়াশব্দ নেই। সব ঘুমিয়েছে। করগেট-শেডের নীচে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে ঘুমচ্ছে কয়েকজন লোক : ড্রাইভার, কিংবা ওদের কারখানার মিস্ত্রি।

চারিদিকে চেয়ে দীনু পা টিপে টিপে ঢুকে পড়ে সেই গ্যারেজের ভিতর। একবার ভয় হয়, হয় ত কেউ জেগে উঠবে ওর পায়ের শব্দে; পরক্ষণেই আবার মনে জাগে অসীম সাহস।—একটা টিন, কোন রকমে এক টিন পেট্রোল যদি হাতে পায়!

তেমনি ক'রে খুঁজতে খুঁজতে দীনমু সন্ত্রস্ত-পদে এসে দাঁড়াল করগেট-শেডটার সামনে।—ওরা ঘুমচ্ছে, সকলে অচেতন হয়ে আছে ঘুমে। মাথার কাছে সাজানো টিনের পর টিন পেট্রোল! দীনুর বুকের ভিতর লুটোপুটি করে উল্লাস! শ্বাসপ্রশ্বাস রুদ্ধ ক'রে চেয়ে থাকে ঘুমন্ত লোকগুলোর মুখপানে। সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য রেখে, ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যায়।

গায়ের ছেঁড়া কাপড়খানায় ঢেকে পেট্রোলের টিনটা বুকে ক'রে দীনু যখন রাস্তায় এসে দাঁড়াল, তখন গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বাজল তিনটে। সবুর সইছিল না আর। ওর হৃৎপিণ্ডে জমেছে যেন পর্যাপ্ত অক্সিজেন; জীবনের প্রাচুর্য অঙ্গে অঙ্গে ছাপিয়ে ওঠে। দ্রুতপদে দীনু এগিয়ে চলে সাঁ-সুচির দিকে।

গেটে তালা বন্ধ। ছোট ঘরখানায় দারোয়ানটা ঘুমচ্ছে। দীনু স্বপ্নাহতের মত একবার ফটকটার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়; পরক্ষণে

আবার কি ভেবে নিয়ে ছুটে যায় ও-পাশের ছোট গলিটার মুখে। ওর শরীরে যেন কতকাল পরে ফিরে এসেছে অসুরের বল ; কৈশোরের, প্রথম যৌবনের উদ্দাম সজীবতা।

অনায়াসে দীনু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। চেনা! আগাগোড়া সবই চেনা ওর। ওই পোর্টিকো, কোরিডোর, আর্চ, এন্‌গ্রেভ-করা দরজা, এনার চৌকাঠ, সবই যেন চেতনার ভাঁজে ভাঁজে আঁকা। কোথাও এতটুকু অসুবিধা হয় না খুঁজে নিতে।

দরজা খোলা। দীনু কোরিডোর পার হয়ে গিয়ে দাঁড়াল এমফি-থিয়েটারের সামনে। হাতড়ে হাতড়ে সুইচটা টিপে দিতেই জ্বলে উঠল একশো পাওয়ারের বাতি। —ওর অতীত কল্পনার স্বপ্নলোক!

সেখান থেকে ক্লাব ঘর, লাইব্রেরী, কন্‌সার্ট রুম, লাউঞ্জ—সব ফিরে এসে দীনু দাঁড়াল সাঁ-সুচির হলে। এবার একসঙ্গে সব বাতিগুলো দিল জ্বেলে। ঝক্‌মক্‌ করে স্টেজ, বর্ণতুলিকার বিচিত্র রেখায় সুসজ্জিত প্রমোদভবন। স্টেজের মাথায় নটরাজের ব্রোঞ্জ-মূর্তি। সম্মুখে একপাশে কবিগুরুর স্ট্যাচু ; অন্যদিকে ছোট পিলারের উপর শ্বেত-পাথরের নগ্ন নারীমূর্তি—নৃত্যপরা উর্বশী।

দীনু নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ভেবে উঠতে পারে না, হাসবে না কাঁদবে। মনে হয়, প্রচণ্ড হাসিতে ঘরখানা ফাটিয়ে দেয়। কিন্তু পরক্ষণেই আসে কান্না।

ওদের প্রগতি-ভবন! চলমান পৃথিবীর বুকে অগ্রগামী মানুষের পূজার দেউল! চেয়ে থাকতে থাকতে দীনুর চোখদুটো ধাঁধিয়ে আসে ; ঝাপসা হয়ে আসে ওর দৃষ্টি। মানস চক্ষে ভেসে ওঠে অতসীর রক্তাক্ত মুখ, অন্ধ ছেলেটার করুণ কাকুতি, আর গীর্জার সামনে

সেই মেয়েটার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা,—একটা ঘেয়ো ভিকিরীর অর্ধভুক্ত রুটির টুক্‌রো!—দীনু সইতে পারে না, আর তিলমাত্র সবুর সইতে পারে না।

ছুটে যায় কবিগুরুর স্ট্যাচুটার দিকে। তুলতে পারে না; দু'হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতেও তুলে আনতে পারে না সেই গুরুভার মর্মরমূর্তি। টানতে টানতে সেটাকে নিয়ে যায় খিলানের নীচে; সযত্নে লুকিয়ে রাখে একটা পাশে।

তারপর দেওয়ালে ঠুকে পেট্রোল-টিনটার মুখ খুলে নিয়ে ঢেলে দেয় স্টেজে, অডিটোরিয়মে, নগ্ন উর্বশীর দেহে। —দেশলাই জ্বেলে দিয়ে দীনু ছুটে বেরিয়ে আসে বাইরে, একেবারে পাঁচিল টপ্‌কে এসে দাঁড়ায় ফুটপাথে। ওর সর্বাঙ্গ তখন থরথর ক'রে কাঁপছে।

দাউ দাউ ক'রে জ্বলে ওঠে আগুন। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে এম্‌ফিথিয়েটার, লাইব্রেরী আর ক্লাব-ঘরে। দীনু হাসে, বীভৎস উল্লাসে দেহমনে উথ্‌লে ওঠে হাসি।

—ওদের সভ্যতার দেউলে জ্বেলে দিয়েছে আহবাগ্নি! ওর আপন হাতে জ্বালা পূর্ণাহুতির শিখা পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষ হয়ে জ্বলে উঠেছে অগ্রগামী মানুষের বিলাস মন্দিরে।

দশ মিনিটের মধ্যে গড্ডলিকা প্রবাহের মত এসে জমে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের দল। টেলিফোনে এর মধ্যেই হয় ত খবর চলাচল হয়ে গেছে সারা শহরময়। নক্ষত্রবেগে ছুটে আসে কত ট্যাক্সি, মোটর;— হাহাকার ক'রে ছুটে আসে উদ্বিগ্ন পূজারীরা। দীনুর মুখে ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে ওঠে।

লোকজন, ফায়ার ব্রিগেড—মানুষের কোলাহল! প্রগতি-ভবনের চারিদিকে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে সব।

দীনু ধীরে ধীরে গিয়ে দাঁড়াল ময়দানে। একবার মনে হ'ল, গিয়ে ধরা দেয় ওদের কাছে; কিন্তু প্রবৃত্তি হ'ল না। আপন মনে গুন্ গুন্ ক'রে এগিয়ে চলল নদীর পথে—

'স্বপন যেদিন ভাঙবে রে তোর
ধরবে আগুন মনে;
মরবি খুঁজে সোণার হরিণ
গহন গভীর বনে।'

হঠাৎ বুকের ভিতরটা হাহাকার ক'রে উঠল। মনে হ'ল, কি যেন গেল ওর। আপনার, নিতান্ত আপনার কোন মহামূল্য সম্পদ গেল আজ ছাই হয়ে পুড়ে।—উর্ধশ্বাসে ছুটে এলো বড় রাস্তার কাছে। কিন্তু পা-দুটো আর এগিয়ে যেতে চায় না।—ট্রামের তারগুলোয় ঝক্‌ঝক করে আগুনের আভা। সাহেবি হোটেলের কাঁচের শার্সিতে পড়েছে লাল আলোর ছটা।

পুড়ে যাক ওই দেউল,—ঐশ্বর্যের দোলনায় লালিত ওই সব মানুষ—ক্লীব সভ্যতার অপজাত মাংসপিণ্ড, পুড়ে ছাই হয়ে যাক। —কিন্তু স্ট্যাচু! কবিগুরুর মর্মর মূর্তি! না না, যেমন ক'রে হোক সে মূর্তি ও রক্ষা করবে। বরং গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখবে, তবু পুড়ে ছাই হতে দেবে না।

আচম্বিতে ব্রততীদের সেই বাদামি রঙের বড় মোটরখানা সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। ব্রেক করেছে! একটুখানি যেতে না যেতেই

ব্রেক করেছে! গাড়ী থেকে লাফিয়ে নামে ব্রততী,—পিছনে তার সি. কে।—ওর দিকেই আসে! এত কোলাহল—উত্তেজনার ভিতরেও ব্রততীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। আগুনের লাল আভায় উদ্ভাসিত রাজপথে দীনুকে চিনতে ব্রততীর এতটুকুও অসুবিধা হয় নি।

পার্কের ঝোপগুলোর আড়াল দিয়ে দীনু উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। সতর্ক দৃষ্টিতে পিছন ফিরে বার বার চেয়ে দেখে; তারপর ময়দানের পথ ধ'রে আবার হন হন ক'রে এগিয়ে চলে। শহরের আলো তখন ম্লান হয়ে এসেছে। দিক্‌চক্রে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির সোনালি স্নেহ। দূর পল্লীর নীলাঞ্জন তরুশ্রেণী চেয়ে আছে মুখপানে। ভোরের বাতাস হাতছানি দেয়। চলতে চলতে দীনু একবার স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ায়, উদাস দৃষ্টিতে ফিরে চায় মহানগরীর পানে, আবার এগিয়ে চলে;—মাটীর বুকে এখনও আছে মানুষের অফুরন্ত ঠাঁই।